যোগরাণী।

উপন্যাস।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

কলিকাতা;
৬।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট্,
'সাহিত্যপ্রচার' কার্য্যালয় হইতে
শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১১।

মূল্য একটাকা আট আনা।

যোগরাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

র্ব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ তখনও
া, এবং উদাস সমীরণ এক একবার হা হা করিয়া ছুটিয়া
র দিগন্তের দিকে চলিয়া যাইতেছিল।

র রাজবাড়ীর বিস্তৃত প্রাসাদের এক কক্ষে বসিয়া
ঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার
বাদ্‌লার বাতাসের মত থাকিয়া থাকিয়া হা হা করিয়া
প্রকৃতির করুণা যখন ধরাতলে বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসে,
ত্র মোহে নিঃসঙ্গ মানবের মন উদাস হইয়া যায়।

রী গোষ্ঠবিহারের রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের একমাত্র কন্যা;
-রূপে বিশ্ববিমোহিনী। বুঝি, নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির
রূপসী কল্যাণকুমারীর মূর্ত্তিতেই সম্যক্ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট
হার গঠনে যে কমনীয়তা, কৃষ্ণকেশদামে যে রমণীয়তা,

কল্যাণকুমারীও মৃদু হাসিল। বলিল, "কেন ?"

চ। তুমি যে সুন্দর গায়িকা, দাদার ফুলশয্যা করিতে পার!

ক। আমার গান থামিয়া গিয়াছে—ও জি করিয়াছি।

নীল আকাশের তলে বিদ্যুৎ খেলিতে খেলি হইতে জল ঝরিয়া পড়ে, চঞ্চলকুমারীরও নীল হাসির তাড়িত খেলিতে খেলিতে জলদজালে সমাচ্ছ বর্ষিল না,—চক্ষুর জল চক্ষুতেই রহিয়া গেল।

কল্যাণকুমারী বলিল,—"দেখিতে দেখি মেঘের উদয় হইল যে! বলি, চোখটা জলভারে ট

চঞ্চলকুমারী গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"ঠাকুর দেখে আনন্দিত হব বলে, কিন্তু তোমার প্রাণের মনে প'ড়ে যায়, তখন আর কিছুতেই বুক বাঁধতে

কল্যাণকুমারী ঈষৎ হাসির সহিত বলিল- দেখো না, বৌ!"

চ। বালাই, সে কথা কেন। শোন ঠাকু যে রমণী পতিদেবতার ভালবাসায় বঞ্চিত, অনধিকারিণী, তার দুঃখ রাখিবার স্থান ন কাজই ক'রেছেন!"

ক। ঠাকুরের কাজের সমালোচনা তুমি তিনি আমার পিতা ;—কন্যার হিতার্থে, বংশের ছেন, তাহাই করিয়াছেন।

চ। ঠাকুরের বিবেচনার দোষ দিচ্ছি না,

রমণী আর লতায় কোন প্রভেদ নাই। লতা যেমন তরুর
া পেলে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়, এবং পথিকের পায়ে
শয়, রমণীও তাই। যাঁরা সেই কন্যালতাকে কুলীনে অর্পণ
সুখী হন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা যে নিতান্তই ভাল বুঝেন,
া।

। এখন আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হোক। গিরিবালা আয়,
নে বস্‌বি।

চঞ্চলকুমারী ও গিরিবালা কল্যাণকুমারীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন
করিল। তিন খানি ভাস্কর-খোদিত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা যেন পাশাপাশি
স্থাপিত হইল।

কল্যাণকুমারী জিজ্ঞাসা করিল,—"সহসা এ গৃহে আগমনের কারণ
কি?"

চ। আসিতে কি নাই?

ক। আসিতে ত আছে, কিন্তু প্রায়ই ত দেখা যায় না।

। বাদ্‌লার হাওয়ায় একখানি মুখের কথা ঘন ঘন মনে পড়িতেছিল,
গিরিবালাকে ডেকে একটা গান শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।
বড় মিষ্টি লাগিল, তাই তোমাকে শুনাতে আসিলাম। আর যে
নি মনে পড়িতেছিল, সেই মুখের মত তোমার মুখখানি দেখে
ণটাকে বুঝাতে পারিব—মনে মনে সে আশাও একটু রাখি।

ক। রাই আমাদের দণ্ডে দণ্ডে বিরহ-বিকার-গ্রস্ত হয়ে পড়েন।
কত দিন?—এই দশ বার দিন হবে দাদা মফস্বলের জমিদারিতে গিয়াছেন,
ই মধ্যে যেন লক্ষীহারা হরিণী। প্রাণটাকে কি এতই পরের করিয়া
লতে হয়?

চ। পরের কি করিয়াছি—পরে যে আপন করিয়া লইয়াছে।

ক। লইলে দিবে কেন? কিছু আপনার বলিয়া রাখিতে হয়।

চ। সে তোমরা পার,—জানি না, তোমাদের প্রাণের সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ভিন্ন কি না!

ক। কি প্রকার?

চ। তোমরা ভাইবোনে বেশ আপন প্রাণ লইয়া আপনারা বসিয়া থাকিতে পার। সাধ্য কি যে তোমাদের প্রাণের কাছে কেহ ঘেঁসিতে পারে!

ক। আমার কথা? শৈশব ও কৈশোরের মাঝখানে অদৃষ্ট কখন আমার প্রাণের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সে কথা আমার স্মরণও হয় না। যে জিনিষের বন্ধন-অভাব—তা কেমন করিয়া সীমার মধ্যে যাইবে? আর দাদার কথা বলিতেছ? আমার যেন বোধ হয়, তাঁহার প্রাণ তোমার প্রাণের সঙ্গে বিনিময় হইয়া গিয়াছে।

চ। মিছে কথা। তিনি দেওয়া নেওয়া কিছুরই মধ্যে নহেন। আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে, বুঝি বা কতকটা তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বে আমার প্রাণটাকে তাঁহার চরণতলে বিলাইয়া দিয়াছি।

ক। তিনিও তাঁহার প্রাণ তোমায় দিয়াছেন।

চ। ভুল বুঝিয়াছ।

ক। কিসে আমার ভুল বুঝিলে?

চ। তিনি যদি আমার সহিত প্রাণের বিনিময় করিতেন, তবে আমার প্রাণ যেমন করিতেছে, তাঁহার প্রাণ তেমন করিত না কি? আমি যেন অন্তঃপুরাবদ্ধা রমণী—আমি যেন যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারি না। তিনি কি আসিতে পারিতেন না?

কথা বলিতে বলিতে চঞ্চলকুমারীর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গলার স্বর যেন বড় জড়াইয়া আসিল।

কল্যাণকুমারী বলিল,—"ও কি বৌ; কেঁদে ভাসালে যে! ছি, দিদি! অত উতলা কেন? দাদা এই ক'দিনের জন্য জমিদারিতে গিয়াছেন বৈ

ত না। পুরুষ মানুষ কঠোর সংসারের যাত্রী,—তাঁদের কত দেশে যাইতে হয়, কত বিপদ আপদে ঠেকিতে হয়, কত কি ঘটিয়া যায়,—কিন্তু রমণীগণ যদি তাঁহাদিগকে আপন আপন প্রণয়াঞ্চলে ঢাকিয়া কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, সেই কি ভালবাসা! ভালাবাসা অর্থে বিস্তৃতি,—প্রেমকে ছড়াইয়া দাও। বাঞ্ছিতকে উন্নতির রথে তুলিয়া দাও। যাহাকে পূজা করিবে, তাহাকে সমাজের পূজ্য কর।"

অঞ্চলাগ্রে চক্ষুর জল মুছিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল—"তুমি আজীবন কুমারীর ন্যায় হইয়া আছ, আজীবন বৃদ্ধ পণ্ডিতের কঠোর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছ, তুমি সব কথা গুছাইয়া বুঝাইয়া বলিতে পার। আর আমার মত যাহারা পরের পদতলে সারা প্রাণখানি বিলাইয়া দিয়া শূন্য দেহ লইয়া থাকে, তারাই জানে কি যাতনা!"

কল্যাণকুমারী বলিল—"কেবল ভালবাসার মধু লইয়া জীবন কাটান যায় না। সংসারে থাকিতে হইলে সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। কপোত কপোতীর গৃহ নাই, ধর্ম্ম নাই, সমাজ নাই, আত্মীয়-স্বজন প্রতি-পালনের ভাবনা নাই—তবু কিন্তু তাহারা 'মুখোমুখি' হইয়া কাল কাটাইতে পারে না। সময়ে সময়ে উদরের চেষ্টায় দূরে উড়িতে হয়। আর মানুষের ত ষোল আনা বজায় রাখিতে হয়, তাহাদের পক্ষে কেবল ভালবাসার মধু গাত্র-দাহকর।"

চ। তা হইতে পারে। কিন্তু ভালবাসার বাঞ্ছিতের অদর্শন যে, অন্তর্দ্দাহকর, তাহা তুমি জান না বলিয়াই এত বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বর্ষণ করিতেছ।

ক। বৌ! আমাদের কি দুঃসময়, তাহা কি তোমার মনে পড়িতেছে না? এ দুঃসময়ে হয় ত দাদাকে কত দীর্ঘকাল বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

চ। কি!—আমাদের দুঃসময়? কিসের দুঃসময় ঠাকুর

ক। অমৃত-ধারার ন্যায় স্বামীর প্রেম প্রাপ্ত হইয়া তাহাই বুকে লইয়া দিবস যামিনী কাটাইয়া দাও,—শুধু ভালবাসিতে জান, ভালবাসা দিয়া জগৎটাকে ভুলাইতে চাও, এবং ভালবাসায় সারা জীবনটা ভুলিয়া থাকিতে চাও,—কিন্তু জান না ভগিনি, বাহিরের বিশ্বসংসার অনবরত গর্জ্জনের নিশ্বাসে তোলপাড় করিতেছে,—কর্ম্মস্রোতে মানব-তৃণ কে কোথায় ভাসিয়া পড়িতেছে! এ জগতে প্রেমের পুরাতত্ত্ব বা অবিচ্ছেদ্য মিলন কোথায়? কেবল সুখের মধুর উষানিল কাহার ভাগ্যে আছে?

চ। বল,—আমায় তাই বল ঠাকুরঝি, আমাদের কি বিপদ? তোমার দাদাকে হয় ত কেন বিদেশে ঘুরিতে হইবে? আমাদের কি দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে? আমি দরিদ্রের কন্যা, রাজার সংসারে পড়িয়াছি—পর্ণকুটীরবাসিনী স্বর্ণ অট্টালিকায় আসিয়াছি, মুখের কথার ভিখারিণী প্রাণের আদর পাইয়াছি,—আজি পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তোমাদের সংসারে সুখ আর উৎসব, সোহাগ আর আনন্দ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই দেখি নাই। বুঝিয়াছি—এ সংসারে এমনই নিরবচ্ছিন্ন সুখে আর সোহাগে দিন কাটিবে। এ ফুলশয্যার আনন্দে কিসের দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে; ঠাকুরঝি? সেই জন্যই কি তুমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলে?

ক। হাঁ বৌ; তাই ভাবিতেছিলাম। বাবার জন্য আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আমার বাবা বৃদ্ধ হইয়াছেন,—যদি তাঁহাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তিনি ত তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না।

কল্যাণকুমারীর দুই চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সে বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ক্রন্দনে ব্যস্ত ও ব্যথিত হইয়া চঞ্চলকুমারী বলিল,—"কে তাঁহাকে কষ্ট দিবে? কাহার সাধ্য তাঁহাকে কষ্ট দেয়? তিনি দেশের রাজা—তাঁহার হুকুমে লোকের জীবন থাকে

ও যায়, তাঁহার হুকুমে শ্মশান নগর ও নগর শ্মশানে পরিণত হয়। তিনি ত মুর্শিদাবাদে দরবার করিতে গিয়াছেন।

অঞ্চলাগ্রে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে কল্যাণকুমারী বলিল,—"দরবার!—বৌ; সে যে কি ভীষণ দরবার, তাহা ত তুমি শোন নাই। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ যে রাজা বা জমিদারের রাজস্ব বাকি পড়ে, তাহাকে নাকি ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করেন—কারাগারে পাষাণ চাপা দিয়া রাখেন,—রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া বেত্রাঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেন,—আরও নাকি কত রকম অমানুষিক অত্যাচার করিয়া থাকেন। বাবারও তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে।

বলিতে বলিতে কল্যাণকুমারীর রক্তপদ্মের মত মুখখানি আরও রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

চঞ্চলকুমারীরও নীলায়ত চক্ষু লোহিত হইল। বলিল, "তিন লক্ষ টাকা বাকি! কত টাকা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন?"

ক। কোথায়! এক লক্ষ কয় হাজার মাত্র।

চ। আধা আধি হইতে পারে, বোধ হয়?

ক। তাহা হইলেও হইতে পারে।

চ। তবে আপাততঃ তাতে একটা বন্দোবস্ত হইয়া যাইতে পারিবে। বাকি টাকার জন্য আরও কিছু সময় লইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

ক। আমি শুনিয়াছি, এক কপর্দ্দক বাকি থাকিতেও ছাড়িয়া দেয় না। গত কল্য তাঁহার আসিবার দিন ছিল, আসেন নাই,—আর কি আমি বুক বাঁধিয়া ঘরে টিঁকিতে পারিতেছি, বৌ! তবে মানুষ জন্মগ্রহণ করিলে, অনেক সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বাবার যে আমার একটু ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে!

চ। তোমার দাদা বুঝি তাই জমিদারিতে টাকা সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন?

ক। গিয়াছেন ত তাই মনে করিয়া, কিন্তু আদায় হইবে বলিয়া ভরসা নাই।

চ। কেন? প্রজাদের নিকট খাজনা পাওয়া যাইবে, অথচ তাহারা দিবে না, কেমন কথা!

ক। তাহাদের দিবার সাধ্য নাই বলিয়া দিবে না। আমাদের বড় মহালের মধ্যে হলদা পরগণা। সেই পরগণাতে বৎসরে দুই লক্ষ টাকারও উপর আদায় হইত। কিন্তু গতপূর্ব্ব বৎসরে হলদা পরগণায় বর্গী পড়িয়া প্রজার ধন ধান্য গরু বাছুর সমস্ত লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে,—থাকিবার ঘর-দুয়ার, তাহাও জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। গত বৎসর গরু বাছুর না থাকায় প্রজারা ভালরূপ চাষ-আবাদ করিতে পারে নাই, তার উপরে আবার সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় সেখানে ধান্যাদিও জন্মে নাই—প্রজারাই ছেলে পুলে লইয়া না খাইয়া মারা যাইতেছে—গৃহ অভাবে গাছতলায় বাস করিতেছে, সে দেশে বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আজি তিন বৎসরের মধ্যে সেখানে একটি পয়সাও আদায় হয় নাই। সেই জন্যই আমাদের অত রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে।

চ। বর্গী পড়া কাহাকে বলে, ঠাকুরঝি?

ক। মহারাষ্ট্রীয় জাতিরা আজিকাল অত্যন্ত বলশালী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। তাহাদের সেই বল, লুণ্ঠন-ব্যবসায়ে পর্য্যবসিত হইতেছে। তারা দল বাঁধিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে লোকের ধন-ধান্য ও গোরু বাছুর যাহা পাইতেছে, তাহাই লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে। লোকের ঘর-দুয়ারে আগুন ধরাইয়া পুড়াইয়া দিতেছে। মায়ের বুক হইতে শিশু সন্তান কাড়িয়া লইয়া আছাড়িয়া মারিয়া ফেলিতেছে। তাহাদেরই নাম বর্গী।

চ। ও মা; কি সর্ব্বনাশ! তবে তাহারা ডাকাত। তা, তাদের শাসন করিবার কি কেহ নাই?

ক। কে শাসন করিবে? দিল্লির বাদসাহ মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্রেরা ঘরাও বিবাদে মত্ত;—আর নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ জমিদারগণের বুকে বাঁশ দলিতে ব্যস্ত;—প্রজার দীর্ণ বিদীর্ণ বক্ষের করুণ ব্যথা সারিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে?

চ। আচ্ছা, আমাদের দেশের রাজা ও জমিদারগণ?

ক। ভগিনি, সে শক্তি যদি আমাদের দেশের লোকের থাকিত, তবে কি নবাবই ঐরূপ অত্যাচার করিতে সমর্থ হইত? শক্তিসাধক বাঙ্গালী এখন শক্তি-হারা। দেশ, দস্যু তস্কর ও অত্যাচারীর বিকট তাণ্ডব-নৃত্যে পরিপূর্ণ।

চ। তুমি এত খবরও রাখ ঠাকুরঝি;—যেন রাজমন্ত্রী! ভাল, যদি হলদা পরগণার ঐরূপ দুরবস্থা, সেখান হইতে যদি খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তোমার দাদা কোথায় গিয়াছেন?

ক। মাসুন্দীর কাছারি।—সে সুন্দর বনে।

চ। তবে সেখানে টাকা আদায় হইতে পারিবে?

ক। সে ভরসাও নাই।

চ। কেন, সেখানে আবার কি হইল?

ক। দেশের অদৃষ্টে যে এখন কি অভিসম্পাতের আগুন জ্বলিতেছে, তাহা ত খোঁজ রাখ না! সেখানে নাকি মগের মুল্লুকের জলদস্যুগণ অত্যাচার করিয়া প্রজাদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। আমাদের নায়েব সেখানে খাজনা আদায় করিতে গেলে, প্রজারা বলিয়াছে—আপনারা রাজা, কি মগদস্যুগণ আমাদের রাজা, তাহা যত দিন না বুঝিতে পারিতেছি, তত দিন খাজনা দিব না;—আর দিবই বা কোথা হইতে? আমাদের ঘরের ধন দস্যুতে কাড়িয়া লইতেছে। আপনারা আগে দস্যু দমন করুন,—তারপরে খাজনা পাইবেন।

চ। তাহাদের কথা ন্যায়সঙ্গত বটে, কিন্তু ততদিন টাকা অনাদায় থাকিলে, বাকি রাজস্ব পরিশোধ করিবার উপায় কি?

ক। সেই ত ভাবনা,—দাদা সেই জন্যই গিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে আদায় করিতে পারেন।

চ। তবে এক্ষণে টাকা কর্জ্জ করিয়া কেন নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব মিটাইয়া দেওয়া হউক না? তারপর আদায় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেই হইবে।

ক। বাবা যে টাকা লইয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ঋণ করিয়া। আরও ঋণ পাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও মিলে নাই। মিলিবে কোথায় ভগিনি! দেশের সকলের অবস্থাই সমান। জমিদার মাত্রেই বাকি রাজস্বের দায়ে মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট দায়ী ও তজ্জন্য প্রপীড়িত। মহাজনদিগের যথা সর্ব্বস্ব বর্গীরা এবং মগেরা অপহরণ করিয়া লইতেছে। প্রজাগণও লুণ্ঠনের জ্বালায়, অত্যাচারের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও দরিদ্র। এ অবস্থায় ঋণ পাওয়া দুর্লভ।

প্রফুল্লিত পদ্মের সহাস আননে সন্ধ্যার কালিমা পড়িলে যেমন-সে ম্লান হইয়া যায়, চঞ্চলকুমারীর হাস্যদীপ্ত মুখখানিও তদ্রূপ ম্লান হইয়া গেল। যে হাসিভরা মুখ লইয়া সে আসিয়াছিল, তাহা আর থাকিল না। গিরিবালার যে গান শুনাইতে আসিয়াছিল, তাহা আর গাওয়া হইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিন জনে নীরব নিস্তব্ধে সে গৃহে বসিয়া থাকিল। সমস্ত গৃহখানা তাহাদের সৌন্দর্য্য লইয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যেন রূপপিপাসিগণকে আহ্বান করিতেছিল। এবং সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় নগর ও প্রান্তর আচ্ছন্ন হইয়াছিল। দেবালয়সমূহে সন্ধ্যার মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নদিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনের অন্তর্গত গোষ্ঠবিহার নামক ক্ষুদ্র পল্লী, পুরাতন কাহিনীর এক ক্ষীণ স্মৃতি বুকে করিয়া বিদ্যমান আছে।

এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ রাজা বাস করিতেন। তখন গ্রামের নাম গোষ্ঠবিহার ছিল, কি অন্য কিছু ছিল, তাহা স্থির করা যায় না। বর্ত্তমানে যে পল্লী গোষ্ঠবিহার নামে আখ্যাত, তাহা আধুনিক; অতিশয় ক্ষুদ্র এবং রাজবাড়ী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। এই রাজার অগণ্য গাভী ছিল, রাজবাড়ীর পূর্ব্বভাগে, যেখানে মাহিসর নদী তাহার জল-বাহুবেষ্টনে স্থানটিকে দ্বীপরূপে রক্ষা করিয়াছে,—জন-প্রবাদ এই এইস্থানে রাজার নবলক্ষ ধেনু বাস করিত, তাই এই স্থানটির নাম গোষ্ঠবিহার। ধেনু নবলক্ষ হউক বা না হউক, বহু ধেনু বৎস যে, তথায় বিচরণ করিত, তাহার চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। গোষ্ঠবিহারের প্রান্তভাগে ক্ষীণসলিলা মাহিসর নদীর একস্থানকে এখনও 'লক্ষ ধেনুর ঘাট' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে এবং তাহার যে সকল স্থান দিয়া নিত্য নিত্য ধেনু বৎস অপর পারে চরিতে যাইত, এখনও সে স্থানগুলি দেখিলে তাহা স্পষ্টই অনুভব করা যায়।

এই লক্ষধেনুর ঘাট হইতে মাহিসর নদী দুইটি জল-বাহু বিস্তার করিয়া দুইদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহারই পশ্চিমোত্তর ভাগে এখনও রাজ-

বাড়ীর ভিত্তিভূমি অতীতের কাহিনী বুকে করিয়া পড়িয়া আছে। এখনও প্রাচীর গড় ও দুর্গের ক্ষীণ স্মৃতি স্বরূপ কিছু কিছু কালমুখোদগীর্ণ কবলের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে ইহাকে "গন্দরাজার ঘোপ" বলে। রাজবাড়ী যে স্থানে অবস্থিত, তাহাকে পূর্ব্বে গোষ্ঠবিহার বলিত, কি অন্য কোন নামে আখ্যাত করিত, তাহা জানিবার কোন উপায় না পাইয়া আমরা গোষ্ঠবিহার রাজবাড়ী বলিয়াই বর্ণনা করিলাম।

এই রাজবাড়ীর গঠনাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রতীতি হয়, ইহা পূর্ব্বপশ্চিম ভাবে লম্বালম্বি ছিল, এবং পাঁচটি মহল্যায় বিভক্ত ছিল। দুইটি মহলের ভিটা এখনও অকর্ষিত আছ,—বংশলোপ ভয়ে কৃষকেরা সে দুইটি মহল্যা কর্ষণাদি করে না, তদ্ভিন্ন সমুদয় স্থানই আবাদের জমির মধ্যে লইয়াছে। রাজবাড়ীর সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ দুইটি পুষ্করিণীর কঙ্কাল এখনও অবস্থিত আছে। নদী-বেষ্টিত রাজবাড়ীর নিকটে পুষ্করিণী দুইটি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, বাহির হইতে শত্রু কর্তৃক দুর্গ অবরোধ হইলে, জলের অভাব পূরণার্থই এই পুষ্করিণী খনিত ও রক্ষিত হইয়াছিল।

রাজবাড়ীর যে দুইটি মহল্যার ভিত্তিভূমি এখনও পুরাতন স্মৃতি বক্ষে করিয়া পড়িয়া আছে, তাহা মাহিসরু নদীর তট-ভূমির উপরেই অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের সদর দ্বার পূর্ব্বাভিমুখে ছিল, এবং পশ্চিম দিকে রন্ধনবাড়ী ছিল,—এই রন্ধন বাড়ীর ভিত্তিমূল বিধৌত করিয়া মাহিসর নদী প্রবাহিত হং ; এখন মাহিসরের জল শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই একটু সরিয়া গিয়াছে,—কিন্তু পূর্ব্ব খাদ এখনও রাজবাড়ীর নিম্নদেশে অবস্থিত আছে।

গোষ্ঠবিহার রাজবংশের জাতি নির্ণয় সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতি ছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার বহুতর প্রমাণ আছে।

অনেকে অনুমান করেন, গোষ্ঠবিহারে যে রাজবংশ বসতি করিতেন, তাঁহাদের আয় রাজোচিত ছিল কিনা, সন্দেহ। সম্ভবতঃ বার্ষিক সাত আট লক্ষ টাকার কিছু উপরে তাঁহাদিগের জমিদারির আয় থাকিবার সম্ভাবনা।

এই রাজবংশের স্থাপয়িতা কে, কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত ইহাঁরা গোষ্ঠবিহারের রাজধানীতে থাকিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক ইতিহাস আবিষ্কার করা বর্ত্তমানে আমার অনাবশ্যক। বলা বাহুল্য, আমি ইতিহাস লিখিতেছি না, উপন্যাস লিখিতেছি,— আর পাঠকগণও ইতিহাস পড়িতেছেন না, উপন্যাস পড়িতেছেন। লুচির নিমন্ত্রণ করিয়া পর্য্যুবিতান্ন বাহির করিয়া হাস্যাস্পদ ও বিরক্তির কারণ হইতে অভিলাষী নহি।

যখন মুর্শিদকুলীখাঁ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়া তাঁহার নব-নির্ম্মিত মুর্শিদাবাদ নগরীর তক্তে আরোহণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোষ্ঠবিহারে রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রাজবংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখনকার নিয়মানুসারে রাজা বা জমিদার হইলে, জাতি-নির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রেই রায় উপাধি ধারণ করিতেন।

মুর্শিদকুলীখাঁ কিরূপে বঙ্গদেশ হইতে রাজকর আদায় করিতেন, কি প্রকারে দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাহার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই, তথাপিও আমরা এস্থলে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

মুর্শিদকুলীখাঁর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে অত্যন্ত শৈথিল্য হইয়াছিল। অনেক জমিদারের রাজস্ব অযথারূপে বাকি পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ, জমিদারগণের অবহেলা নহে,—সে সময়ে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর

তদীয় পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া পরস্পর কলহে উন্মত্ত। অপরদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ, লুণ্ঠন-ব্যাপারে বঙ্গের সর্ব্বস্বান্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদেরই নাম বর্গী—বর্গীর হাঙ্গামে বঙ্গদেশ মৃতপ্রায়। তদুপরি মগ-ফিরিঙ্গির প্রবল অত্যাচার;—ফলকথা, চারিদিক হইতে অত্যাচারের অগ্নি-বাহু যেন বঙ্গদেশকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। বাস্তবিক কেহ দেশের শাসন ও রক্ষাকর্ত্তা ছিল না। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার আপন আপন অধিকারে দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা;—কিন্তু তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্যে দেশব্যাপী অত্যাচার-স্রোত রুদ্ধ হইত না। প্রজাগণ এই বিপদে পড়িয়া পুত্র কলত্রাদি লইয়া একদিনও সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না,—একদিনও শান্তিতে একমুষ্টি অন্ন মুখে দিতে পারিত না। কাজেই জমিদারগণও প্রজাগণের নিকট কর আদায় করিতে না পারিয়া রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে দিল্লিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজস্ব যাওয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার পরেই মুর্শিদকুলীর আমল।

মুর্শিদকুলীখাঁ এই রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল নিয়ম ও অত্যাচারের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত বঙ্গ ব্যাপিয়া অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। রাজা ও জমিদার প্রভৃতির ধন-প্রাণ রক্ষা করা একান্তই দায় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সমস্ত দেশ ত্রয়োদশটি চাকলায় বিভক্ত করিয়া প্রতি চাকলাতে এক একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন, এবং রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা দেখিলে, তৎক্ষণাৎ একের জমিদারি অপরের নামে লিখিয়া দিতেন, এবং পূর্ব্ব জমিদার বা রাজা কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করিলে, ফৌজদারসাহেব সসৈন্যে গিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিতেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এই নিয়মে কার্য্য করিয়া সুফল ফলিত না। নূতন জমিদার হইয়া অনেকে সময় মতে রাজস্ব প্রদানে সক্ষম হইত না,—হয় ত প্রজাবিদ্রোহী হইত,

নয় ত সময়ে কর আদায়ের শৃঙ্খলা করিতে না পারিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত জমিদার রাজস্ব প্রদানে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না। প্রজাগণের অভাব-অভিযোগ, প্রজাগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা, প্রজাগণের অত্যাচার-অবিচার মুর্শিদকুলীখাঁ বা তাঁহার নিয়োজিত ফৌজদারসাহেব অথবা কোন কর্ম্মচারীই শুনিতেন না বা দেখিতেন না। এক কথায়, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রজাগণের জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা, স্বদেশে ইচ্ছানুরূপ রাজ্য শাসনের অধিকার রাজা বা জমিদারগণেরই হস্তে ছিল,—তাঁহারা কেবল বর্ষে বর্ষে রাজকর প্রদান করিতে পারিলেই সর্ব্ব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতেন।

কিন্তু তখন দেশের আর্থিক অবস্থা নানা কারণে অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই প্রজার নিকটে কর আদায় করা বঙ্গীয় ভূস্বামিগণের এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

মুর্শিদকুলীখাঁ আপন দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁর হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। রেজা খাঁ অমানুষিক অত্যাচারে রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। জমিদারগণের উপর তিনি যেরূপ অত্যাচার করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেন, কোন দেশে কোন কালে সেরূপ অত্যাচার মানুষের উপরে মানুষে করিয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায় নাই।

জমিদারগণের রাজস্ব বাকি পড়িলে, রেজা খাঁ তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া আনিয়া, সামান্য অপরাধীর ন্যায় কাহাকেও বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেন, কাহাকেও রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন, কাহাকেও নিদারুণ শীতে নগ্ন গাত্রে দণ্ডায়মান করাইয়া শীতল জলের ধারায় স্নান করাইতেন, এবং তাহাতেও টাকা অনাদায় হইলে, পদদ্বয়ে রজ্জু বদ্ধ করিয়া লম্বিত করিয়া রাখা হইত। আবার একটি বিস্তৃত হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই হ্রদের মধ্যে নানা আবর্জ্জনা ও ময়লা দ্রব্য জলপূর্ণ করিয়া তাহা

হইত; ঐ সকল ময়লা-আবর্জ্জনা পচিয়া দুর্গন্ধময় হইত,—তাহার নিকট দিয়া মনুষ্য গমনাগমন করিতে পারিত না। যে সকল জমিদার রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইতেন, তাঁহাদিগকে দুর্গন্ধময় শুক্কারজনক নরক তুল্য সেই হ্রদের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। হিন্দুগণকে উপহাস করিবার জন্য এই নরককুণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছিল,—"বৈকুণ্ঠ।" বিখ্যাত বৈদেশিক ইতিহাসলেখক গ্রাণ্ট ও ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি এই বৈকুণ্ঠের কথা তাঁহাদিগের স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে এখন যেখানে আমাদের সুবিচারক ন্যায়পরায়ণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কেল্লার দক্ষিণ তোরণ দ্বার, তাহারই সম্মুখে "বৈকুণ্ঠ" বা সেই রৌরব নরক ছিল।

প্রাগুক্ত পৈশাচিক দণ্ড ব্যতীত, জমিদারগণের কারাবাস এবং অর্থদণ্ড ত ছিলই।

গোষ্ঠবিহারের বর্ত্তমান রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের রাজস্ব বাকি পড়ায় রেজা খাঁ তাঁহাকে তলব দিয়া লইয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় তিনি বাকি রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রায় অর্দ্ধেক আন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং পুত্র গোবিন্দরাম রায়কে সুন্দরবনের জমিদারিতে এবং নায়েব ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে অন্যান্য মহালে পাঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া গিয়াছেন, এই অর্দ্ধেক টাকা প্রদান করিলে, অবশ্যই কিছু সময় পাওয়া যাইবে, তাহার মধ্যে গোবিন্দরাম এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ বাকি টাকা আদায় করিয়া আনিবে। রেজা খাঁ যদি ছাড়িয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া টাকা পাঠাইয়া দিবেন, আর যদি ছাড়িয়া না দেয়, তথাপিও অর্দ্ধেক টাকা পাইলে কিছু দিনের জন্য অত্যাচার না করিয়া নজরবন্দী অবস্থায় রাখিতে পারে, তাহার মধ্যে টাকা গিয়া পঁহুছিবে।

তিনি যখন বাড়ী হইতে গমন করেন, তখন কন্যা কল্যাণকুমারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা, তুমি কবে আসিবে?"

তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"যে কার্য্যে যাইতেছি, মা! আসা না আসা নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর নাই।"

আয়ত নয়ন আরও বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণকুমারী বলিয়াছিল,—"যদি বিশেষ বিপদের স্থান হয়, আর নবাব-সরকারের যে সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়াছি, তাহা যদি যথার্থই হয়, তবে আর তোমার গিয়া কাজ নাই। টাকা লইয়া নায়েব যাউক।"

রাজা বলিয়াছিলেন,—"আমাকে তলব দিয়াছেন, আমাকেই যাইতে হইবে। নায়েব বা অন্য কেহ গমন করিলে হিতে বিপরীত হইবে। অন্য কেহ যাওয়া যা, আর সুপ্তসিংহের মস্তকে লোষ্ট্র নিক্ষেপও তাহাই।"

কল্যাণকুমারী বলিয়াছিল,—"যদি তোমার শরীর অসুস্থ হইত?"

রা। রেজা খাঁর আদেশে তথাপি যাইতে হইত।

ক। এ অত্যাচার কেবল আমাদের প্রতি, না সকল রাজা ও জমিদারের প্রতি হইতেছে?

রা। পাগলি! আমাদের সঙ্গে ত আর নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ অথবা রেজা খাঁর কোন ব্যক্তিগত বিবাদ বা ঈর্ষা নাই যে, আমাদের জন্য একটা অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছে! সমস্ত বাঙ্গালার জমিদারের জন্য অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। সমস্ত রাজা, জমিদার প্রভৃতিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচারের আগুনে পুড়াইয়া মারিতেছে।

ক। সে দিন নায়েবের মুখে যে অত্যাচারের কথা শুনিলাম, তাহা শুনিতে শুনিতে আমার মোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে প্রকার অত্যাচার মানুষে বন্য পশুর উপরেও করে না। দেশের যাহারা মান্য গণ্য ও সুখী—যাহাদের শরীরে বাতাতপ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না, আমাদের উপর এ পাশবিক অত্যাচার করা নবাবের ঘোর অন্যায়।

রা। অন্যায় ত সকলেই বুঝিতেছে, কিন্তু হাত কি ?

ক। হাত নাই ? এ কথা বলা বাবা, তোমার কেমন হইতেছে! বুঝিতে পারিলাম না!

রা। কি হাত আছে মা ? উপায় থাকিলে কি সকলে নীরবে এত অত্যাচার সহ্য করিত ?

ক। বাবা! এ দেশ কাদের ? কোন্ দূর দেশ হইতে ক্রীতদাস স্বধর্ম্মত্যাগী মুর্শিদকুলীখাঁ বাঙ্গালা মুলুকে আসিয়াছে, আর আমাদের যাঁরা রাজা জমিদার ভূস্বামী, তাঁহাদের দেশ,—প্রজা তাঁহাদের, সৈন্য তাঁহাদের, অর্থ তাঁহাদের, দেশ তাঁহাদের—অথচ সেই বিদেশী মুসলমান একা তাঁহাদের উপরে অযথা অত্যাচারের স্রোত তুলিয়া দিয়াছে,—ইহার কোন উপায় নাই ? হায়! আমি যদি তোমার কন্যা না হইয়া পুত্র হইতাম, তবে দেখিতাম—এ অত্যাচারের স্রোত ফিরাইতে পারিতাম কি না!

দন্তে রসনা দংশন করিয়া রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় বলিলেন,—"চুপ্ কর মা, চুপ্ কর। কথা যদি বাতাসে মিশিয়াও মুসলমানদের কাণে যায়, আমার জ্ঞান-গোষ্ঠী একগড় হবে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আনত আনন ঈষদুন্নত করিয়া কল্যাণকুমারী বলিল,—"আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম, বিদেশীর এ অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে একটা প্রতিকারের পথে গিয়ে, না হয়, সংবংশে মরণের দেশে চলিয়া যাইতাম। দেশব্যাপী অত্যাচার দেখিয়া, আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার সংবাদ শুনিয়া, স্বজাতির দুর্দ্দশা জানিয়া, নিজে অত্যাচারের হলাহল নীরবে গলাধঃকরণ করিয়া, ভবিষ্যবংশাবলীকে অত্যাচারের জুতা বহন করিতে জীবিত রাখিয়া বাঁচার চেয়ে মরা ভাল!"

দৃপ্তা সিংহীর মত ঈষদুন্নত আননে কথাগুলা বলিয়া কল্যাণকুমারী যখন বক্রিমগ্রীবায় দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত নয়নে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল, তখন সভয়-কম্পিত হৃদয়ের মুগ্ধ নয়নে রাজা দেখিলেন,—তাঁহার কন্যা বুঝি মহাশক্তির আবির্ভাবে নারীদেহ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সর্ব্বদেব-শরীরজ শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল,—এও বুঝি সেই শক্তি। তিনি ভাবিলেন, এ শক্তির বলে সৃষ্টি স্থিতি সংহার হয়, এ শক্তি-বলে দনুজকুল নির্ম্মূল হয়। কিন্তু মোহ ভাঙ্গিল,—মুসলমানের অত্যাচার-দুন্দুভির ভীষণ আরাব যেন কর্ণে আসিয়া ধ্বনিত হইল। রাজা ম্লানমুখে বলিলেন,—"মা, আমি একা কি করিতে পারি; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আর আমার লোকবল সামান্য—অর্থ ত নাই বলিলেই হয়।"

ব্রীড়াবনত মুখে কল্যাণকুমারী বলিল,—"তা বটে! কিন্তু বনের মর্কট সহায় করিয়া রামচন্দ্র সাগর বাঁধিয়া লঙ্কায় গিয়া রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, বাবা;—কিন্তু আপনার সে সময় গিয়াছে; জরা আসিয়া দেহ আক্রমণ করিয়াছে; এ সময় সে কার্য্যের জন্য নহে। কিন্তু বাবা, মুর্শিদাবাদ গেলে রেজা খাঁ যদি তোমার প্রতি অত্যাচার করে—তুমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবে? ভাবিতে যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

কল্যাণকুমারী বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। রাজা সে চক্ষুর জলে মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"মা! আমার সঙ্গে অনেক টাকা চলিল। রাজস্বের হিসাব পরিষ্কার না হইলেও আমি ইহা হইতে কিয়দংশ টাকা উৎকোচ দিয়াও অত্যাচারের মুখ রুদ্ধ করিতে পারিব।"

জলভারাক্রান্ত জলদজালের মধ্য দিয়া যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, তদ্রূপ কল্যাণকুমারীর সজলনয়নে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে বিদ্যুৎ বুঝি বলিয়া গেল, অত্যাচারীকে উৎকোচ দিয়া ধনী করা—অত্যাচারের পাপশোণিতকে বর্দ্ধিত করা!—কিন্তু মুখে সে কথা আসিল না। বৃদ্ধ পিতার আসন্ন বিপদে সে কথা মুখে সরিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল,—

"বাবা, তবে তাই করিও। তোমার যেন কোন প্রকারে কষ্ট না হয়। কবে আসিবে?"

রাজা যে দিন নির্ণয় করিয়া গিয়াছিলেন, সে দিন গত হইয়া গিয়াছে। কল্যাণকুমারী তাই পিতৃদেবের জন্য বড় উতলা হইয়া, ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের নিস্তব্ধ প্রকৃতির নিঃসঙ্গ করুণ তানে মুগ্ধ হইতেছিল।
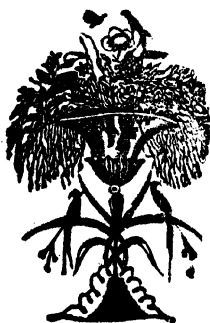
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চঞ্চলকুমারী ও গিরিবালা উঠিয়া গেলে, এক দাসী আসিয়া সেই গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া দিল, এবং বলিল—"তোমার আহ্নিকের ঘরে সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, আহ্নিক করিতে যাও।"

কল্যাণকুমারী তাহার কথার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না, এক বার উদাস-বক্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

যে গৃহে কল্যাণকুমারী বসিয়াছিল, তাহারই পার্শ্বের একটি প্রকোষ্ঠ, তাহার আহ্নিকের ঘর।

আহ্নিকের ঘরে সুগন্ধি তৈলে স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বলিতেছিল। খুব পুরু সুমসৃণ কার্পেটের আসন একখানি কাষ্ঠাসনের উপর পাতিত ছিল। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে রৌপ্য থালে সন্ধ্যার আধ-বিকশিত গোলাপ মল্লিকা চামেলি বেলা প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের মালা;—বামদিকে ধূপবর্ত্তিকা ও ধুনাচিতে ধূনা-গুগ্‌গুল পুড়িয়া পুড়িয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছিল। গৃহ-দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, মদনভস্ম, নলদময়ন্তী, দশভুজা, জগদ্ধাত্রী, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি বহুদেবদেবীর সুন্দর তৈল-চিত্র শোভা পাইতেছিল। সম্মুখে স্বর্ণসিংহাসনে একটি শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত।

কল্যাণকুমারী একখানি লালপেড়ে গরদের ধুতি পরিধানপূর্ব্বক আহ্নিকের ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রবেশ পূর্ব্বক শিবলিঙ্গ সমীপে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করতঃ অনেকক্ষণ সন্ধ্যাবন্দনা করিল, তারপর সেই সুরভি পুষ্পের মালাগুলি লইয়া কতক ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গে বেষ্টন করিল, কতক লইয়া সিংহাসনে সাজাইয়া দিল। তারপর, একখানি ভগবদ্গীতা পুঁথি বাহির করিয়া তাহার একটি অধ্যায় আবৃত্তি করতঃ পুনরায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া গলদশ্রুলোচনে বলিল,—"ভগবন্! তুমি ত চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু;—আমার বাপ ব্যাঘ্রের গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন; দেখো ঠাকুর, যেন তিনি কোনরূপে কষ্ট না পান। তিনি ভালয় ভালয় বাড়ী আসিলে, আমি তোমাকে দশ সের দুগ্ধে স্নান করাইব।"

কল্যাণকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইল;—সহসা সে জানিতে পারিল, বহিঃপ্রকোষ্ঠে আলো জ্বালিয়া লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে। দাসদাসীগণ বড়ই ব্যস্ত,—ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই যেন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইতে কাজের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে। এ উহাকে ডাকিতেছে, সে তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে। একজন বলিতেছে, ঐ ধারে একটা কাপড়ের মোট পড়িয়া ছিল, তোলা হইয়াছে কি না! অপরে বলিতেছে, ঐ খানে বাক্সটা ছিল, বাড়ী মধ্যে লইতে হইবে। কেহ বলিতেছে, মৎস্যের ঝুড়িটা শীঘ্র মৎস্যকর্ত্তনকারিণীদিগকে ডাকিয়া দাও,—অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, বিলম্বে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আর একজন মুরুব্বিআনা করিয়া বলিতেছে, মথুরা বেটাকে সেই দেড় ঘণ্টা তামাক দিবার কথা বলা হইয়াছে, বেটার এখনও সাক্ষাৎ নাই—ভদ্রলোকগুলি এত দূর এসে, তামাক না খেয়ে ব'সে আছেন,—তামাক খাওয়া অভাবে উঁহাদের হাত পা ধোওয়া বন্ধ রহিয়াছে। কেহ বলিতেছে, ঘোষ মহাশয়কে আগে দেখ্ রে, আগে ঘোষ মহাশয়কে বাতাস কর।

কল্যাণকুমারীর আহ্নিকের ঘর অন্দরমহলের অর্থাৎ যে মহালে রাজান্তঃপুরবাসিনীগণ অবস্থান করিতেন, তাহার দক্ষিণ সীমায় এবং সদর বাড়ীর দ্বিতীয় মহাল অর্থাৎ যে মহালে রাজকর্ম্মচারী পুরুষবর্গ অবস্থান করিতেন, তাহার উত্তর সীমায়। বাড়ীটি পাঁচ মহালে বিভক্ত। প্রথম মহালে কাছারি বাড়ী, দেবালয়, নাটমন্দির প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহালে দপ্তরখানা, খাজনাখানা, মালখানা, মন্ত্রণাগার প্রভৃতি। তৃতীয় মহালে রাজাদের নিজ নিজ উপাসনা গৃহ, আরাম গৃহ প্রভৃতি। চতুর্থ মহালে অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণের গৃহ, বাসভবন প্রভৃতি। পঞ্চম মহালে দাসীগণের থাকিবার গৃহ, রন্ধন-গৃহ, অন্দর পুষ্করিণী প্রভৃতি। এই সকল মহালের সম্মুখে বহু দুর লইয়া মৃণ্ময় দুর্গ-প্রাচীর। দুর্গ-প্রাচীরের পরে পরিখা। দুর্গ মধ্যে অনেক দেবালয়, চিকিৎসালয় ও বিপণি ছিল।

বহিঃপ্রকোষ্ঠের গোলযোগ শুনিয়া কল্যাণকুমারী ভাবিল, তাহার পিতা বুঝি বাড়ী আসিয়াছেন। নিশ্চিত সংবাদ লইবার জন্য সে, একজন দাসীর অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কাহারও সন্ধান না পাইয়া তাড়াতাড়ি অন্দরমহালের দিকে গমন করিল। পথে যাইতে পরিচারক রমানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তখন কেবল একটা প্রকোষ্ঠের দরজা গলাইয়া বাহির হইতেছিল।

সম্মুখে কল্যাণকুমারীর অপ্সরারূপের জ্বলন্তজ্যোতিঃ পতিত হওয়ায় তাহার চক্ষু বুঝি ঝলসিয়া গেল। একবার বুঝি তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল, সে স্পন্দিত-হৃদয়ে যেমন সেদিকে চাহিয়াছে, আর দরজার চৌকাঠে তাহার মস্তক লাগিয়া ঝনাৎ করিয়া উঠিল কল্যাণকুমারী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"চোখের মাথা খাইয়াছ নাকি?"

রমানাথ ঠাকুরের মস্তকে গুরুতর আঘাতই লাগিয়াছিল। সে তাহার আজানু-বিলম্বিত শিখাটা ধরিয়া একবার টান দিয়া অপ্রতিভতার স্বরে বলিল—"তাড়াতাড়ি যাইতে লাগিয়া গিয়াছে।"

কল্যাণকুমারী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা বাড়ী আসিয়াছেন না কি ?"

র। না, রাজাবাহাদুর বাড়ী আসেন নাই।

ক। তবে বাহিরের মহলে কাহারা আসিয়াছে ?

র। যুবরাজ বাড়ী আসিয়াছেন।

ক। দাদা ? তিনি কোথায় ?

র। এই আমি আলো ধরিয়া অন্দরমহলে রাখিয়া আসিয়া আবার বাহিরে যাইতেছি।

"যাও" এই কথা বলিয়া কল্যাণকুমারী অন্দরাভিমুখে গমন করিল। রমানাথ ঠাকুর পশ্চাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া কল্যাণকুমারীর অপরূপ রূপরাশি দেখিতে দেখিতে বহিঃপ্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল। দরজায় টাঙ্গান আলোকের ছায়াটা পড়িয়া যে স্থানটায় ঈষৎ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানে একটা কালো কুকুর পড়িয়া সুপ্তি-সুখ অনুভব করিতেছিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া কল্যাণকুমারীর অলোকসামান্য রূপ দেখিতে দেখিতে তন্ময়ভাবে যাইতে যাইতে রমানাথ ঠাকুর সেই কুকুরটার স্কন্ধে তাহার স্ফীতপদ চাপাইয়া দিল। অধম কুকুর ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শের মাহাত্ম্য বুঝিল না, সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া তাহার ভীষণ দন্তদ্বারা রমানাথ ঠাকুরের পাদদেশে দংশনাঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইল। "ওগো বাবা, গিয়াছি গো !" বলিয়া ঠাকুর চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কল্যাণকুমারী তখনও অধিক দূর যায় নাই,—সে ব্রাহ্মণের চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া পড়িল, এবং চীৎকারের কারণানুসন্ধানে কুকুর-দংশন জানিতে পারিয়া ভারি হাসি হাসিল, এবং চীৎকার-ধ্বনি-শ্রবণে সমাগত দাসদাসীগণকে জল আনিতে বলিল। কিন্তু তাহার হাসিটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়ায় রমানাথ ঠাকুর বলিল—"আমরা কাঙ্গাল গরীব, তোমাদের বাড়ী আছি, আমাদের বিপদে কি অতই হাসিতে হয় ?"

ক। উপায় নাই কি বলিতেছ দাদা? বাবা বৃদ্ধ বয়সে অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ হইবেন, জেলে পচিবেন, বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবেন,—আর আমরা তাঁহার সন্তান হইয়া গৃহে বসিয়া শান্তি-সুখ উপভোগ করিব? উপায় নাই কি বলিতেছ দাদা? প্রজার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াও,—তাহাদিগকে জলন্ত ভাষায় বল, তোমাদের জমিদার—তোমাদের রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় নবাবের অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ হইতেছেন,—এসময় টাকা না মিটাইলে কিছুতেই চলিবে না। যাহার যেমন সাধ্য, তেমনি দাও।

গো। সে চেষ্টা কি হয় নাই ভগিনি! যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কোথাও বা যথার্থ অভাবে আদায় হয় নাই, কোথাও বা বিদ্রোহী হইয়া টাকা দেয় নাই। যাহারা নিতান্ত ধর্ম্মশীল ও অনুগত প্রজা, তাহারাই দয়া করিয়া যে যাহা প্রদান করিয়াছে, তাহারই সমষ্টি ঐ দশ হাজার। সাধে কি আমি বলিতেছি, আর কোন উপায় নাই।

ক। সে উপায় না থাকে, জমিদারি বিক্রয় কর।

গো। এখন কে জমিদারি ক্রয় করিতে চাহে, বিক্রয়ের দিকে সকলেই।

ক। গোরু বাছুর।

গো। তাহার খরিদ্দার নাই। কিনিয়া রাখিবে কে? মগ ফিরিঙ্গী বা বর্গীরা সংবাদ জানিতে পারিলে খেদাইয়া লইয়া যাইবে।

ক। তবে সোণা রূপা মণি মুক্তা যাহা আছে, তাহাই বিক্রয় কর। গৃহ শূন্য কর,—স্ত্রীপুত্রের গাত্র শূন্য কর,—যেখানে যাহা আছে, একটি পয়সার জিনিসের সমষ্টি কর—চল দুই ভাই বোনে বিক্রয় করিয়া আসি। দাদা! স্মরণ কর, বাবা আমাদের জেলে—আমাদের অত্যাচারীর হাতে বন্দী।

কল্যাণী বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দরামের চক্ষু হইতে

জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। দূরে দাঁড়াইয়া চঞ্চলকুমারীও বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল।

গোবিন্দরাম বলিলেন,—"সোণা রূপা মণি মুক্তা বেচিয়া আর কত হইবে ভগিনি? নয় সে সকলে বিংশ সহস্র মুদ্রা হইতে পারে। অনেক ছিল, কিন্তু সেবার বর্গী পড়িয়া লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

কল্যাণী রক্তচক্ষুতে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"তবে কি সত্যই উপায় নাই?"

গো। আমি নিজে একবার হলদা পরগণায় যাইব ভাবিতেছি, সেখানে গিয়া যদি কিছু ভিক্ষাস্বরূপ আদায় করিতে পারি।

ক। তবে বাড়ী এলে কেন দাদা? টাকাগুলি বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া সেখানে গেলে না কেন?

গো। একবার তোমাদিগকে দেখিয়া যাইবার জন্য এ পথে আসিলাম।

ক। যাহার পিতা অত্যাচারের শৃঙ্খলে বন্দী, যাহার পিতার মস্তকে পিশাচের বেত্রদণ্ড উত্থিত—সে আবার কাহাকে দেখিবে দাদা? পিতার চেয়ে আর কে আছে দাদা?

গো। আগামী কল্য সকালেই আবার সে দেশে যাত্রা করিব।

ক। নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ অন্যান্য ছোট ছোট মহালে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংবাদ পাইয়াছ কি?

গো। হাঁ, পাইয়াছি—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অদ্য আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সুবিধা কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। আমি যাহা আদায় করিয়াছি, এবং তাঁহারা যাহা আদায় করিয়াছেন, সকলের সমষ্টি ঐ দশ হাজার।

কল্যাণী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল। মূর্ত্তি স্থির গম্ভীর। ভাবনা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়া গোবিন্দরামও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কোন কথা পাড়িলেন না। গোবিন্দরাম ভগিনীর স্বভাব ভালরূপই জানিতেন। তিনি জানিতেন, মনের মত কথা না হইলে কল্যাণী রাগিয়া ফুলিয়া মরিবে। আরও তিনি কল্যাণীকে চিনিতেন যে, কল্যাণী তাঁহার ছোট ভগিনী বটে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় ও পরামর্শে জ্যেষ্ঠ দাদার মত। কল্যাণী দর্পে ক্ষত্রিয়, ক্ষমায় ব্রাহ্মণ, স্নেহে রমণী।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কল্যাণী বলিল,—"দাদা, এক কাজ করিলে হয় না?"

গো। কি কাজ বোন্?

ক। যে টাকা আদায় হইয়াছে, আর আমাদের ঘরের মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া একজন বিশেষ বিশ্বাসী লোককে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দাও। তুমি হলদা পরগণায় যাও,—তুমি সেখানে গিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা কর। যে মুর্শিদাবাদ যাইবে, সে স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা বিক্রয় করিয়া বা পনর ষোল হাজার টাকা পায়, আর এই দশ হাজার—এই পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা আপাততঃ পঁহুছিয়া দিলে, আদায়কারিগণ বুঝিতে পারিবে, ক্রমে টাকা আসিতেছে। তাহাতে অত্যাচার না করিয়া বন্দী করিয়াই রাখিবে।

গোবিন্দরামও একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"সে পরামর্শ মন্দ নহে। কিন্তু পথে দস্যুভয়—যাহার হস্তে পাঠাইব, তাহাকেও অবিশ্বাসের ভয়।"

কল্যাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"বাবার আমি যদি মেয়ে না হইয়া ছেলে হইতাম, তবে আমি টাকা লইয়া যাইতে পারিতাম, আর তুমি জমিদারিতে যাইতে পারিতে। তা নৌকায় ক'রে, টাকা আর লোক জন সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে গেলে হয় না দাদা?"

গোবিন্দরাম সিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"তুমি যাবে? কি সর্ব্বনাশ! মুর্শিদাবাদ আর যমালয় এই দুয়ের মধ্যে তিলের পক্ষে [illegible]

ভাল। মরিয়া শান্তি পায়, মুর্শিদাবাদ গেলে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। তুমি যদি ও সঙ্কল্প কর, আমি আত্মহত্যা করিব। বাবার ভাবনা-তেই দিন কাটাইতে পারিতেছি না,—বক্ষঃপঞ্জর ধসিয়া যাইতেছে; আবার তুমি সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইতেছ?”

কল্যাণী স্মিতমুখে বলিল,—“তুমি যদি অসুবিধা বোধ কর, তবে আমি যাইব না। নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে টাকা ও সৈন্য দিয়া প্রত্যূষেই পাঠাইয়া দাও!”

গো। চল একবার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যে পরামর্শ হয় করিগে।

ক। হাঁ, তাই চল। আর এক কথা।

গো। কি?

ক। কেবল নায়েব মহাশয়কে না পাঠাইয়া তাঁহার সঙ্গে শিরোমণি ঠাকুর-দা’কে দিলে হয়।

গোবিন্দরাম হাসিলেন। বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত সে ক্ষীণ হাসি কল্যাণী ব্যঙ্গের হাসি বলিয়া বুঝিতে পারিল। বলিল,—“দাদা, হাসিলে যে?”

গো। শিরোমণি ঠাকুর-দা মুর্শিদাবাদে কি করিতে যাইবেন? এ ত হিন্দুরাজার মাতৃশ্রাদ্ধের বাড়ী নহে যে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সসম্মানে বিদায়ী প্রাপ্ত হইবেন।

ক। দাদা তুমি শিরোমণি ঠাকুর-দাকে চেন না। উনি শাস্ত্রে যেমন সূক্ষ্মদর্শী, বৈষয়িক বুদ্ধিতেও তেমনি বৃহস্পতি। উনি সঙ্গে গেলে কি করিয়া কোন্ কুল রক্ষা করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং নায়েব মহাশয়কে সেইরূপ পরামর্শ দিলে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন।

গো। হাঁ, পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয়ের খুব বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল বটে, কিন্তু

এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, কাণে ভাল শুনিতে পান না,—তবে চক্ষুর দৃষ্টিটা এখনও তীক্ষ্ণ আছে বটে! হাঁটিয়া হুঁটিয়া বেড়ানর তেমন শক্তি নাই। এ অবস্থায় তাঁহাকে কি পাঠান যায়?

ক। কিন্তু আমার বিবেচনায় উঁহাকে পাঠাইলে বড় ভাল হয়। বড় বিপদের সময়, ঐরূপ পাকা বুদ্ধিরই প্রয়োজন।

গো। তুমি যদি বিবেচনা কর, আর শিরোমণি ঠাকুর-দা যদি যাইতে স্বীকৃত হয়েন, পাঠাইলেই হইবে।

তখন ভাই ভগিনীতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া মাতার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। চঞ্চলকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"কমলে কণ্টক, কুসুমে কীট, বসন্তের নির্ম্মল আকাশে মেঘ, আর প্রণয়-বাসরে সংসারের কঠোর কোলাহল একই বিধাতার সৃষ্টি!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোষ্ঠবিহারের রাণী শরৎসুন্দরী এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে একখানি পালঙ্কের উপরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় থাকিয়া মহাভারত শ্রবণ করিতেছিলেন। পালঙ্কের পার্শ্বে অপর একখানি চৌকিতে বসিয়া গিরিবালা মহাভারত পাঠ করিতেছিল।

দাসী গিয়া সংবাদ জানাইল, কুমার গোবিন্দরাম আর কল্যাণকুমারী আসিতেছেন।

রাণী ভারত শ্রবণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, গোবিন্দরামও ভগিনী সমভিব্যহারে সেই সময় আসিয়া মাতৃ-চরণ বন্দনা করিলেন।

রাণী পুত্রের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দরাম বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে শারীরিক কোন অসুখ নাই। কিন্তু বাবার চিন্তাতে মানসিক সুখ মুহূর্ত্তের জন্যও পাইতেছি না।"

রাণীরও চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। কিন্তু পুত্র কন্যার সাক্ষাতে চক্ষুর জল পরিত্যাগ করা অবিধেয় বিবেচনায় চক্ষুর জল চক্ষে রাখিয়া বলিলেন,—"তুমি কি টাকা আদায় করিতে পার নাই?"

গো। সামান্য—দশ হাজার আন্দাজ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রা। রাজার আসিবার কথা ছিল, তাও এলেন না,—এতে ছেলে মেয়ে কাজেই ব্যস্ত হইতে পার ; কিন্তু ভয় কি—এলেন ব'লে!

কল্যাণী গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল,—"তোমার বাব' আমার বাবাকে জামাই লইয়া গিয়াছেন কি না, তাই আসিতে গৌণ হইতেছে, আমাদের বুঝাইতেছ যে, এলেন ব'লে—মাগো! সে যে বড় ভীষণ যায়গা! একটু জোর বাতাস লাগিলে যাঁহার গা ভাঙ্গে—তাঁহার কি সে সকল সহ্য হইবে?"

কল্যাণী কাঁদিল, গোবিন্দরাম কাঁদিলেন। এবার রাণীও: চক্ষুর জল রুদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইলেন না। সে জল গড়াইয়া গণ্ড প্লাবিত করিল। কিন্তু কল্যাণী ও গোবিন্দরাম কথা কহিলে যেমন তাহাদের বিকম্পিত স্বরে হৃদয়ের ভাব অবগত হওয়া গেল, রাণীর তেমন হইল না, তিনি বুঝি কথা কহিবার পূর্ব্বেই বুকের বেদনা বুকে চাপিয়া তবে কথা কহিয়াছিলেন।

তার পরে ভাই-ভগিনীতে যে সকল পরামর্শ হইয়াছিল, তাঁহারা তাহার সমস্ত মাতৃ-সমক্ষে নিবেদন করিলেন। মাতা শুনিয়া বলিলেন,—"ঐ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখনই শিরোমণি মহাশয়কে ডাকিবার জন্য আলো লইয়া দুইজন দাসী চলিয়া গেল। শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী একটু দূরে।

গোবিন্দরাম বলিলেন,—"শিরোমণি মহাশয় ততক্ষণ আসুন, আমি একটু বিশ্রাম করিগে।"

মাতা তাহাতে অনুমোদন করিলে, গোবিন্দরাম প্রাণারাম চঞ্চল-কুমারীর প্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিয়া গেলেন। শিরোমণি মহাশয়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া কল্যাণী মাতৃ-কক্ষেই অবস্থান করিতে লাগিল, এবং গিরিবালার হস্ত হইতে মহাভারতের পুথি খানা কাড়িয়া লইয়া জরাসন্ধবধোপাখ্যান পাঠ করিতে লাগিল।

গোবিন্দরাম ধীর পদবিক্ষেপে চঞ্চলকুমারীর কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন, এবং সেই স্থান হইতে সঙ্গীতের করুণ সুখের বেদনাপ্লুত একটু মধুর স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে মধ্য-যামিনীর বাঁশরীর বেহাগ রাগিণীর মত প্রবেশ করিল,—গোবিন্দরাম গৃহ প্রবেশ করিলেই সে সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে নিস্তব্ধে নীরবে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

গৃহমধ্যে কাচাধারে চারি পাঁচটি মোমবাতি জ্বলিতেছিল। একখানি দ্বিরদরদনির্ম্মিত পালঙ্কে মসলন্দের শয্যা আস্তৃত,—তদুপরি মুক্তার ঝালর দেওয়া একখানি চৈনিক রেসম বিনির্ম্মিত চাদর বিস্তৃত,—আশে পাশে চারিদিকে মখমলে বেষ্টিত কার্পাস তুলা প্রপূরিত বালিশের সারি,—তাহারই একটা বালিশে অঙ্গভার রক্ষা করিয়া, বাম হস্তোপরি মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক সুন্দরী চঞ্চলকুমারী অর্দ্ধশায়িতা। চারু চরণ দুইখানি সংলগ্ন,—যেন দুইটি স্থলপদ্ম একত্রে জড়িত। পরিধানের বসন ঈষৎ ঈষৎ ঈষৎ শ্লথ,—সম্মুখের পুষ্পাধারের স্তূপীকৃত সুরভি কুসুমরাশি হইতে সুগন্ধ লইয়া সমীরণ সুন্দরীর সেবার্থ ঈষৎ ঈষৎ ঈষৎ প্রবহমান হইতেছিল। আর বাহিরের রকের পার্শ্বে হইতে কামিনী ফুটিয়া তাহার গন্ধে সমস্ত দিক আমোদিত করিতেছিল।

গোবিন্দরাম বাহুবেষ্টন শ্লথ করিয়া ভগিনীর সহিত মাতৃ-সন্নিধানে চলিয়া গেলে, চঞ্চলকুমারীর প্রাণটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। প্রথম মলয় স্পর্শে লতিকাকে বৃক্ষচ্যুত করিলে কষ্ট হয় না কি? তাহার উপরে আবার ভাই-ভগিনীর কথোপকথনে সে শুনিয়াছিল, আগামী কল্য প্রত্যুষেই তাহার স্বামীকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইবে? তাই মুগ্ধা কাতরা চঞ্চলকুমারী স্বামি-বিরহা-শঙ্কাকুল হৃদয়ে একাকিনী শয্যার উপরে পড়িয়া অনেক ভাবিয়াছিল। শেষে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আপন মনে অনুচ্চস্বরে একটা গান গাহিতেছিল। সে জানিতে পারে

নাই যে, তাহার গান চুরি করিয়া আর একজন শুনিতেছে। সে গাহিতে ছিল,—

যদি দয়া ক'রে হেথা আসিয়াছ,
কেন মুহূর্ত্তের মাঝে যাবে চলিয়ে ?

আমি সারাটি জীবন ধরিয়ে
বিরহ-শয়নে জাগিয়ে
তব আসা-পথ চাহিয়ে
আছিগো সখা, যেওনা আমায় ফেলিয়ে।

আমি তব দরশন লাগিয়ে
ভাঙ্গা প্রাণখানি লইয়ে
দীরঘ দিবস কাটায়ে
যদি পেয়েছে দেখা, ওগো সখা, আর দিব নাক' ছাড়িয়ে।

তুমি যেওনা আমায় কাঁদায়ে'
যেওনা মরমে দলিয়ে
যেওনা পাগল করিয়ে
আমি তোমারি দরশ পরশ কারণে আছি গো জীবন লইয়ে।

তুমি এত কি নিঠুর হইবে
অধিনী বলিয়া কাঁদাবে
কি ফল তাহাতে লভিবে
আমি তোমারি বিরহে দীরঘ দিবস আছি অশ্রব-সাগরে ভাসিয়ে।

ক্রমে গান থামিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে গানের সুর নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিল, ক্রমে ক্রমে গানের রেসটুকু গোবিন্দরামের প্রাণের মরমে স্মৃতির কোলে ঢালিয়া পড়িল, কিন্তু গোবিন্দরামের মোহ ভাঙ্গিল না। কামিনী ফুলের গন্ধ যেন আরও ঘোরালো হইয়া আসিল,—ক্রীড়াশীল পরিমল-বাহী সমীর যেন আরও মধুর হইল, চাঁদের কিরণে যেন আরও সুধা

ঝরিল। মুগ্ধ হৃদয়ের চঞ্চল গতিতে দ্রুত গমন করিয়া গোবিন্দরাম চঞ্চল-কুমারীকে বাহুবেষ্টন করিয়া, তাহার ফুল্ল গণ্ডে দাম্পত্যের মিলন চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

গোবিন্দরামের জ্ঞান হইল, যেন যুগযুগান্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজি সাফল্য লাভ করিল। একটি অনন্যাসক্ত ক্ষুব্ধ লুব্ধ ক্লিন্ন হৃদয় লতার ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপুলকিত আলিঙ্গন-পাশে তাঁহাকে আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। আর চঞ্চলকুমারী ভাবিতেছিল, স্বর্গ আর কোথায়? স্বর্গই ত এই,—জগৎ সংসারের সমস্ত বাধা বিঘ্ন পরিহারপূর্ব্বক, কোন এক অখণ্ড শুভগ্রহবশে সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ লইয়া অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে বাস্তবভাবে অকাতরে তাহার প্রাণে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। আজিকার শুভ রজনী বুঝি বড় আনন্দোজ্জ্বল, বড় বেদনাপ্লুত, বড় উচ্ছ্বাসাকুল,—এই সুনিবিড় মিলন-বন্ধনের মধ্যেও যেন বড় বিরহ-বেদনা বিজড়িত। বুঝি এই নিশির অবসানে আবার দীর্ঘ বিরহ আগমন করিবে। চঞ্চলকুমারী ভাবিতেছিল, মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ বন্ধন এ সকল কেন? কেন বিধাতা কি উদ্দেশে এ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকলের যদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে মানুষ বাঞ্ছিতকে পূজা করে কখন? প্রেমের সাধনা যে সমাধি;—সমাধি ভঙ্গ হইবে কেন?

গোবিন্দরাম বলিলেন,—"অতি সুন্দর গাহিতেছিলে।"

মৃদু হাসিয়া লজ্জানম্রস্বরে অথচ ব্যঙ্গভাবে চঞ্চলকুমারী বলিল,—"বক্সিস লইবার জন্যে।"

গো। কাহার নিকট?

চ। যাহাকে শুনাইবার জন্য গাহিতেছিলাম,—যে চুরি করিয়া শুনিয়াছে।

গো। গায়িকাকে তাহার অদেয় কিছুই নাই।

চ। তথাপি যদি নূতন কিছু থাকে?

গো। চাহিবামাত্র প্রদত্ত হইবে।

চ। আগামী কল্য বিদেশ-গমন নিবারণ ভিক্ষা।

গো। সেটা ভিক্ষা নহে, ইচ্ছার অনুকূল। কিন্তু প্রাণাধিকে! কি বিপদের সময়, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ? আমার পিতা নবাবের ভীষণ অত্যাচার-আগুনে দগ্ধ হইতেছেন। আমার কি আত্মসুখের জন্য এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা কর্ত্তব্য!

চ। তবে এই রাত্রির প্রভাতেই বিদেশ যাত্রা করিবে?

গো। হাঁ, প্রিয়তমে।

চ। কবে আসিবে?

গো। তার কি কোন স্থিরতা আছে? যতদিন প্রয়োজনীয় টাকার সংগ্রহ না হয়, ততদিন মহাল হইতে মহালান্তর, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে হইবে। টাকা সংগ্রহ না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আর কি করিব?

চ। ও ভিক্ষা যদি না দিতে পারিলে, আর এক ভিক্ষা।

গো। সে কি?

চ। আমায় সঙ্গে লইয়া চল।

গো। সর্ব্বনাশ! স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া নাকি বিদেশে যায়!

চ। এত ভয় কেন? স্বামীর কায়ার রমণী ছায়া। স্বামী যেখানে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীও সেই স্থানে যাইবে। ইহাই ত শাস্ত্রের বিধান।

গো। সে বিধানের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে।

চ। কেন এবং কিসে ফুরাইল?

গো। যখন দেশে হিন্দু রাজা ছিলেন, দেশের লোক হিন্দুশাস্ত্রের অধীন ছিলেন। ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন লইয়া মানবগণ সংসারে বিচরণ করিতেন;—তদুপরি হিন্দুরাজার বাহুবলে প্রজা সকল শাসিত ছিল। ধর্ম্ম, অর্থ, রমণী প্রভৃতি সুরক্ষিত ছিল। এখন দেশে অরাজকতা—এখন যার যার, মুল্লুখ তার। কত বিদেশীয় জাতি, কত দস্যু, কত তস্কর এখন

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আসিয়া পূরিয়া পড়িয়াছে;—এখন সমস্তই বিশৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খলার দিনে ধন রত্নাদির সহিত জীবন-রত্নগুলিকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখাই কর্ত্তব্য।

চ। তোমরা যেমন এই অত্যাচারের দিনে স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে ভীত হও, আমরাও তেমনি অবিচারের দিনে স্বামীকে বিদেশ পাঠাইয়া বড়ই উতলা হইয়া পড়ি।

গো। কেন, বেদখলের ভয় নাকি?

চ। মিথ্যাই বা কি? কর্ত্তাদের যে হৃদয়ের বল!

গো। কেন, সে রকম কখনও দেখিয়াছ না কি?

চ। এই ত একটু আগেই দেখা গেল।

গো। কি দেখিলে?

চ। একটি সুন্দরী আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অজ্ঞান করিয়া আমাকেও বেদখল করিয়া লইয়া গেল।

গো। তোমার পোড়ার মুখ!

চ। ভয়ই ত সেই! যাহার ইঙ্গিত মাত্রে আমাকে দলিত করিয়া ছুটিয়া বাহির হইলে, তাহার সোণার মুখ, তাহার মত সুন্দরী দেখা যায় না—গুণেরও তুলনা নাই। তাই ত আমায় অবহেলা!

গো। তোমার সঙ্গে আমি কথা কহিব না।

চ। আর কেন! অমনটি পাইলে আর আমার মত নির্গুণা কুরূপার সহিত বাক্যালাপে প্রয়োজন কি?

গো। তোমাদের বুঝি হইয়া থাকে?

চ। ওমা; তা হয় না! এই তুমি যখন উপস্থিত না থাক, তখন দাসী-বাঁদী ও সহচরীগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, গল্প-গুজব করিয়া কাল কাটাই—কিন্তু তুমি উপস্থিত হইলে কি আর সে সকল ভাল লাগে? মনের মত পাইলে কি অন্যে চাহে?

সহসা এক জোড়া খড়মের খট্ খট্ শব্দ হইল। গোবিন্দরাম অর্গল-পথে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, স্বয়ং শিরোমণি মহাশয়। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দরোজার নিকটে আসিয়া নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কল্যাণীও আসিয়া জুটিল।

শিরোমণি ঠাকুরের রাজবাড়ীতে অবারিত দ্বার। তিনি এই বংশের চির-হিতচিকীর্ষু; বিশেষতঃ রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় নিজ গুরুদেবের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সাধনা সম্বন্ধে উপ-দেশাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কাজেই ইনি গোপীকৃষ্ণ রায়ের শিক্ষাগুরু। সেই সম্পর্কেই গোবিন্দরাম ও কল্যাণী ইহাকে শিরোমণি ঠাকুর-দা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ইনি রাজবাড়ীর পারিবারিক শিক্ষক। কল্যা-ণীকে ইনিই শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া থাকেন। তবে পিতার শিক্ষাগুরু বলিয়া কল্যাণী শিক্ষককে সেই সম্পর্কেই ডাকিত।

শিরোমণি মহাশয়ের বয়স অনেক হইয়াছে। আশী বৎসর আসি বলিয়া অনেক দিন বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে সদাচারী সাধনশীল ব্রাহ্মণের দেহ বলিয়া এখনও তাহা সুন্দর কর্ম্মঠ আছে। কিন্তু কোন কোন ইন্দ্রিয় কিয়ৎ পরিমাণে স্বকার্য্য হইতে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে,—তন্মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। মস্তকে চুল বলিতে নাই, নভোমণ্ডলের ন্যায় বৃহৎ টাক। দাড়ি-গোফ শূন্য আননেও শ্বেত চুল দর্শনের অভাব, কেবল জ্যোতিষ্মান্ কোটর গত বৃহৎ চক্ষু দুইটির উপরে কয়েক গাছি দীর্ঘ কেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া অতীতের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বর্ণ প[illegible]র মত,—দেহ দীর্ঘ ও মাংসল।

বৃদ্ধ [illegible]রোমণি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া গোবিন্দরামের মুখের দিকে খা[illegible] সহাস্য আস্যে বলিলেন,—"এত রাত্রে তলব কেন? গৃহিণীর কোন [illegible] আছে নাকি ভায়া?"

চঞ্চলকুমারী পালঙ্কের উপর হইতে মৃদু হাসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল,—"বায়না গৃহিণীর নহে, ভগিনীর।"

শিরোমণি মহাশয়ের রুদ্ধ কর্ণে সে কথার স্বরটুকুও প্রবেশ করিল না। গোবিন্দরাম মৃদু হাসিলেন,—দাদার অলক্ষ্যে কল্যাণী কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া চঞ্চলকুমারীকে এক কিল দেখাইল।

গোবিন্দরাম বলিলেন,—"শিরোমণি ঠাকুরদা, তোমাকে মুর্শিদাবাদ যাইতে হইবে।"

ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"আমাকে মুসুরীর ডাল খাইতে হইবে? কেনরে বাঁদর; আমি হবিষ্যাশী হইয়া মুসুরীর ডাল খাইতে গেলাম কেন?"

চঞ্চলকুমারী হাসিয়া পালঙ্কের উপর গড়াইয়া পড়িল। কল্যাণী এ ভোগ অনেক ভুগিয়া থাকে। তাহার এরূপ সহ্য করা আছে;—সে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল,—"মুসুরীর ডাল খাইতে হবে না,—"মুর্শিদাবাদ যেতে হবে।"

বামহস্তে রক্ষিত নস্যের কৌটা হইতে একটু নস্য লইয়া উভয় নাসারন্ধ্রে তাহা চালনা করিয়া দিয়া বলিলেন,—"ও, ম'ষ বলি দিতে হবে! তা বেশ বেশ, কেন মাননা ছিল নাকি? কোন্ মন্দিরে? কালীমন্দিরে, না জয়দুর্গার মন্দিরে?"

বিরক্তিস্বরে কল্যাণী বলিল,—"তোমারে যমের মন্দিরে দিতে পারিলে ভাল হয়।"

চঞ্চলকুমারী হাসিতে হাসিতে অনুচ্চস্বরে বলিল,—"বিরহ ম'ষকে ঠাকুর-ঝির হৃদয়-মন্দিরের সম্মুখে বলি দিয়ে ভাইবোনে মিলন [illegible] দাও।"

কল্যাণকুমারী এবার ভারি রাগিল। সে ঘুরিয়া গিয়া ভ্রাতৃজায়ার [illegible] ধরিয়া টান দিল, এবং তাহার দুটি গাল অঙ্গুলী দিয়া চাপিয়া চা[illegible]

ধরিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী! আবার বলিবি?" চঞ্চলকুমারীর তবু হাসি থামিল না।

শিরোমণি মহাশয় গোবিন্দরামকে বলিলেন,—"ও দিকে রণারম্ভ কেন?"

গোবিন্দরাম বলিলেন,—"তোমারই জন্যে ঠাকুর-দা!"

শিরোমণি ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"ও, বুঝিয়াছি; এ বলিতেছে আমি শিরোমণি ঠাকুরকে নেকা পুষিব, ও বলিতেছে আমি পুষিব। এই ঝগড়া! ঝগড়ায় মারামারি! তা যাক্,—ম'ষ মানসা কিসের জন্য ছিল?"

গোবিন্দরাম অপেক্ষাকৃত আরও উচ্চস্বরে বলিলেন,—"ম'ষ মানসা না ঠাকুর-দা, মুর্শিদাবাদ যাইতে হইবে।"

এইবার শিরোমণি ঠাকুর আসল কথা শুনিতে পাইলেন। ভ্রূভঙ্গি করিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে মুর্শিদাবাদে যাইতে হইবে কেন? তোমার পিতা সেখানে গিয়াছেন, তিনি ভাল আছেন ত?"

গো। শারীরিক কোন ব্যাধি না হইতে পারে, কিন্তু এখনও সমস্ত টাকা পাঠান হয় নাই। রাজস্বের টাকা বাকি থাকিলে নবাবের কর্ম্মচারী যেরূপ অত্যাচার করে, আপনার তাহা অবিদিত নাই। কতক টাকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি,—তাহাই লইয়া আপনাকে যাইতে হইবে।

গোবিন্দরাম কথাগুলি খুব উচ্চকণ্ঠেই বলিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বধিরগণ প্রথম আলাপে কথার সূত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তারপরে, কথার সূত্র পাইলে কতক বা বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কতক বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিয়া লইয়া থাকে।

শিরোমণি ঠাকুর গোবিন্দরামের সকল কথা বিশদ ভাবে বুঝিতে

না পারিলেও আসল কথাগুলির মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া লইয়া বলিলেন,—"আমি বুড়া মানুষ, অত টাকা লইয়া দূরদেশে যাইব! আজি কালি দেশের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত।"

কল্যাণী বলিল,—"ভরসা না হয়, ঠাকুরুণ-দিদিকে সঙ্গে লইবেন।"

শিরোমণি ঠাকুর কথাটি বেশ শুনিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"বুড়া মানুষের কাজ নয় পাগ্‌লি; তুমি যদি সঙ্গিনী হও—তবে ভরসা হয়।"

চঞ্চলকুমারী বলিল,—"ঠাকুরুণ-দিদির কথায় ত কালা কাণ দশ কাণের শক্তি পায়!"

কথাটা অবশ্য খুব অনুচ্চস্বরেই বলিয়াছিল।

তারপর গোবিন্দরাম শিরোমণি ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে নায়েব মহাশয়, কয়েকজন সাহসী সৈন্য ও পদাতিক যাইবে। এখনও অনেক টাকার অভাব আছে, তাহাই আদায় করিবার জন্য গোবিন্দরাম জমিদারিতে গমন করিবে,—নতুবা সমস্ত টাকা সংগ্রহ হইলে গোবিন্দরামই যাইতে পারিত।

শিরোমণি ঠাকুর বলিলেন,—"আমি যখন যাইব, তখন নায়েবকে আর সঙ্গে দিতে হইবে না। একজন চতুর অন্য কোন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিলেই চলিবে। নায়েবকে সঙ্গে লইয়া তুমি মহলে যাইও। হাজার হৌক, তুমি ছেলে মানুষ—প্রজাগণ এখন বিপন্ন, সুতরাং অবাধ্য বা বিদ্রোহী হইতে সময় লাগে না। নায়েব পুরাতন লোক।"

তাহাই স্থির হইল। গোবিন্দরাম আগামী কল্য প্রত্যূষেই জমিদারীতে যাইবেন, এবং শিরোমণি ঠাকুর পরশ্বঃ তারিখে যাত্রা করিবেন। কারণ, পশ্চিমে কল্য দিক্‌শূল।

তখন শিরোমণি ঠাকুর খড়ম ঠক ঠক করিতে করিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দুইজন দাসী আলো লইয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। কল্যাণীও আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

চঞ্চলা স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"দিক্‌শূলও আমার প্রতি বিমুখ! কা'ল পশ্চিমে দিক্‌শূল না হইয়া পূর্ব্বে হইতে পারিল না!"

গোবিন্দরাম বাহুবেষ্টনে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে বেষ্টিত করিয়া সোহাগে আদরে পুনঃপুনঃ মিলনের মোহ-মদিরা ঢালিয়া দিলেন।

বাহিরের সুধাকর-কর-প্লাবিত বকুলকুঞ্জ হইতে একটা পাপিয়া তাহার প্রাণের রাগিণী উদ্গীর্ণ করিয়া সমস্ত দিক্‌বালাকে মাতাইয়া দিল। তাহার হিংসায় মলয়া সুরভি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। পরিমল-চোরা পবনের দীর্ঘশ্বাসে পত্রান্তরালস্থিতা অর্দ্ধবিকসিতা কুসুম-কুমারীগণ চমকিয়া উঠিল, এবং শেফালী ঝরিয়া মাটিতে পড়িয়া বাস বিলাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইতেই রাজবাড়ীতে যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রাজপুত্র গোবিন্দরাম জমিদারীতে গমন করিবেন, কাজেই উদ্যোগ-ব্যাপারটা বেশ জমকাল রকমেই আরম্ভ হইয়াছিল। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, মিশ্রঠাকুর প্রভৃতির দল মালকোচ্চা কসিয়া, গায়ে তূলাগর্ভ আঙ্গরাখা আঁটিয়া, মস্তকে সওয়া তিনগজ লাল কাপড় চড়াইয়া, কেহ লাঠি, কেহ শড়কী, কেহ বল্লম, কেহ ঢাল তরবারি লইল। কয়েকজন শিক্ষিত সৈন্য অশ্বারোহণে সারি দিয়া দাঁড়াইল। নায়েব, মুহুরী, খাজাঞ্চী প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গও অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারের গমনসংবাদ প্রদান জন্য সকাল হইতে তোপধ্বনি হইতেছিল। সে তোপধ্বনি যেন বাতাসে মিশিয়া বলিতেছিল,—"আমি বৃথায় দিগন্ত কাঁপাইয়া দিতেছি। যাহাদের হস্ত কেবল দরিদ্রের কর আদায়ের জন্যই প্রসারিত, যাহাদের পদ দেহাত গমনেই অনুরক্ত, যাহাদের মস্তক বিদেশী শত্রুর অত্যাচার ও অনুজ্ঞা বহনেই নিযুক্ত,—তাহাদের জন্য আমাকে জ্বালান কেন? আমার যে শব্দ করিতে লজ্জা করিতেছে। আমার গর্ভে সীসা পূরিয়া ঐ শান্তসলিলা জাহ্নবীর মধ্যে ফেলিয়া দাও। আর আমাকে বৃথা রাখা কেন? কি

সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য আমায় রাখা? যাহার পিতা বিদেশীর কারাগারে অত্যাচারের আগুনে বিদগ্ধ হইতেছে, তাহার গমনে আবার আমি কিসের শব্দ করিব। আমার শব্দে লোক কি বুঝিবে?"

গোবিন্দরামের জন্য সুসজ্জিত শিবিকা লইয়া বাহকগণ বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতেছিল। শিবিকার চারিদিকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গোবিন্দরাম মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, চঞ্চলকুমারীর নয়নজল বসনাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া, ভগিনীকে আশীর্ব্বাদ করতঃ বহির্ব্বাটীতে গিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বাহকগণ শিবিকা তুলিলে আর এক-বার তোপধ্বনি হইল, এবং সৈন্য-কোলাহল মুখরিত করিয়া গোবিন্দ-রাম দেহাত যাত্রা করিলেন।

কল্যাণকুমারী সম্মুখে রমানাথ ঠাকুরকে পাইয়া বলিল,—"ঠাকুর, তোমার পায়ের ব্যথা সারিয়াছে?"

পাচকঠাকুর কল্যাণকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া ঘামিয়া পড়িল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"হাঁ, একটু সারিয়াছে। কিন্তু কুকুরের কামড়; ভরসা নাই,—আঠার বৎসর পর্য্যন্ত নাকি ওর ভয় থাকে।"

ক। ওর কোন উপায় নাই?

র। আছে। ও পাড়ার কেলো জেলের মা, এক ঔষধ জানে। তা খাইতে হয়, আর সাতটা কূপ দর্শন করিতে হয়।

ক। সে ঔষধ তুমি কেন খাও না?

র। তাহা খাইয়াছি,—কূপ দর্শনও করিয়াছি।

ক। ঠাকুর! এক কাজ করিতে পার?

র। কি কাজ?

ক। তুমি একবার শিরোমণি ঠাকুর-দাকে ডেকে আন ত। বলিবে, কল্যাণী ঠাকুরাণী আপনাকে এখনই একবার ডাকৃচেন। যদি বলেন,

বৈকালে পড়াবার সময় সাক্ষাৎ হবে। তুমি ব'লো—না, এখনই তাঁর বিশেষ দরকার।

র। আমি যে এখন জয়দুর্গার মন্দিরে পূজার উদ্যোগ করিতে যাব।

ক। এখনও পূজারি-ঠাকুর আসেনি। তুমি দৌড়ে ঘুরে এস। তোমাকে আমি এক যায়গায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

রমানাথ ঠাকুর আর কোন কথা কহিল না। তাহার মুখখানা যেন মুহূর্ত্তে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কুক্কুরদংশিত ব্যথিত পদে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে শিরোমণি ঠাকুরের বাড়ী-অভিমুখে দৌড় দিল।

তখন কল্যাণকুমারী ধীর পদ বিক্ষেপে চঞ্চলকুমারীর কক্ষে গিয়া দর্শন দিল। চঞ্চলকুমারী তখন উপাধানে মস্তক গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। কল্যাণকুমারী তাহার মস্তকের আলুলায়িত কুন্তলের এক গোছ ধরিয়া টান দিল। চঞ্চলকুমারী চাহিতেই কল্যাণকুমারীকে দেখিতে পাইয়া ঈষৎ লজ্জিতা, ঈষৎ ক্ষুব্ধা, ঈষৎ কাতরা হইয়া উঠিয়া বসিল। অঙ্গের বসন আলুথালু, মস্তকের কেশপাশ বিক্ষিপ্ত,—বর্ষণবিশিষ্ট নীল মেঘখণ্ডের ন্যায় চক্ষু উদাস ও জলভারাক্রান্ত, মুখখানি বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায়।

কল্যাণকুমারী বলিল,—"আচ্ছা যা হোক্! বরকে কি আঁচলে বেঁধে রাখ্‌তে চাও—না, মাদুলিতে পূরে গলায় ঝুলিয়ে রাখ্‌তে চাও, ভাই? বেটাছেলে,—দশ যায়গায় যাবে আস্‌বে, সংসারধর্ম্মের কাজকর্ম্ম দেখ্‌বে,—এত বড় বিশাল জমিদারির অধিপতি—এত লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তোমার আঁচল ধ'রে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে কেন না? এস, উঠে এস, আমার ঘরে যাবে,—গিরির গান শুন্‌তে তুমি ভাল বাস, তাকে ডেকে ননদ-ভাজে গান শুনি গে।"

চঞ্চলকুমারী পালঙ্ক হইতে নামিয়া কল্যাণকুমারীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ইচ্ছা করিতেছিল, তাহার চক্ষুর জল মুছিয়া ননদের

নিকট লুকাইয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহাতে আরও বিপদ ঘটিল,—সঞ্চিত জল একেবারে একত্রে বাহির হইয়া পড়িয়া সমস্ত গণ্ড ভিজাইয়া দিল।

কল্যাণকুমারী বলিল,—"শোন ভগিনি! মানবজীবন কেবল আত্মসুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাহা যদি জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তবে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাত্রি-দিবা, আলোক-অন্ধকার এই দ্বিভাবের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না। জীবন-সঙ্গীত যদি কেবল পঞ্চমের ঝঙ্কার লইয়াই গীত হইত, তবে মানবের মানবত্ব বুঝি থাকিত না। মানুষ চায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ,—কিন্তু সুখ ত একদেশদর্শী নহে, আমরা সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য ও স্ফূর্ত্তি হইলে বুঝি সব তাতেই সুখ আছে। তুমি তোমার বাঞ্ছিতের বিরহে কষ্ট পাইতেছ,—কাঁদিয়া আকুল হইতেছ, কিন্তু এই বিরহেও সুখ নাই? বাঞ্ছিতের ধ্যানে যে সুখ, মিলনে বুঝি তাহা নাই।"

চঞ্চলকুমারী গলা ঝাড়িয়া আঁচলে চোখ মুখ মুছিয়া বলিল,—"সব বুঝি ভগিনি; কিন্তু মন প্রবোধ মানে না।"

গিরিবালা তাহার তন্বীরূপের প্রভা বিকীর্ণ করিয়া এই সময় আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল, কল্যাণকুমারী বলিল,—"আমি তোকে ডাক্‌তে পাঠাইতেছিলাম। আপনিই আসিয়াছিস্, ভালই হইয়াছে।"

গি। কেন আমাকে ডাকিতে পাঠাইতেছিলে দিদি?

ক। রাই আমাদের বিরহ-বিকারগ্রস্ত। একটা গানটান গাহিয়া চিত্তবিনোদন করিতে হইবে।

গি। কমলিনীকে অনুরোধ কর, অধিনী সখীর কিঞ্চিৎ মাসিক বেতনের বন্দোবস্ত করা হউক। সময় অসময়ে আসিয়া হাজির হইয়া গান শুনাইয়া চিত্তবিনোদনে যত্ন পাইবে।

কল্যাণকুমারী কথা না কহিতে চঞ্চলকুমারী বলিল,—"ঠাকুরজামাই আসিলে, বেতনের কথা মুকাবেলা করিয়া দিব।"

গিরিবালা বলিল,—"সকলে কি আর সমান? বেতনের ন বাদ দিয়া ঘন ঘন দিতে পারিবে। এখন কি গান গাহিতে হইবে?"

চ। গানে আর প্রয়োজন কি? প্রাণে শান্তি না থাকিলে, গানে কি মিলিতে পারে?

ক। তা পারে বৈ কি। অন্যমনস্কতাই ভুলিবার ঔষধ।

চ। তা বটে; কিন্তু ভুলিতে ইচ্ছা করিলে, সেই ইচ্ছাই যেন কষ্টকর হয়।

ক। অত ব্যাখ্যানে আর কাজ নাই। একটা গান হউক।

চ। তা কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হইবে, না বসিবার প্রয়োজন আছে?

ক। আমার ঘরে যাওয়া হইবে, কি এইখানেই হইবে?

চ। গিরিবালা যখন এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে, তখন না হয়, এইখানেই বসা যাউক।

তাহাই স্থির হইল। প্রকোষ্ঠান্তরে কুসুম-কোমলনিভ শয্যা মেঝের উপরে আস্তৃত ছিল। তিন জনে তাহার উপর গিয়া উপবেশন করিল। গিরিবালা গাহিল,—

ওগো, সারাটি জীবন তোমারি ধ্যানে রহিব মগনা আমি,
যখন হবে অবসর মুহূর্ত্তের তরে দেখা দিয়ে যেয়ো তুমি।

আমি, একাটি বসিয়া রহি,
তুমি, সুদূর অন্তরে চাহি,
মোহিয়ো হৃদয় বাঁশরীর তানে তুলি বেহাগ-করুণ ধ্বনি।

হবে, আবেশে অবশ প্রাণ,
মুদে আসিবে দু'নয়ান,
ঘুমে আলুথালু সোহাগ-বিধুর সারাটি রজনী থাকি।

হবে, পাপিয়া ডাকিয়া সারা
যমুনা আপনা হারা
মেদুর পবনে ফুটিবে কাননে কুসুম-হৃদয়-মণি।

পরাণে এসুখ 'ধার'
মিলেনা কিছুতে আর
বঁধু, দেখি দেখি দেখি দেখিনা তোমার চাঁদ বয়ান খানি।

আকুল ব্যাকুল আশ,'
সুখের বেদনা রাশ,'
ভ্রমিবে হৃদয় তব পদপাশে কাটাব' বিরহ-যামি।

গিরিবালা গান গাহিতেছিল,—গান গাহিবার সময় তাহার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। সমীর-সংস্পর্শে অলকগুচ্ছ কপোলের উপর স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল,—কৃষ্ণতার নয়ন দুইটি কখন ঈষৎ সঙ্কুচিত, কখন ঈষৎ প্রসারিত হইয়া ভুবনবিজয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুখের বিষয়, কোন পুরুষ শ্রোতা সেখানে তখন উপস্থিত ছিল না। থাকিলে বুঝি তাহার অবসাদ ঘটিত। ঈর্ষাবশতঃ বকুল বৃক্ষের পত্রান্তরাল হইতে একটা কোকিল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

গান সমাপ্ত হইলে, কল্যাণকুমারী চঞ্চলকুমারীর গালে এক ঠোনা মারিয়া বলিল,—শুনলে গরবিণি!—"প্রেম করিতে হইলে ধ্যান করিতে হয়। প্রেমের ধ্যানেই সুখ।"

চঞ্চলকুমারী সে কথার কোন উত্তর করিল না। একটু হাসিয়া ঠাকুরঝির মুখের উপর আবেশ-তরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। হাসিতে তাহার গোলাপী গণ্ডে টোল খাইয়াছিল,—তাহাতে সৌন্দর্য্য যেন আরও ফুটিয়া উঠিল।

সহসা বাহিরে খড়মের ঠক ঠক শব্দ হইল। গিরিবালা বলিল,—"শ্যাম বঁধু বুঝি কমলিনীর কুঞ্জে উপস্থিত। রাই ধনি! আমরা এখন বিদায় হই?"

কল্যাণকুমারী হাসিয়া বলিল,—"ব্রজের শ্যামের বাঁশী শুনিয়া গোপীরা তাঁহার আগমন-সংবাদ অবগত হইতে পারিত, আর আমরা আমাদের শিরোমণি-ঠাকুরদা-শ্যামের আগমনবার্ত্তা কাষ্ঠপাদুকাধ্বনিতে অনুভব করিয়া থাকি। কেমন, কমলিনি;—আমরা তবে যাই?"

চঞ্চলকুমারী প্রকাণ্ড এক কিল দেখাইল।

ইত্যবসরে শিরোমণি ঠাকুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কল্যাণী এখানে আছ নাকি? আমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছ কেন? এক মুহূর্ত্ত যেন চোখের আড় করিতে পার না?"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"যম রাজা তোমাকে বড় অধিক আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিতেছে কি না,—তাই ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা চোখের কাছে রাখি।"

কথাগুলার একবর্ণও শিরোমণি ঠাকুরের কর্ণপটহে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। তিনি কল্যাণীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"কি খবর?"

ক। মুর্শিদাবাদ যাইবার আয়োজন হইতেছে ত?

কথাগুলা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়ায় এবং পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকায় শিরোমণি ঠাকুর শুনিতে পাইলেন। বলিলেন,—"যাইবার আবার উদ্যোগ কি বোন্? সঙ্গে লইবার মধ্যে এই নামাবলী, আর নস্যের কৌটা,—তার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন কি বল? যখন রাজসৈন্য নৌকায় উঠিয়া আহ্বান করিবে, আমিও গিয়া হাজির হইব।

ক। বলি, ঠাকুরুণ-দিদির নিকট বিদায়-টিদায় লওয়া হইয়াছে ত?

শি। ভগিনি! সে সকল বড় একটা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রয়োজন হয় না। বিদায়কালে গৃহিণীর চক্ষুর জল, "হা হতোস্মি" প্রভৃতি বাঁধা

গদের অবতরণ, কোথাও বা কচিৎ ভূতলে পতন,—তারপরে হয়ত বিরহ-সঙ্গীতের উচ্চতান,—এসকল দরিদ্রের গৃহে নাই। বড় জোর একবার জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিবে,—নয় ত ছল ছল নয়নের একটু তরল স্নেহ! দরিদ্র গৃহিণীদের মকরকেতনের পঞ্চশরে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সংসারের খাটুনিতে বোধ হয় প্রাণের ত্বক্‌টা কিছু অধিক রকমে পুরু হইয়া পড়ে,—সুতরাং কুসুমশরের কোমলাঘাত সেখানে প্রবেশে অক্ষম। দধীচির অস্থি-বিনির্ম্মিত আস্ত বজ্র চালাইলে যদি তাহা ভেদ হয়। রাজকন্যা, রাজবধূ বা সুখ-পালিতা কুসুমকোমলপ্রাণা কামিনীগণের প্রতি মীনকেতনের প্রতাপ! বিশেষতঃ তোমার ঠাকুরুণ-দিদি এখন আমার আশা ছেড়ে দিয়ে, পুরুষান্তরে প্রণয় করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

ক। (হাসিয়া) তিনি কে ঠাকুর-দা ?

শি। কেন, যম।

ক। তোমার ঈর্ষা হয় না ?

শি। তা হয় বৈ কি! তাইজন্যে লড়ালড়ি ক'রে, সে মুখো যেতে দিই না। নতুবা যে হাঁপানির ব্যারাম আছে, এতদিন আমাকে পক্ক রম্ভা প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন্ কালে সেখানে গমন করিত।

ক। বলি, বিদেশ যাবার কথা তাঁকে শুনিয়েছ ?

শি। হাঁ, তা শুনাইয়াছি।

ক। শুনে কি, আমার দাদা বিদেশ যাবেন ব'লে আমাদের বৌ যেমন ধরাশায়ী হয়েছেন, তেমনি হ'লেন ?

শি। শুনে বলিলেন, তা যাও যাও,—রাজবাড়ীর বরণডালায় যে একছড়া অপক্ক রম্ভা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আসন্ন-পক্ক,—দুই জনে খাইলে উদর পরিতোষ হইত না,—এখন একা কলা খাইয়া প্রাণ ভরিয়া দু'দিন হাঁপাইয়া লইব।

ক। ঠাকুর-দা, বিদেশ যাচ্চ, একটা সেবাদাসী ত সঙ্গে থাকা চাই,—ঠাকৃরুণ-দিদিকে সঙ্গে নাও না কেন?

শি। কোন উপকারে আসিবে না ত। তোমরা তিনটির একটি যদি যাও,—নয় নয়নবাণে মুসলমানকর্ম্মচারীর হৃদয় বিদ্ধ ক'রে, রাজাকে উদ্ধার করিতে পারি। আমাদের এখন বলের মধ্যে চোখের বল। কাঁদিয়া —চক্ষুর জল ফেলিয়া যাহা করিতে পারি। কিন্তু যাহার তাহার চক্ষুর জলে বড় একটা কিছু হইয়া উঠে না,—যাহার শতদলের ন্যায় চল চল নয়ন,— আঁখিজল তাহারই সাজে, এবং পরের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হয়।

ক। সেইজন্যই ত ঠাকুরুণ-দিদিকে সঙ্গে লইতে পরামর্শ দিতেছিলাম।

শি। সে চক্ষু শতদল হউক, আর সহস্রদল হউক, কিন্তু কাঁদিলে জল কেহ দেখিতে পাইবে না, গর্ত্তের জল গর্ত্তেই থাকিবে। এই সংবাদ লইবার জন্যই কি আমাকে ডাকা হইয়াছিল?

ক। আরও একটা কথা আছে।

শি। সেটাও হইয়া যাক্।

ক। সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে হইবে। তোমার সহিত কথা কহিতে হইলে ত ঢাক ঘাড়ে করিতে হয়,—আমার গৃহে চল, আমি লিখিয়া দেখাইয়া প্রত্যুত্তর লইব।

"তবে তাই চল।" বলিয়া শিরোমণি ঠাকুর গৃহের বাহির হইয়া খড়ম ঠক ঠক করিতে করিতে কল্যাণীর প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন। কল্যাণীও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

প্রতিশোধ লইবার অত্যন্ত সুযোগ বুঝিয়া চঞ্চলকুমারী নাতি উচ্চকণ্ঠে দুইবার হুলুধ্বনি করিল। কল্যাণী ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,— "এর শোধ আসিয়া লইব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শিরোমণি ঠাকুরের সহিত প্রবেশ করিয়া কল্যাণী তাঁহাকে বসিতে বলিল। কল্যাণীর গৃহে নিত্য বৈকালে বৃদ্ধ শিরোমণি ঠাকুর আগমন করিয়া থাকেন,—নিত্য তাহাকে ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন। কাজেই সে গৃহে তাঁহারই জন্য সুসজ্জিত নির্দ্দিষ্ট আসন পাতা ছিল। তিনি তাহাতে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন,—"পাগ্‌লি! কি বায়না আছে বল্?"

কল্যাণী বুঝিল, দুষ্ট বুড়া কথা পাড়িবার আগেই হয় ত বুঝিয়া লই-য়াছে। কল্যাণী কোন কথা না বলিয়া একখানা লিখিত কাগজ বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিল। এই লিপিখানি এবং ইহার পরে প্রদত্ত হইবে বলিয়া অপর আর একখানি কল্যাণী পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিল।

শিরোমণি ঠাকুর লিপি পাঠ করিয়া, শ্মশ্রু গুম্ফ ও কেশ-সম্পর্করহিত মুখখানি কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন,—"তা কি হয় পাগ্‌লি?"

গম্ভীর মুখে উন্নত স্বরে কল্যাণী বলিল,—"কেন হয় না ঠাকুর-দা?"

শি। মুসলমানের রাজত্বে সৌন্দর্য্য আর যৌবনের বড় ভয়।

ক। পুরুষের না স্ত্রীলোকের?

শি। উভয়েরই।

ক। (হাসিয়া) তবে তুমি যাইবে কেমন করিয়া ?

শি। (হাসিয়া) ব্রাহ্মণীর চক্ষে আর তোমার চক্ষে আমার ও দু'টোর অস্তিত্ব এখনও বিলুপ্ত না হইয়া শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইলেও অন্যের নিকটে ভয় নাই।

ক। আমারও যাহাতে ভয় না থাকে, তাহা করিব।

শি। কি করিবে ?

"যাহা করিব, তাহা এই দেখ।" এই কথা বলিয়া কল্যাণী তাহার বামহস্তধৃত অপর লিপিখানি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিয়া বলিল,—"ভয় উভয়তই, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তুমি পুরুষ সাজিলেও অব্যাহতি পাইবে না। সুন্দর, সর্ব্বত্রই সুন্দর।"

ক। পুরুষ সাজিলে অন্দরে ভয়,—তার জন্য কিছু আসিয়া যাবে না। আমি যাব। বাবাকে না দেখিয়া আর আমি কিছুতেই প্রাণ বাঁধিতে পারিতেছি না।

শি। শোন কল্যাণি! তোমাকে লইয়া গেলে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যদিও তুমি পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যাইবে, কিন্তু প্রকৃত সমজদারের চক্ষুতে তোমার স্বাভাবিক নারীরূপ কি লুক্কায়িত থাকিবে ? বিশেষতঃ সেখানে তোমার পিতা যে রাজ-সম্মানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা নহে। মুসলমানগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য যেরূপ পাশবিক অত্যাচার করে, তাহা দর্শন করিলে তুমি কখনই আত্মবল রক্ষণে সমর্থা হইবে না। আরও আছে, যদি কোন প্রকারে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, তুমি রমণী, আর তোমার সৌন্দর্য্য যদি কাহারও নয়নে পতিত হয়, তবে যে কাণ্ড ঘটিবে,—তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ?

কল্যাণী দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার বড় বড় নীলপদ্মের মত চক্ষু দুইটি স্থির ভাস্বর—মুখভাব প্রসন্ন। সে এক দৃষ্টে উদাস চাহনিতে

বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, কল্যাণী কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলের প্রতিভা কখনও ফুটিতেছিল, কখনও নিভিতেছিল,—গোলাপ-কোরক-সম্পুট ওষ্ঠপুট এক একবার ঈষৎ স্ফীত, ঈষৎ কম্পিত, ঈষৎ সঙ্কুচিত হইতেছিল। বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে, নবোদিত মেঘমালার প্রতি চাতকের ন্যায়, একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। এতক্ষণে মেঘ বর্ষিল, চাতকের তৃষা ভাঙ্গিল। কল্যাণী বলিল,—"আমি যা বলিব, তুমি কি তাহা শুনিতে পাইবে ঠাকুর-দা?"

বৃদ্ধ ঠাকুর-দা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একই বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া আছেন, এতদবস্থায় শ্রবণশক্তির একটু প্রখরতা স্বতই হইয়া থাকে, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কি বলিতেছ বল, সকল না হইলেও যাহা শুনিতে পাইব, তাহাতেই তোমার মনের কথা বুঝিয়া লইতে পারিব।"

ক। আমি যাইব।

শি। তাহা ত পূর্ব্বেও শুনিয়াছি; এখন আর কি নূতন আছে, তাহাই বল।

ক। আমি তোমার শিষ্যা,—অনেক দিন হইতে আমাকে শাস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিতেছ, আজিও কি আমায় অবিশ্বাস কর? আমি কি এখনও আত্মরক্ষায় সমর্থ হই নাই? হয় আমাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবে; আর না হয়, আত্মহত্যায় অনুমতি দিবে। যদি আমাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যাও, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আমার জন্য তোমাদের কোন বিপদই হইবে না। আমি সর্ব্বপ্রকারেই আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইব।

শিরোমণি ঠাকুরও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া, বলিলেন,—"রাণী-মাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছ?"

ক। না।

শি। তাঁহাকে বলিতে হইবে।

ক। বলিলে তিনি সম্মত হইবেন না।

শি। তাঁহাকে না বলিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে পারিব না। শেষে কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শূলে চড়াইতে চাও ?

ক। কেন ?

শি। আমার সহিত লুকাইয়া গেলে লোকে বলিবে, রাজকন্যা শিরোমণি ঠাকুরের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

ক। তাহাতে ঠাকুরণ-দিদির আত্মহত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

শি। সেটাও কম নহে। রহস্য যাউক,—রাণী-মাকে আমি বুঝাইয়া বলিলে, তিনি সম্মতা হইতে পারেন।

ক। তবে সে ভার আপনার উপরে। আমি যাইবার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় ও যথাযথ সজ্জাকরণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমায় কথা দিয়া যান,—আমাকে সঙ্গে লইবেন।

শি। তাহাই হইবে।

ক। পাচক ব্রাহ্মণ রমানাথকে সঙ্গে লইতে হইবে।

শি। কেন, তাহাকে কেন ?

ক। লোকটা পরম বোকা,—অধিকন্তু সম্ভবতঃ আমার রূপের মোহে খানিকটা মুগ্ধ। রূপ-মুগ্ধ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান খুব কম থাকে। সুতরাং তাহার দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে।

বৃদ্ধ কল্যাণীকে চিনিতেন। হাসিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং এক টীপ নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া খড়ম বাজাইতে বাজাইতে রাণী-মার প্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণীও উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে একটু ক্ষীণহাসি খেলিয়া

গেল। হৃদয়ের রুদ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরিচারক রমানাথ ঠাকুরের সন্ধানে গেল।

অধিক দূর যাইতে হইল না। অন্দরমহলের পথেই রমানাথের দর্শন পাইল। রমানাথ জয়দুর্গার মন্দির হইতে পূজার একথানি নৈবেদ্য লইয়া রাণী-মার গৃহে যাইতেছিল। রাণী-মা জয়দুর্গার প্রসাদ আসিলে তবে জল খাইবেন।

রমানাথ ঠাকুর ফুলে মেলের নৈকষ্য কুলীন। দেশে তাঁহার সাত আটটি বিবাহ হইয়াছে,—দেশ বিক্রমপুর। বিবাহ-অন্তে শ্বশুর মহাশয়-দিগের কুলরক্ষা করিয়া বহুদিন তিনি গোষ্ঠবিহারে আগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ত্রিংশৎবর্ষের অধিক হইবে না। দেহথানি সার্দ্ধ-দ্বি-হস্তের উর্দ্ধ হইবে না; না হউক, কিন্তু উর্দ্ধের পরিমাণ বিস্তৃতিতে পোষাইয়া লইয়াছে—পাশে স্বাভাবিক অবস্থারও কিছু উপরে। মস্তক মুণ্ডিত এবং তদগর্ভে চক্রাকৃতি কিঞ্চিৎ স্থান লইয়া অতীতের সাক্ষিস্বরূপ কতকগুলি কেশ অবস্থাপিত,—তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হস্ত; সেগুলি শিথা নামে অভিহিত। কণ্ঠদেশের উর্দ্ধপরিমাণ আমরা ঠিক করিয়া বলিতে অপারগ,—কেন না, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চক্ষুতে রমানাথ ঠাকুরের কণ্ঠদেশ কথনও পতিত হয় নাই। বক্ষোদেশে ও মুখ-কমলে গাঢ় প্রণয় হইয়া যাওয়াতে তাহারা দিবারাত্রি মিশামিশি করিয়া কালযাপন করিত। বর্ণ কালো নহে, গৌরও নহে,—পাঙ্গাশে। মুখে দাড়িগোঁফের চিহ্নমাত্রও নাই। রমানাথ বাল্যকালে পাণিনি ব্যাকরণের কিঞ্চিদংশ আবৃত্তি করিয়াছিল, একটি সূত্রও ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যয়ন করে নাই;—না করুক, কিন্তু রমানাথের ধারণা, সে সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী এবং সাধারণকে তাহা অবগত করাইবার জন্য সে কথায় কথায় উদ্গীর্ণ দর্ভকবলের মত মুখস্থ সংস্কৃত শ্লোক মানব মানবীর সম্মুখে ঢালিয়া দিত। বলা বাহুল্য, তাহার সকলগুলি যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইত, তাহা নহে এবং সকলগুলির অর্থবোধ

করিয়াও সে বলিত না। তবে তাহার মুখস্থ পুঁজির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না।

কল্যাণীর অপরূপ রূপ—তাহার চক্ষুতে লাগিয়াছিল। সে যখনই কল্যাণীকে সম্মুখে দেখিত, তখনই সে রূপের দীপ্তিতে দিশেহারা হইয়া পড়িত।

কল্যাণী বলিল,—"ঠাকুর! তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

ঢোক গিলিয়া ঘামিয়া সমস্ত বুকখানার ধড়ফড়ানি চাপিয়া ধরিয়া—রুদ্ধশ্বাসে রমানাথ কল্যাণীর সুন্দর মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে সক্ষম হইল না।

কল্যাণী বলিল,—"মার ঘরে প্রসাদ পঁহুছাইয়া দিয়া আমার ওখানে যাইও—বুঝেছ ?"

রমানাথের সমস্ত অঙ্গে বিদ্যুতের বিষম ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছিল। সে মস্তক সঞ্চালনে সম্মতি জানাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাণী-মার প্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিয়া গেল। কল্যাণীও আপন কক্ষে ফিরিয়া গেল।

দুইজন দাসী পুষ্পবাসিত তৈল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এবং বারেন্দায় বৃহৎ বৃহৎ পিত্তলপাত্রে ঈষদুষ্ণ সুবাসিত স্নানীয় জল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

একজন দাসী বলিল,—"বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও আপনাকে স্নান করান হয় নাই, রাণী-মা শুনিয়া বকিতেছিলেন।"

রমণীদ্বয় কল্যাণকুমারীর দাসী, কল্যাণকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোরা মায়ের ঘরে কিজন্য গিয়াছিলি ?"

দাসী বলিল,—"তুমি বৌ-রাণীর ঘরে ছিলে, তাই ঐদিকে বেড়াতে বেড়াতে গিয়াছিলাম।"

ক। শিরোমণি ঠাকুরকে ওখানে দেখলি ?

দা। হাঁ দেখ্‌লাম,—তিনিই ত রাণী-মার সাক্ষাতে, তোমার যে এখনও স্নান হয় নাই, তাই বল্লেন।

তখন কল্যাণকুমারী একখানা চৌকির উপরে উপবেশন করিল। দাসীদ্বয় তাহার কুসুম-কোমল অঙ্গে কুসুম-বাসিত তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল। স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কল্যাণকুমারী কেবল দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তথায় রমানাথ ঠাকুর আসিয়া হাজির হইল, এবং কল্যাণকুমারীর তখনকার রূপ দেখিয়া—দেখিয়া দেখিয়া সে মুগ্ধ-প্রাণ—আরও মুগ্ধ হইতে লাগিল।

শোলার ফুলে জল মাখাইলে যেমন পরিপুষ্ট ও সমধিক সুন্দর দেখায়, তদ্রূপ রমণীগণেরও জলসিক্ত অঙ্গ সমধিক সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া থাকে। স্বভাবসুন্দরী কল্যাণকুমারী স্নানান্তে দাঁড়াইয়াছে,—কাজেই সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া পড়িতেছে,—তখনও চুলের রাশি আষাঢ়ের নবীন মেঘের মত সমস্ত পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছিল, এবং কুসুমবাসিত তৈলগন্ধ চারি-দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল,—মুগ্ধনেত্রে রমানাথ তাহা দেখিতেছিল।

এস্থলে একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া রাখিতে হইতেছে। শোলা[র] সহিত রমণীগণকে উপমিত করায়, সুন্দরী পাঠিকাগণ ভীষণ ক্রুদ্ধা হইয়[া] নাসিকা কুঞ্চন, কেহ কেহ বা আমার উপর গালিবর্ষণ করিতে পারেন,—তবে তাহাতে ততটা ভয় না করিলেও চলিতে পারে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কটূক্তি প্রয়োগ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু এতৎপা[ঠে] স্বয়ং গৃহিনী যখন রুদ্রচণ্ডী হইয়া বসিবেন, তখন উপায় নাই! তবে সত্যকথার মার না থাকিতে পারে,—শোলা অত্যন্ত লঘু; মেয়ে মানুষও তাহাই। যেহেতু স্ত্রীলোকে ভারবত্তা কোন কালেই নাই। শোলা এক বিন্দু অগ্নির পতনে পুড়িয়া খাক হইয়া যায়,—রমণীও একবিন্দুর দাহে পুড়িয়া দগ্ধ হয়। ছিদ্র কলসীতে শোলা গুঁজিয়া জল লওয়া চলিতে পারে। পুরুষ শতছিদ্র—বোধ হয়, রমণী সেখানে শোলা হইয়া মা[ন]

গুঁজিয়া তাহাকে জল বহনের উপযোগী করিয়া রাখিতে পারে। শোলা বাতাসে উড়ে, রমণীও বাতাসে উড়ে—কেননা, ঝগড়ার একটু বাতাস পাইলে রমণী রণচণ্ডী। শোলা আপন গর্ভে জল টানিয়া লইয়া অহিফেন-শুষ্ককণ্ঠ মানুষ-বিশেষের কণ্ঠ শীতল করে, রমণীও আপন হৃদয়ে প্রেমের শান্তিধারা সঞ্চয় করিয়া লইয়া চরিত্রহীন জ্বলিতকণ্ঠ স্বামীর প্রাণ শীতল করিয়া থাকেন। শোলার ফুল ক্রন্দনরত শিশুর শান্তিদায়িনী, আর মাতৃরূপে রমণী জগৎ-শিশুর ক্রন্দনবারিণী। শোলার স্থূল দেহকে মুড়িয়া ছোট করিয়া রাখা যায়, আবার প্রয়োজন হইলে সে আপন দেহ পরি-বর্দ্ধন করিয়া থাকে;—রমণী অনাদরে, স্বামীর সোহাগ না পাইলে সংসারে স্বীয় প্রাণ সঙ্কোচ করিয়াও কাল কাটাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে, সুবিধা পাইলে সমস্ত বৃত্তি প্রসার করিয়া স্বামীর হৃদয় জুড়িয়া বসেন।

কল্যাণীর দাসী রমানাথ ঠাকুরের উপরে ক্রুদ্ধা হইয়া ভ্রূকুটী কুটিলানন বিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিল—"মরণ আর কি! এখানে এখন কি জন্য? তোমার কি কোন জ্ঞানই নাই? রাণী-দিদির স্নানের সময় এখানে কেন?"

কল্যাণী বলিল,—"একটু প্রয়োজন আছে, আমিই ডাকিয়াছি। যাও ঠাকুর, গৃহমধ্যে গিয়া উপবেশন কর।"

ব্রাহ্মণ দাসীর দীপক হইতে অব্যাহতি পাইল। ছুটিয়া কল্যাণীর প্রদর্শিত কক্ষমধ্যে গমন পূর্ব্বক একখানা আসন লইয়া উপবেশন করিল। দাসীদ্বয় কার্য্যান্তরে গমন করিলে, কল্যাণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রমানাথ ঠাকুরের নিকটে গিয়া বলিল,—"তোমায় একটা কথা বলিব ঠাকুর; কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যদি তোমার প্রাণ যায় তথাপিও সে কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না।"

রমানাথ ঠাকুরের জ্ঞান হইল, সমস্ত জগৎটা তাহার রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি উপাদানগুলি লইয়া একেবারে এক মুহূর্ত্তে ঠাকুরের

বুকখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে বক্ষঃ চাপিয়াও স্থির থাকিতে পারে না। শরীরস্থ সমস্ত রক্তরাশি বিচ্ছুরিত, উদ্দীপিত ও আলোড়িত হইতে লাগিল। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া আসিল। সে অনেক কষ্টে, অনেক প্রকার সংযম-সাধনে বলিয়া ফেলিল,—"তুমি যাহা বলিবে, প্রাণান্তেও তাহা কোথাও বলিব না।"

ক। কেবল মুখের কথায় নহে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

র। মা জয়দুর্গার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে যাহা বলিবে, তাহা প্রাণান্তেও কাহার নিকট বলিব না।

ক। তোমার গলায় ঐ যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, স্পর্শ করিয়া বল, আমার নিকট যাহা শুনিবে, তাহা কোথাও বলিবে না।

র। এই পৈতা ছুঁইয়া বলিলাম, তুমি আমাকে যাহা বলিবে, কখনও কোন প্রকারেই তাহা কাহারও নিকট বলিব না।

ক। যদি তোমাকে ঐ কথা বলাইবার জন্য কেহ তাড়না করে?

র। তবু বলিব না।

ক। প্রহার করে?

র। তবু বলিব না।

ক। রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখে, শীতে জলমধ্যে দাঁড় করায়, কিম্বা বেত্রাঘাত করে?

র। তবু বলিব না।

ক। তরবারি দ্বারা কাটিতে যায়?

র। তবু বলিব না।

ক। সত্য?

র। সত্য।

ক। সত্য?

র। সত্য।

ক। সত্য?

র। সত্য।

ক। তিন সত্য করিলে?

র। হাঁ, করিলাম।

ক। আমার সহিত মুর্শিদাবাদ যাবে?

র। মুর্শিদাবাদ কেন গো? সেখানে মুসলমান-ফৌজের বড় অত্যাচার। তার চেয়ে বাড়ী থাকা বেশ।

ক। আমি মুর্শিদাবাদ যাইব।

কল্যাণীর সহিত যমের বাড়ী যাইতেও রমানাথ ঠাকুরের আপত্তি নাই, কিন্তু মুর্শিদাবাদটা তত ভাল বোধ করিতেছিল না। তখন কল্যাণী বুঝাইয়া বলিল,—"মুর্শিদাবাদ সহরটি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নূতন করিয়া গড়িয়া-পিটিয়া বড় শ্রী-শৃঙ্খলা করিয়াছেন, সে স্থানটি বড়ই শোভাময় হইয়াছে। তাহা দেখিতে কল্যাণীর বড় সাধ হইয়াছে। খাজনার টাকা লইয়া তাহাদের সৈন্য ও লোকজন যাইবে, শিরোমণি ঠাকুর যাইবে,—দু'খানা বজরা যাইবে; তাহারই একখানা বজরাতে কল্যাণ-কুমারী লুকাইয়া যাইবে। সে কথা কেবল রমানাথ ঠাকুর আর শিরোমণি ঠাকুর জানিবে, তদ্ভিন্ন পাখীতেও তাহা শুনিতে পাইবে না। সে পুরুষের পোষাক পরিয়া পুরুষের মত হইয়া যাইবে,—সুতরাং বিশেষ ভয়ের কারণ কিছুই নাই।"

তখন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া রমানাথ ঠাকুর মুর্শিদাবাদ গমনে স্বীকৃত হইলেন।

কল্যাণী গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক গায়ের মাপ ও কতকগুলি মুদ্রা আনিয়া রমানাথ ঠাকুরের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া দিল,—"তুমি বাজার হইতে এই মাপের কয়েকটা ইজার, চাপকান, চোগা, টুপি, মোজা ও জুতা প্রভৃতি

কিনিয়া আনিবে। কেহ যদি উহা কাহার বলিয়া জিজ্ঞাসা করে,—বলিবে, তোমার দেশে উহা পাঠাইয়া দিবে।"

রমানাথ ঠাকুর কল্যাণীর কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, এবং টাকা ও মাপ লইয়া কয়েক বার আকুল নয়নে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—"রূপ কি বালাই! দরিদ্র পরিচারক ব্রাহ্মণকেও ক্ষেপাইয়া দেয়!"

তারপরে সে, উপাসনার্থ তাহার আহ্নিকের ঘরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শুক্লা সপ্তমীর সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিদাঘ রজনীর জ্যোৎস্না-ফুল্ল অধরে হাসির রাশি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বন্য কুসুম অযাচিত ভাবে তাহার সৌরভ বিতরণ করিতেছিল,—সমীর সোহাগে সে পরিমল বুকে লইয়া দিক্ হইতে দিগন্তরে বিলাইয়া দিতেছিল।

অনতিপ্রসরা, নীল স্বচ্ছতোয়া ভৈরবী নদী চন্দ্রকর-বিধৌত হৃদয়ে বিক্ষোভিত সফেন বীচিমালা তুলিয়া কুলু কুলু স্বরে প্রেমের সেই পুরাতন কাহিনীর আদ্যন্ত আবৃত্তি করিতেছিল। দুই পার্শ্বে তীরভূমি হইতে বহুশাখ বিটপিকুল তাহাদের স্নেহ-বাহুর আচ্ছাদনে সেই তটিনীকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। সমস্ত দিক্ সুপ্ত—ক্বচিৎ নবীন-পত্র-কুঞ্জাভ্যন্তর হইতে কোন একটা পাখী তাহার অন্তরের বেদনা সুপ্তা প্রকৃতির দরবারে দাখিল করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ক্বচিৎ তীরে অহিধৃত ভেকের জীবনান্তকালের করুণ আর্ত্তস্বর;—ক্বচিৎ মৎস্যশিকারী ধীবরের জালক্ষেপ বা ক্ষেপণীক্ষেপ শব্দ;—ক্বচিৎ কোথাও গ্রামোপান্তের বৈষ্ণব-আখড়ায় গাঁজাখোর বৈষ্ণবের কীর্ত্তনের স্বর ও খোল করতাল বাদ্যের দূরশ্রুত ধ্বনির ক্ষীণ আওয়াজ।

এই নিস্তব্ধ, ফুল্ল-জ্যোৎস্নাময়ী ভৈরবী নদীর নীল জলের উপরে কাপে চিতে দুইখানি ক্ষুদ্র বজরা সুবিপুল-জলকায়া পদ্মা নদীর অভিমুখে উর্দ্ধ ত হইতেছিল।

বজরা দুইখানিই অতি সুদৃশ্য,—কিন্তু যেখানি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল, সেখানি আকারে ক্ষুদ্র, এবং অতি মনোহর দৃশ্য। আগের বজরা অনেক দূরে দূরে চলিতেছিল।

পশ্চাতের বজরা'র কাষ্ঠময় ছাতের উপরে বসিয়া একটি রমণী বীণা বাজাইয়া মৃদু মধুর স্বরে গান গাহিতেছিল।

রমণী যুবতী ও অপরূপ রূপশালিনী। তাহার সুপুষ্ট দেহে পবিত্রতার প্রভা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। মস্তকের কেশরাশি কতক পৃষ্ঠদেশে, কতক বাহুর উপরে, কতক অংসে, কতক বা কপোলদেশে পড়িয়া—ঝুলিয়া ঝুলিয়া দুলিতেছে। বীণাবাদন জন্য সুপুষ্ট বাহু কখনও স্ফীত, কখনও কম্পিত হইতেছে,—মুখ-মধুরিমায় চন্দ্রকর পতিত হইয়া মধুরে উজ্জ্বল করিয়াছে। স্ফীত উন্নত সুদৃঢ় বক্ষ ধীরে ধীরে দুলিতেছিল,—স্থলকমলের ন্যায় চারু চরণ দুইখানি প্রলম্বিত,—জ্যোৎস্না বুঝি কাঁদিয়া সাধিয়া সে চরণের তলে গড়াগড়ি পাড়িতেছিল। সেখানে আর কেহই ছিল না,—জনশূন্য নিস্তব্ধ বজরা-শীর্ষে বসিয়া যুবতী, ধীর-মলয়-বাহিত দিগন্তে বীণার সুরের সহিত তাহার মধুর কণ্ঠের মিশ্রিত স্বর ছড়াইয়া দিতেছিল এবং ক্ষেপণী-বিক্ষেপের মৃদুল শব্দের সহিত বজরা হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিতে চলিয়া যাইতেছিল। সুন্দরী গাহিতেছিল,—

কেন মিছে ভয় দেখাস্ মা এলোকেশী ?
তোর সব গিয়াছে অতল-তলে মূর্ত্তি ছাড়্, মা মুক্তকেশী।

আগে কাল ছিলো তোর পদতলে
তুই ছিলি কাল-বিজয়িনী ;

যোগরাণী।

কাল জিনেছে তোরে মাগো,
তুই হয়েছিস্ কালের দাসী।

আগে, কালাতীতা ছিলি ব'লে
তাই তোর রং ছিলো কালো,
এখন, অকালে সং সাজিয়ে তোরে
মাখিয়েছে গায় ভুষোর মসী।

হাতে দেছে টিনের খড়্গ
হিঙ্গুল রঙ্গের রক্ত-ধারা,
শঙ্খ-চক্র-বরাভয় মা
সকলি তোর নকল-রাশি।

আগে, দুল্‌তো গলে দৈত্য-মুণ্ড,
এখন মাটীর মালা গলায় পরিস্,
আগে, নিতিস্ মানুষ বলি
এখন পশুর রক্তে বড়ই খুসী।

ম'রে আছে তোর সন্তান সবাই
তাইতে কি মা, তুই ম'রেছিস্?
তবে কিসের ভয় দেখাস্ মা
সং সেজে ঢং পরকাশি?

সুজলা সুফলা শ্যামা
দৈত্যদলা আগে ছিলি,
এখন দৈত্য, দলে তোমায় হৃদি
চাওনা কেন সর্ব্বনাশী?

ড্রিমি ড্রিমি ড্রিমি বীণার তারে ঝঙ্কার উঠিতেছিল,—গমকে গমকে সুরতীর কণ্ঠস্বর বাতাসে দুলিতেছিল, আর হেলিতে দুলিতে যৌবনভারাব-

নতা কামিনীর ন্যায় বজরা চলিতেছিল। অন্যত্র নিস্তব্ধ,—মুক্ত আকাশে বসিয়া চিরসাক্ষী তারকাকুল রমণীর গান শুনিতেছিল, চন্দ্রদেব রজনীর প্রাণের আশা আধেক মিটাইয়া পশ্চিমাকাশে লুকাইবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। বজরা যেমন চলিতেছিল,—তেমনি চলিতে লাগিল, যুবতী যেমন গাহিতেছিল,—তেমনই গাহিতে লাগিল। গান গাহিতে গাহিতে তাহার ক্ষীণচন্দ্র-পরিহাসোজ্জ্বল নীলোৎপল-নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া দাঁড়াইতেছিল।

সহসা সুরভরা বীণার আওয়াজ বন্ধ হইল, গান থামিয়া গেল। যুবতী শশব্যস্তে ছাদের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল,—দূরে তীরভূমিতে অনেকগুলি লোক ছুটাছুটি করিতেছে, এবং আগেকার বজরা হইতে ক্ষিপ্রগতিতে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতেছে। আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া যুবতী তাড়াতাড়ি নামিয়া বজরার কামরায় প্রবেশ করিল। যুবতী—কল্যাণকুমারী।

বজরার সুসজ্জিত কামরার মধ্যে একটি বিংশতি-বাতি-প্রজ্বলিত ঝাড় জ্বলিতেছিল। তন্নিম্নে, নাসিকার উপরে চশমা সংস্থাপনপূর্ব্বক শিরোমণি ঠাকুর বসিয়া বসিয়া একখানি তালপত্রের পুঁথিতে কি পাঠ করিতেছিলেন। অদূরে এক দাসী বসিয়া ঝিমাইতেছিল।

কল্যাণী বলিল,—"ঠাকুর-দা! পুঁথি গোটাও। প্রাণরক্ষার উপায় দেখ। নতুবা ঠাকুরুণ-দিদির নোয়া-সিন্দুর ঘুচে যাবে।"

প্রশান্ত মুখ একটু উত্তোলনপূর্ব্বক শিরোমণি ঠাকুর বলিলেন,—"কেন রে, কি হইয়াছে?"

ততক্ষণে গোলযোগ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। মাঝিরা গোলযোগের শব্দ পাইয়া নৌকা আর সম্মুখে পরিচালিত করে নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হটাইয়া, যেখানে জলের উপরে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা আসিয়া পড়িয়া অনেকখানি স্থান

আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল, বজরা ঠিক তাহারই নিম্নে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল।

শিরোমণি ঠাকুরের কথার উত্তরে কল্যাণী বলিল,—"আওয়াজ বোধ হয়, ও রুদ্ধ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না?"

দাসী ঘুমঘোরে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল, কল্যাণী তাহাকে ভরসা দিয়া চীৎকারে বিরত করিল। উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল,—ঠাকুর-দা! টাকার বজরায় বোধ হয় ডাকাত প'ড়েছে!"

"ও মা ডাকাত গো!—কি হবে গো! আমার মিন্‌সের যে আর কেউ নাই গো! কেন মরিতে বিদেশ যাত্রা ক'রেছিলাম গো! ওগো আমায় রক্ষা কর গো!"—বলিয়া দাসী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কল্যাণী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—"হারামজাদি! ফের যদি চেঁচাবি, তবে ডাকাতের দলের মধ্যে তোকে ফেলে দেব।"

দাসী চীৎকার করিল না। কিন্তু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দিদি-রাণী, তোমার পায়ে পড়ি দিদি-রাণী;—আমার আর কেউ নাই গো! ওগো, আমি কেন ম'র্‌তে এসেছিলাম গো,—কেন ম'র্‌তে এসেছিলাম!"

ক্রমে ক্রমে সুর চড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া কল্যাণী তাহাকে পুনরায় ধমক দিল। এবার কিন্তু ধমকে সুফল না ফলিয়া বিপরীত ফল ফলিল। সে, প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"ওগো, ডাকাত প'ড়েছে গো! ওগো, মেরে ফেলেছে গো! আর দেখা হ'ল না গো,—আর দেখা হ'ল না!"

কল্যাণী পুনরপি তাহাকে ধমক দিল। সে বলিল,—"ওগো তলোয়ারের চোট মেরেছে গো! এই দেখ রক্ত পড়েছে গো,—হায়, হায়, আমার কি হ'ল গো! আমি যে বাড়ীতে কত পাকাটি যোগাড় ক'রে

রেখে এসেছি গো! এবার শীতকালে তাতে কে আগুন পোয়াবে গো! ওগো, মিন্‌সের সনে সে আগুন পুইয়ে কত সুখ হ'ত গো! ওগো, আমার কি হ'ল গো!"

দাসীর চীৎকারে "ডাকাত ডাকাত" শব্দ শুনিতে পাইয়া বৃদ্ধ শিরোমণি ঠাকুর বলিলেন,—"ডাকাত কি রে কল্যাণসিং?"

কল্যাণীকে এই নামেই সকলে জানিয়াছে। কল্যাণী সর্ব্বদাই পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া থাকে। তবে লোকজন বোঝাই বজরা আগে যাইতেছে এবং নিশীথ রাত্রি বলিয়া স্ববেশে সে একটু ছাতে বসিয়া গান গাহিতেছিল। কৃত্রিম-পোষাক সকলেরই অবশ্য যন্ত্রণাদায়ক।

কল্যাণসিং ততক্ষণ নিজের কাপড় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশ ধারণ করিতেছিল। সে বলিল—"টাকার বজরায় ডাকাত প'ড়েছে।"

দাসী তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল,—"ওগো ডাকাত প'ড়েছে গো!—আমায় মেরে ফেলেছে গো!—সর্ব্বনেশেরা আমায় খুন ক'রেছে গো!"

শিরোমণি ঠাকুর লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চকিতস্বরে বলিলেন,—"আঁা, আমাদের বজরায় ডাকাত!—বামাকে মেরেছে?"

কল্যাণসিং হাসিয়া বলিল,—"বামার গুষ্ঠির মুণ্ডুপাত ক'রেছে। আমাদের বজরায় নহে,—টাকার বজরায়। ঐ শোন, গোলযোগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। আমি ছাদের উপরে গিয়া দেখিয়া আসি, কতদূর কি হইল?"

বামাদাসী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, আর ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল,—"ওগো, তুমি যদি উপরে যাও তো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব গো,—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। রাজকন্তে ব'লে ডাকাতেরা তোমায় কিছু ব'ল্‌বে না গো,—তোমায় কিছু ব'ল্‌বে না।"

শিরোমণি মহাশয়, বামাদাসীর সপ্তমগ্রামোথিত কথা শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাকে এক পদাঘাত করিলেন। সে দাঁড়াইয়াছিল পড়িয়া গেল,—এবং চীৎকার করিয়া বলিল,—"গেছি গো! জন্মের মত গেছি—ডাকাতে আমার মুণ্ডুটা কেটে উড়িয়ে দিয়ে গেল!"

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শিরোমণি বলিলেন,—"হারামজাদি! চুপ্ কর্। যে কথা বলিতে নিষেধ—তাই ব'ল্‌চিস্। তোকে কালই কুত্তা দিয়ে খাওয়ান হবে।"

দাসী সে চক্ষুর বর্ণ দেখিল না। কিন্তু শুইয়া পড়িয়া কম্পিত-ক্রন্দন-স্বরে বলিল,—"ওগো, আমাকে আর কুত্তা দিয়ে খাওয়াতে হবে না গো,—আমার মুণ্ডু ধড়ে নাই গো,—ডাকাতেরা তা কেটে নিয়ে গেছে!"

শিরোমণিঠাকুর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"নেকা মাগী; দুষ্টুমী যুড়ে দিয়েছে। ফের্ যদি টু-শব্দটি কর্‌বি, তবে হাত পা ধ'রে জলে ফেল্ দেব।"

ওদিকে ছাদের উপর হইতে ক্ষীণ-চন্দ্রালোকে কল্যাণসিংহ দেখিতে লাগিল; তীরে তখনও অনেক লোক ছুটাছুটি করিতেছে। লাঠির শব্দ, বন্দুকের শব্দ, চীৎকার, হুহুঙ্কার ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে।

আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। গোলযোগ কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আর্ত্তের হাহাকার যেন বাড়িয়া পড়িতেছিল,—কল্যাণসিংহ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইল, দুই তিনটি নরমুণ্ড অনেকখানি জল রক্তরঞ্জিত করিয়া ভাসিয়া গেল। কি ভীষণ! তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিতেছিল,—বহুকষ্টে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহার পিতার সহায়তায় যাইতেছিল, তাহা কি দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়া লইল! তাহাদের লোকজন, সিপাহীগণ সব কি দস্যুর হস্তে নিহত হইয়া ভৈরবীর নীলজলে ভাসিয়া গেল! সহসা সে দেখিতে পাইল, জল আন্দোলিত করিতে করিতে

একটা লোক সাঁতার কাটিয়া অতি দ্রুততর বেগে তাহাদের বজরা অভি-মুখে আগমন করিতেছে।

কল্যাণসিংহ পিস্তল উঠাইল। সে বজরার মধ্য হইতে একটা গুলি-বারুদ-পূর্ণ পিস্তল লইয়া আসিয়াছিল,—পিস্তল বন্দুক ছোঁড়া, অশ্বে আরোহণ করা, তরবারি সঞ্চালন করা, কল্যাণীর অভ্যাস ছিল;—সে রাজার একমাত্র কন্যা, আদরে পরিবর্দ্ধিতা এবং তাহার দাদা গোবিন্দ-রামের শিক্ষার সঙ্গে সেও তাহা অভ্যাস করিয়াছিল।

কল্যাণসিংহ পিস্তল উঠাইল, কিন্তু ছুড়িল না। সে লক্ষ্য স্থির করিল, যদি ডাকাত হয়, বজরার নিকটে আসিবামাত্র পিস্তলের গুলিতে তাহার বক্ষোভেদ করিবে। কিন্তু যে সাঁতার কাটিয়া আসিতেছিল, সে অস্ত-গমনোন্মুখ ক্ষীণ-চন্দ্রালোকে কল্যাণসিংহের হাতের পিস্তল দেখিতে পাইল এবং বামহস্ত উত্তোলন করিয়া পিস্তল ছুড়িতে নিষেধ করিয়া আরও নিকটবর্ত্তী হইল। সে মূর্ত্তি বজরার সন্নিকটে আসিলে কল্যাণী দেখিল—সে রমানাথ ঠাকুর। রমানাথ ঠাকুর বজরার দাঁড় ধরিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল,—তাহার মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য মেঘা দাঁড়ি দাঁড় উঁচু করিয়াছিল,—কল্যাণী নিষেধ করিয়া তাহার মাথাটা রক্ষা করিয়া দিল। সে, ভিজা কাপড়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছাদে উঠিয়া কল্যাণ-সিংহের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণসিংহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইল, তীরে আর লোক নাই—গোলযোগও থামিয়া উঠিয়াছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে রমানাথ ঠাকুর বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে!"

কল্যাণী ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইয়াছে? আমাদের টাকা-কড়ি সমস্তই বোধ হয়, ডাকাতে লইয়া চলিয়া গিয়াছে?"

র। না, না। আমাদের এক পয়সাও লইতে পারে নাই।

ক। তবে কি সর্ব্বনাশ হইরাছে ?

র। রঘুনাথসিং মারা পড়িয়াছে। ডাকাতদের একটা বর্ষা আসিয়া তাহার বুকে বিঁধিয়া পড়িয়াছিল,—সে তখনই মরিয়া গিয়াছে।

ক। আহা-হা! আমাদের পুরাতন সৈন্য। আর কে মরিয়াছে ?

র। আর কেহ মরে নাই; মিশ্রিঠাকুরের বাঁ-হাতে একটা তলোয়ারের চোট লাগিয়াছে মাত্র,—আর সব কুশলে আছে।

ক। তীরে আর লোক জন দেখা যাইতেছে না,—ডাকাতেরা বোধ করি পলায়ন করিয়াছে ?

র। কতক পলাইয়াছে, কতক মরিয়া ভৈরবীর জলে ভাসিয়াছে, কতক বন্দী হইয়া আমাদের বজরায় রহিয়াছে।

ক। কত লোক আন্দাজ মরিয়াছে ?

র। পঁচিশ ত্রিশ জনের কম নহে। বন্দী হইয়াছে সাত জন। পলাইয়াছে কত তাহা ঠিক বলা যায় না,—যাহারা পলাইয়াছে, সকলেই যে, সুস্থ দেহ লইয়া পলাইতে পারিয়াছে, তাহা নহে;—তাহার মধ্যে অনেকেই আহত হইয়া গিয়াছে।

ক। কি দুর্দ্দৈব! অতগুলি লোকের প্রাণ বিনা কারণে নষ্ট হইল! এখন মাধবরাও কি বলিতেছে ?

মাধবরাও তাহাদের একজন সৈনিক। যে কয়জন সৈন্য ও সিপাহী আসিয়াছে, মাধবরাও তাহাদের মধ্যে প্রধান।

রমানাথ ঠাকুর বলিলেন,—"যখন ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হয়, তখন মাধবরাও বজরার ছাদে উঠিয়া তোমাদের বজরা দেখিয়াছিল,—এদিকে কোন গোলযোগ নাই দেখিয়া, আমাকে তোমাদের বজরার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া সে লড়াই করিতে যায়। এখন আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিল, বন্দী দস্যুগণকে কি করা যায়, তাহাই অনুজ্ঞা লইতে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী মাঝিদিগকে বজরা ভাসাইয়া সম্মুখের বজরার নিকট লইতে বলিল। মাঝিরা বজরা বাহিয়া লইয়া গেল।

দুইখানি বজরা পাশাপাশি হইলে কল্যাণ সিংহ লুকাইয়া সৈন্যদিগের বজরায় গমন করিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্মানে অভিবাদন করিল

কল্যাণী কল্যাণ সিংহ সাজিয়া মুর্শিদাবাদ গমনের অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছে। শিরোমণি মহাশয় পরিচয় দিয়াছেন,—কল্যাণ সিংহ, রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের ভাগিনেয়। কিন্তু লোকজনে কেহই অনুধাবন করিয়া দেখে নাই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বালক কল্যাণ সিংহ হইল কি প্রকারে? আসল কথা কেবল শিরোমণি মহাশয়, রমানাথ ঠাকুর আর বামা ঝি অবগত ছিল।

কল্যাণ সিংহ বজরার মধ্যে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"রঘুনাথ সিং ব্যতীত আমাদের সৈন্যগণের মধ্যে আর কেহ মারা পড়ে নাই ত?"

মাধব রাও অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল,—"ধর্ম্মাবতার; আর কোন প্রকার অনিষ্ট আমাদিগের হয় নাই।"

ক। বড়ই দুঃখের কথা যে, দস্যুদলের অতগুলি লোকের জীবন অকারণে আমাদের অস্ত্রে নিহত হইল!

মা। এই কয় জন দস্যু বন্দী হইয়াছে, ইহাদিগকে কি করা যাইবে?

ক। বজরা ভাসাইয়া দাও—যাহারা পলাইয়াছে, তাহারা যদি আবার লোকজন সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আইসে, অকারণে আবার কতক-গুলি লোকের জীবন নষ্ট করিতে হইবে।

মা। এই বন্দী দস্যুগণের কি উপায় করা যাইবে?

ক। উহাদিগকে মুর্শিদাবাদ লইয়া গিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে হইবে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী দস্যুগণ সেই স্থলে বসিয়াছিল, কল্যাণ সিংহের নিষ্পাপ সরল মুখ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, তাহারা দয়া লাভে আশ্বাসিত হইল। একজন বলিল,—"আর দস্যু আসিবার ভয় নাই। আমি দস্যু-সর্দ্দার। আমরা একদলে পঞ্চাশ জনের উপর ছিলাম না,— মরিয়াই অনেকে বাঁচিয়াছে। যাহারা পলাইয়াছে, সে সংখ্যায় অতি অল্প।"

কল্যাণ সিংহ তাহার আয়ত লোচন দস্যু-সর্দ্দারের মুখের উপরে সংস্থাপিত করিয়া বলিল,—"যাহারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তোমরাও শীঘ্রই তাহাদিগের সঙ্গী হইতে পারিবে। মুর্শিদাবাদে পঁহুছিয়াই তোমা-দিগকে শূলে দেওয়া হইবে।"

দস্যু-সর্দ্দার শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় একত্র করিয়া হৃদয়ের উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! শূলে দিতে হয়, ফাঁসি দিতে হয়, তলোয়ারের চোটে জীবন লইতে হয়—আর এই ভৈরবীর নীলজলে ডুবাইয়া ডুবাইয়া মারিতে হয়, এই স্থানে মারুন,—আমাদিগকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবেন না। কাল মুর্শিদাবাদের কথা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। মহাশয়! আমি দস্যু-ব্যবসায় লইয়াই জন্ম গ্রহণ করি নাই,—আমি জাতিতে

কুলীন ব্রাহ্মণ। আমি বাল্যকালে কিছু লেখা-পড়াও শিখিয়াছিলাম,—মাতা স্ত্রী পুত্র তাহাও ছিল,—সব হারাইয়াছি—মুর্শিদাবাদের আগুন এখনও বুকে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে,—মুর্শিদাবাদে আর লইয়া যাইবেন না। মুর্শিদাবাদের আগুনেই দয়া মায়া স্নেহ মমতা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতি সব পুড়িয়া গিয়াছে। সেই আগুনে সব পুড়াইয়া দস্যু হইয়াছি—জগৎ আমাকে একবিন্দু দয়া মায়া সহানুভূতি দেয় নাই, আমি দিতে গেলাম কেন?"

জগতে দেখিলাম সবাই দস্যু—দস্যুরই জয়। তাই দস্যুবৃত্তি ধরিয়াছি,—পথিকের সর্ব্বনাশ করিয়া, পথিকের প্রাণ নষ্ট করিয়া অর্থ লুঠিয়া লইতেছি। অর্থে আমার আর প্রয়োজন নাই,—অর্থের প্রয়োজন আমার সারা হইয়া গিয়াছে,—তথাপি জগতের উপরে প্রতিশোধ লইতে বাছা বাছা জোয়ান জুটাইয়া লইয়া দল বাঁধিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া হৃদয়ের শোণিত-পিপাসার শান্তি করিতেছি।"

দস্যু-সর্দ্দারের রক্ত-চক্ষু দিয়া জলধারা প্রবাহিত হইল। কল্যাণ সিংহ তাহার মুক্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত ভাষাময়ী কথায় বুঝিতে পারিল, উহার হৃদয়ে অত্যাচারের নিদারুণ ব্যথা জাগিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার ব্যথার কথা বলিতে যদি কোন বাধা না থাকে, আমাকে বল—শুনিতে বড় কৌতূহল হইতেছে।"

বজরা ততক্ষণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শিরোমণি ঠাকুর অপর বজরা হইতে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আবার কামরার মধ্যে আলোর তলে বসিয়া পুঁথি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বামা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল।

দস্যু-সর্দ্দার বলিতে আরম্ভ করিল,—"এ জগতে এতদিন কেহ এ হৃদয়ের পানে চাহে নাই, কেহ একটি মুখের কথাও শুধায় নাই। যদি, আপনি শুধাইলেন,—বলিতেছি। আপনার মুখখানি দেখিয়া বোধ

হয়, যেন দয়া মায়া আর স্নেহ দিয়া ও হৃদয় গঠিত। ভাবিবেন না, আমি মুক্ত হইবার জন্য আপনার তোষামোদ করিতেছি। মুক্তিতে আমার প্রয়োজন নাই,—জগতে আমার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই।

মুর্শিদাবাদে আমার বাড়ী ছিল। আমি দরিদ্রের সন্তান,—সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, পরিবার প্রতিপালন করিতাম। আমার বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র ছিল, আর সেই সময় একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—আমার স্ত্রী তখন সূতিকাগারে। এই সময় নবাব মুর্শিদকুলীর কর্ম্মচারী আসিয়া এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—"তোমার এই বসত বাটীর জমি খাস করিয়া লওয়া হইয়াছে—এই স্থানে নবাবের প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইবে। তুমি এই মুহূর্ত্তেই গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন কর।" আদেশ শ্রবণে বক্ষঃপঞ্জর ধসিয়া পড়িল। ভাবিয়া কিছুই পাইলাম না—যেখানে আমার পৈতৃক বাস, সেখানে আমাদের পুরুষানুক্রমিক পর্ণকুটীর—আজি তাহা ছাড়িয়া যাইব কেন? কত লোকের নিকট গেলাম, সৎপরামর্শ চাহিলাম, কিন্তু সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবং উঠিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু হায়! তখন যাইব কি প্রকারে? তখনও অপক্ব শস্য ক্ষেত্রে রহিয়াছে—হাতে একটি পয়সা নাই, কেমন করিয়া নূতন গৃহ প্রস্তুত করিব। মহাজনের দেনার দায়ে তখন অস্থির—একবার না দিতে পারিলে, আর পাওয়া যাইবে না। এ দিকে মা বৃদ্ধা স্থবিরা। একটি শিশুপুত্র,—সদ্যোজাত শিশু লইয়া সূতিকাগারে বনিতা অবস্থিত,—তখন নবাবের কর্ম্মচারীর নিকট কেবল মাত্র সাত দিনের সময় চাহিলাম,—বলিলাম, এই সাত দিনের মধ্যে আমি, যাহা হয়, একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইব। বিশেষতঃ নয় দিনের কম আঁতুড় হইতে পোয়াতির বাহির হইতে নাই,—কেবল তুই দিন হইল, আমার একটি কন্যা হইয়াছে—আর সাত দিন সময় দিন! কিন্তু নির্দ্দয় নায়েব তাহা শুনিল না,—সেই দিনই উঠিয়া যাইবার জন্য

জিদ করিল, বলিল—স্ব-ইচ্ছায় না গেলে সিপাহীরা গিয়া ঘরে আগুন দিয়া আসিবে।”

দস্যু-সর্দ্দার নিস্তব্ধ হইল। সকলে বুঝিল, বলিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। কল্যাণ সিংহের চক্ষু জলে ছল ছল করিতেছিল। চক্ষুর জল চক্ষুতে মিলাইয়া, বলিল,—“তার পর ?”

দ। তার পর, আর কি করিব মহাশয় ! সেই বিপন্ন পরিবারবর্গকে লইয়া পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে দাঁড়াইলাম। সূর্য্যকরোজ্জ্বল সেই নীলাকাশ ঊর্দ্ধে শোভিতে লাগিল, অদূরে সেই তরঙ্গ-চঞ্চল ভাগীরথী, সেই প্রবাহ, সেই প্রান্তর, সেই পরিচিত—সব ত্যাগ করিয়া কোন্ দূরান্তরে যাইতে হইবে, হা ভগবান্! আমাদের সেই পুরুষানুক্রমিক বসত ভিটা—সেই আবাল্যের স্নেহ-মমতা মাখা পর্ণকুটীর—তাহার পানে চাহিতে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল,—আর কি করিব—দরিদ্রের সম্বল তপ্তশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলাম।

ক। সেখান হইতে কোথায় গেলে ?

দ। কোথায় যাইব ? যাইবার স্থান কোথায় ? সর্ব্বত্র স্থানের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু পাইলাম না,—দরিদ্রের আশ্রয় কোথাও নাই, কেহ দেয় না। স্ত্রী, পুত্র ও বৃদ্ধ মাতাকে লইয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম,—উপজীবিকা ভিক্ষা,—কিন্তু তাহাও মিলিত না। সদ্যোজাত কন্যাটি দিনতিনেক থাকিয়াই অত্যাচার-পীড়িত সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, মাসখানেক পরে ছেলেটিও মরিয়া গেল,—হায়, হায়, সে কথা স্মরণ হইলে এখনও বুক ফাটিয়া যায়।

ক। তোমার পুত্রটি কিসে মারা গেল ?

দ। কিসে মারা গেল, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ক্ষুধায়—ক্ষুধার তাড়নে। ছিন্ন দীনবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম,—ভিক্ষায় কি উদর পূর্ণ হয় ! ছেলেটির বয়স দেড় বৎসরের অধিক হইয়াছিল

না,—দুগ্ধ ভিন্ন সে আর কি খাইতে জানিত? দুধ কোথায় মিলিবে? তার মায়ের স্তনে যে দুধ হইয়াছিল, তাহাও পথশ্রমে আর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এক দিন অনাহার-ক্লিষ্ট শিশু দুগ্ধের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে মাতৃ-অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িল,—ক্ষণপরে দেখা গেল, তাহার দেহ উত্তাপশূন্য,—সে কাল নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না, আর সে আঁখি মেলিল না। তার জননীর বুকে বিষম ব্যথা বাজিল,—ক্ষুধায় অন্ন পাইলে আর তাহার মুখে রুচিত না,—শীর্ণ বিশীর্ণ দেহ লইয়া রাত্রি দিবা কেবল অশ্রু পরিত্যাগ করিয়াই কাল কাটাইতে লাগিল। তার পর, একদিন পথ হাঁটিতে হাঁটিতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল,—স্নেহভরে তরুবর যেন তাহার পত্রবহুল শাখা-বাহু দ্বারা রৌদ্র-তাপ আবরণ করিল,—শীতল বাতাস দুঃখিনীর কষ্টে যেন তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল,—অভাগিনী সেই মুহূর্ত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আমার সব গেল,—কন্যা গেল, পুত্র গেল, পত্নী গেল,—কেবল জীবন-সম্বল রহিল শুষ্ক-অশ্রু-উৎস! মনে হইল, হা ভগবান্! ধনীই শুধু তোমার স্নেহের,—দরিদ্র কি তোমার কেহ নহে? হা দরিদ্রের নিষ্ঠুরা বিমাতা অদৃষ্ট;—এত বাদও কি সাধিতে হয়? এত কষ্টেও তবু হৃদয় শতধা হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রসাতলে মিশাইল না,—দরিদ্রের হৃদয় এমনই কঠিন শিলা দিয়া গঠিত!

কল্যাণ সিংহ এবার আর চক্ষুর জল ধারণে সমর্থ হইল না। তাহার চক্ষুর জলে গণ্ড প্লাবিত করিল। সে চক্ষুর জল দেখিয়া, দস্যু-সর্দ্দার [illegible] উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"দরিদ্রের দুঃখ-কাহিনীতে জগতে কাহারও চক্ষুতে যে জল পড়ে, তাহা এই নূতন দেখিলাম—আপনার চক্ষুর জলে আমার বোধ হইতেছে, আমি সংসারটাকে যত নির্ম্মম, যত রাক্ষস ভাবিয়াছিলাম—বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ জলে আমার হৃদয়

যেন বলিতেছে, চক্ষুর জলেই অত্যাচারের আগুন নিবাইয়া দাও—শাণিত তরবারিতে প্রাণের জ্বালা যায় না, আরও বাড়ে!"

বৃদ্ধ সীতারাম মিশ্র যুদ্ধ-ক্লান্ত দেহটাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করণাশয়ে এক-পার্শ্বে বসিয়া সিদ্ধি গুলিতেছিল, সে একবার তীব্র-কটাক্ষে দস্যুপতির মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"শালা ডাকু; আপ্‌না জান বাঁচানা-কোয়াস্তে নিহোরা কর্‌তা হ্যায়। আউর ঝুট্-মুট্ রোতা হ্যায়। রোণে কাঁদ্-নেসে তেরা জান বাঁচানেকা কঠিন হ্যায়,—তোম্ ডাকু হ্যায় শালা লোক!"

কল্যাণ সিংহ তীব্র-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার সীতারাম মিশ্রের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দস্যুপতির দিকে চাহিল, এবং বলিল,—"তারপর তোমরা কোথায় গেলে?"

ক। জগতে মানুষ সবাই—কিন্তু কেহ দেব-হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কেহ দৈত্য-হৃদয় লইয়া জন্মে। আমি আর আপনি—উভয়ে আসমানি জমিন ফারাক! তবে আপনার মত দেব-হৃদয় দশ-লক্ষে একটি।

কল্যাণ সিংহ বুঝিল, বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর দস্যু কথাটা সীতারাম মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে। মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তারপর?"

দ। তারপর, বলিবার আর বড় অধিক নাই। আমি যে দেশের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম, আর যাওয়া হইল না,—আমার বৃদ্ধা মাতা আর চলিতে পারিলেন না। তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে—মা আমার আর চলিতে পারিলেন না, কাজেই গ্রামোপান্তের এক ভগ্ন দেবালয়ে তাঁহাকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে দেবালয় বহুদিনের জীর্ণ দীর্ণ—শত অশ্বত্থের মূল প্রাণপণে আসিয়া সেই জীর্ণ আলয়টি গ্রাস করিয়া ধরিতেছে, বর্ষার বারিধারা তাহার শতছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে,—কুণ্ডলিনী ফণী নিদাঘে শীতলছায়ার পড়িয়া সেখানে নিদ্রা যায়,—কিন্তু শীতকাল বলিয়া বড় একটা দেখা গেল না,—আমি মাতাকে লইয়া

সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেখান হইতে নিত্য গ্রামে গমন করিয়া ভিক্ষা করিতাম, আর ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল আনিয়া মাতা-পুত্রে ভোজন করিতাম। কিন্তু শীতের যন্ত্রণায় মা'র কাসরোগ দেখা দিল,—ক্রমে ক্রমে মাতার মুখেও সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুচ্ছায়া দেখা গেল। কিন্তু দরিদ্রের প্রাণ কি সহজে বহির্গত হয়? বহুদিন রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মা আমার মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন;—তাঁহার তপ্ত-হৃদি শীতল হইল,—আমারও এইবার সকলের শেষ হইল,—আমি মাতৃ-চরণ প্রান্তে পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া অনেক কাঁদিলাম।

তারপরে উঠিয়া গঙ্গার পবিত্র জলে মাতৃদেহ ভাসাইয়া দিয়া সেই শূন্য বিজন-মন্দিরে ফিরিয়া গেলাম। সব শূন্য—সব উদাস! একে একে এ হৃদয় হইতে সব ঝরিয়া গেল। চক্ষুর জল চক্ষুতে শুষ্ক হইয়া গেল,—বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয় মধ্যে প্রবাহাকারে বহিয়া গেল। আমার আজি এ দুর্দ্দশা কেন? কে আমার সুখ-তপ্ত-নীড় কঠোর চরণে দলিয়া দিয়াছে? হৃদয়ে তীব্র প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার সুখের সংসার জগৎ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে,—আমি নির্ধন বলিয়া ধনী আমাকে চরণে দলিয়াছে,—আমিও জগতের সুখ-শান্তি ঘুচাইয়া দিব, আমিও ধনীকে নির্ধন করিব।

আমি এই পথে যাইতেছিলাম, আর গেলাম না। সংসার-পীড়িত, ধনীর চরণ-দলিত লোকের অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলাম। বঙ্গে তাহার অভাব নাই,—বাছিয়া বাছিয়া জোয়ান লোক লইয়া ডাকাতের দল বাঁধিলাম। ধনীর ধনাপহরণ ও সেই ধন নিরাশ্রয়, নিপীড়িত দরিদ্রগণকে দান করাই এখন আমার ব্যবসায় হইয়াছে।

ক। আমার বিশ্বাস, পাপ সর্ব্বত্রই পাপ;—তুমি পরের ধন অপহরণ করিয়া দরিদ্রের উপকার করিতেছ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বাঁধিয়া দিতেছ, কিন্তু ইহাতেও তোমার পাপ হইতেছে।

দ। পাপ-পুণ্য বুঝি না ;—কিন্তু ইহাতে আমার হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে। বুঝি প্রতিহিংসা সাধন হইতেছে বলিয়াই শান্তি আসে, অথবা আমার পুত্র কন্যা, আমার দুঃখিনী স্ত্রী, আমার বৃদ্ধ মাতা না খাইয়া মরিয়াছে,—আশ্রয়হীন হইয়া গাছতলায় মরিয়াছে—তাই যাহাদের সে দশা দেখি, তাহাদিগকে আমার মা, আমার পুত্র কন্যা বলিয়া মনে হয়,—হয়ত তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিয়া মনে সুখ পাই। পাপ-পুণ্য বুঝি না—সে খোঁজও রাখি না। যাতে মনে শান্তি পাই—তাই করিয়া যাইতেছি।

ক। তুমি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া তখন কেন কোন পল্লীগ্রামে গমন করিয়া গতর খাটাইয়া পরিবার প্রতিপালন করিলে না ?

দ। আপনি কি বলিতেছেন,—আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া সেই সময়েই চলিয়া যাই।

ক। পল্লীগ্রামে বোধ হয় তোমার মত দরিদ্রের খাটিয়া খাইবার অসুবিধা হয় না।

দ। না হইতে পারে,—কিন্তু আমি যে তখন কপর্দ্দকশূন্য ছিলাম। আশ্রয়টুকুও ছিল না,—কাজেই কোনও গ্রামে থাকিতে পারিতেছিলাম না। তারপরে, বিক্রমপুর-অভিমুখে রওনা হইয়াছিলাম,—পথিমধ্যে এই বিপদ। আমার ত আর একটি পয়সাও ছিল না যে, তাই পাথেয় স্বরূপ ব্যয় করিয়া চলিয়া যাইব! কাজেই ভিক্ষা করিতে করিতে যাইতে হইতেছিল।

ক। ভাল, মুর্শিদাবাদে বা তাহার নিকটস্থ কোন গ্রামে কি তোমার আত্মীয়-স্বজন ছিল না যে, সেখানে দশদিন দাঁড়াইতে পারিতে ? তুমি দরিদ্র, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত ; তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অবশ্য কেহ না কেহ অবস্থাপন্ন,—অন্ততঃ মধ্যবিত্ত থাকিতে পারেন।

দ। সেই জন্যই বিক্রমপুর যাইবার বাসনা করিয়াছিলাম। সেই

দেশে আমার মামার বাড়ী—আমার পিতা কুলীন, তিনি সেই দেশে বিবাহ করেন, আমি সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করি—সেই দেশেই ছিলাম, কিন্তু আমার পিতার বাসভূমি—মুক্‌সদাবাদে ছিল,—তাঁহার মৃত্যুর পরে আমি সস্ত্রীক তাঁহার আলয়ে আসিয়া বসতি করিতেছিলাম। এদেশে আমাদের আত্মীয়-স্বজন—কে, তাহাও ভাল জানিতাম না,—তবে গোষ্ঠ-বিহারের রাজা আমার শ্বশুর। কিন্তু সেখানে যাইতে ইচ্ছা করি নাই।

কল্যাণ সিংহের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। আবেশস্তিমিত চক্ষে দস্যু-সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"গোষ্ঠবিহারের রাজা তোমার শ্বশুর? কি প্রকার শ্বশুর?"

দ। আপন শ্বশুর। তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণকুমারীর সহিত আমার বিবাহ হয়। তখন আমি বিক্রমপুরে মাতুলালয়ে থাকিতাম,—সেই স্থান হইতে আসিয়াই বিবাহ করি। কিন্তু বিবাহের পর দিবস সেই যে চলিয়া যাই—আর কখনও সেখানে যাই নাই।

কল্যাণকুমারীর গলার আওয়াজটা যেন একটু ধরিয়া গেল। সে বলিল,—"বিপদের সময় সেখানে গেলেও ত পারিতে? রাজার জামাই—অবশ্যই ভাল থাকিতে পারিতে।"

দ। একবার তাহা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যাইতে সাহস করি নাই। কি জানি, ইহাদিগকে দেখিলে যদি তাঁহারা ঈর্ষা করেন।

ক। এখন গেলেও ত হয়?

দ। আর কিছু ভাল লাগে না—বড় কষ্টে আমার স্ত্রী পুত্র এবং বৃদ্ধ মাতা মরিয়াছেন,—আমি আর সুখৈশ্বর্য্য চাহি না।

ক। রাজকন্যা যদি আপনার পরিণীতা স্ত্রী হয়েন, তবে তাঁহার নিকট গেলে তিনিও আপনাকে সুখী করিতে পারেন।

দ। আমি সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, রাজকন্যা লেখাপড়া জানেন,

—ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিতা, আমি মূর্খ। তিনি রাজার মেয়ে, আমি পথের ভিখারী ;—তিনি নবীনত-কোমলা, আমি কর্কশবেশী কৃষক ;—আমায় তিনি কখনও শ্রদ্ধাভক্তি করিবেন না।

কল্যাণ সিংহের নয়ন-কোণে অশ্রু-মালার সঞ্চার হইল। গলাটা আরও ধরিয়া আসিয়াছিল,—গলা ঝাড়িয়া বলিল—"মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন। হিন্দু-স্ত্রীর স্বামী দেবতা। আপনার নাম ?"

দ। আমার নাম নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্নের মত নামটি কল্যাণ সিংহের প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রবিষ্ট হইল। বলিল,—"আপনি সেখানে যাইবেন, সম্ভবতঃ আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

দ। আপনার হস্ত হইতে বাঁচিলে ত যাইব ?

ক। আপনাকে আর মারিতে পারিলাম কৈ ? আপনি যে পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে মহাশয় আমার কুটুম্ব হইতেছেন ? যদি আপনার কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে আপনি আমার ভগিনীপতি।

সীতারাম মিশ্র ততক্ষণ তাহার বহুযত্নালোড়িত সিদ্ধিটুকু গলাধঃকরণ করিয়া সুখার সন্ধান করিতেছিল, সে দস্যু-সর্দ্দারের কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে আপন মনে বলিল,—"শালা ডাকু হোকে মহারাজাকো দামাদ হোনে আয়া হ্যায়। শালাকো বাৎচিৎ দেখ্‌কো মালুম হোতা হ্যায় আবি ছুট্ যাগা।"

দস্যু-সর্দ্দার বলিল,—"আপনি কি রাজা গোপীকৃষ্ণের আত্মীয় ?"

ক। হাঁ।

দ। আপনি তাঁহার কে হন ?

ক। ভাগিনেয়।

দ। তবে ত কুটুম্ব বটে !

ক। তা কুটুম্বিতাটা ভাল রকম পাকাইবার চেষ্টাই করিয়াছিলে,

আমার লোকজন যদি হুঁসিয়ার না থাকিত, তবে এতক্ষণ কুটুম্বুর রক্তে তোমার হাত দুইখানি দিব্য লাল হইত!

দ। মহাশয়! আ'জ অবধি পাপ ব্যবসায় ছাড়িলাম। আর কখনও গৃহী হইতাম না, আর কখনও সুখের সুপ্তনীড় অনুসন্ধান করিতাম না—কিন্তু আপনার মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ও অল্প বয়সের সৌজন্য ও ধর্ম্মোপদেশ বুঝিয়া আবার যেন সে দিকে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

ক। যদি ঠিক পরিচয় জানিতে পারিতাম যে, আপনি মহারাজের জামাতা, তাহা হইলে কর্ণমর্দ্দনে না হউক, চিত্তমর্দ্দনে আপনার এই মহাপাতককর কার্য্যের প্রতিশোধ লইতাম। এক্ষণে আপনাকে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে, আপনি চলিয়া যান, এবং গোষ্ঠবিহারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার সত্য করুন।

দ। আপনি কোথায় যাইবেন?

ক। মুর্শিদাবাদে।

দ। কত দিনে ফিরিবেন?

ক। ঠিক নাই।

দ। আমার জগতে কেহ নাই, কোন কর্ত্তব্য নাই, গৃহ নাই,—যদি আমাকে সঙ্গে লয়েন, আমি আপনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে যাইতে পারি, এবং আপনি যখন ফিরিবেন, আপনার সঙ্গে গোষ্ঠবিহারে যাইব।

কল্যাণ সিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তারপরে বলিল,—"না, আমার সেখানে কত দিন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, আমার সঙ্গে আপনার যাইতে হইবে না। আপনি দরিদ্রের সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, দস্যুবৃত্তি না করিয়া যদি কাহারও উপকার করিতে পারেন, ততদিন তাহাই করুন। যাহাদিগকে এই দুষ্কার্য্যে যোগ দেওয়াইয়াছিলেন, যাহারা আজি আমার সিপাহীদিগের নিকটে হত হইয়াছে,—তাহাদিগের পুত্র-

কন্যার উপায় ও যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদিগের শুশ্রূষা,—এই সমস্ত কার্য্য করা এখন আপনার কর্ত্তব্য।”

দ। তাহাই করিব। আপনার আদেশই আমার শিরোধার্য্য।

কল্যাণ সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—“কবে আপনাকে গোষ্ঠবিহারে দেখিতে পাইব?”

দ। আপনার যখন ফিরিবার দিন স্থির নাই, তখন আমি আগে গিয়া কি করিব? আপনি যাইবার সময়ে, যদি অসুবিধা না হয়, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

ক। আমি গোষ্ঠবিহারে না পঁহুছিলে আপনার সেখানে যাইতে আপত্তি কি? ভরসা করি, আমি পরিচয় দিয়া দিব, এবং সেই পরিচয়ে আপনার শ্বশুর আপনাকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সে আশা আপনি করেন না?

দস্যু-সর্দ্দার বা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় হো হো হাসিয়া উঠিল। বলিল —“আমি এত আহাম্মক নহি যে, আপনার পরিচয়ে আমাকে তাঁহারা চিনিতে পারিবেন। আমার শ্বশুর আমাকে বিবিমতে চেনেন,—তারপর, অন্য নিদর্শন ও পরিচয় আছে!”

এই সময় প্রভাতের সুখদ বাতাস প্রবাহিত হইল, নদীতীরস্থ বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষী সকল কলরব করিল, এবং নৈশ প্রস্ফুটিত বন্য কুসুম প্রভাতের বাতাসে পরিমল ঢালিয়া দিল।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—“যদি আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে এই স্থানেই নামাইয়া দিলে ভাল হয়।”

ক। তাহাই হউক,—আমি ফিরিয়া গোষ্ঠবিহারে যাইবার পূর্ব্বে আপনি সেখানে যাবেন কি?

নী। না।

ক। কেন?

নী। আমার যেন বোধ হইতেছে, সংসারে ফিরিবার পক্ষে আপনার ঐ সুন্দর বদন এবং অমিয় বাক্যই বন্ধনী। আপনি না গেলে, আমি যাইব না।

ক। আপনি কি বলিতেছেন,—আপনার স্ত্রীই আপনার বন্ধনী হইবেন। আমি কে?—বড় জোর শালা।

নী। আপনি আমার প্রভু হইবেন, আমি আপনার চিরদাস হইয়া আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিব—আপনার নিকটে সংসারের গতি ও পথ জানিব।

ক। আহা,—বলেন কি মহাশয়! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ* ব্রাহ্মণ—নমস্কার! আমি ফিরিবার সময়ে কোথায় আপনার দেখা পাইব?

নী। যেখানে আমরা আপনাদের বজরা আক্রমণ করিয়াছিলাম, ঐ স্থানে। উহার নাম ডাকাতে কালীতলা—ঐ স্থানে আমার একটা আড্ডা আছে। আপনি ঐ স্থানে বজরা রাখিয়া কালীতলায় গেলেই আমার সন্ধান পাইবেন। কালীর যে পূজক—সেই সন্ধান বলিয়া দিবে।

ক। ভাল,—আমার আর একটি অনুরোধ আছে। রাখিবেন কি?

নী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ জীবন আপনারই জন্য থাকিল,—আপনি এ জীবনের যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

ক। (হাসিয়া) জীবনটায় আমার কি কাজ আছে? তবে আপনি যখন কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন,—তখন অনুরোধ করিতে পারি—আপনার চরণতলে আমার করুণ প্রার্থনা, আর দস্যুবৃত্তি করিবেন না।

নী। নিশ্চয়ই নহে। যতদিন আপনি ফিরিয়া না আসিবেন, ততদিন ঐ স্থানে আপনার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিব, আর যথাসাধ্য দরিদ্র-সেবা করিব।

কল্যাণ সিংহের মুখে যেন কি এক ভাবের আবির্ভাব হইল, সে মাঝিদিগকে তীরে বজরা লাগাইতে আদেশ করিল। বজরা তীরে লাগিলে, সহচর দস্যুগণের শৃঙ্খল মোচন করাইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিল। তাহারা তীরে গমন করিলে, মাঝিরা বজরা ভাসাইয়া দিল।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ডাকিয়া বলিল,—"আপনার আসার আশায় প্রতিদিন এই ভৈরবীর দিকে চাহিয়া থাকিব—মনে করিয়া আসিবেন।"

নবম পরিচ্ছেদ।

তারপরে, আরও সাতদিন নদীবক্ষে থাকিয়া কল্যাণ সিংহদিগের বজরা একদিন উষাকালে মুর্শিদাবাদের নিকটে এক ক্ষুদ্রপল্লীগ্রামোপান্তে উপস্থিত হইল। সেস্থান হইতে মুর্শিদাবাদ এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

শিরোমণি মহাশয় কল্যাণ সিংহকে বলিলেন,—"এখন এই স্থানেই বজরা রক্ষা করিয়া থাকা হউক। গঙ্গা স্নান, আহ্নিক ও ভোজন ব্যাপারাদি সম্পন্ন করিয়া দ্বিপ্রহরের মধ্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়া যাইবে।"

কল্যাণ সিংহ প্রথমে সে প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, সে বলিয়াছিল,—"আগে বাবার সংবাদ লইয়া তবে স্নানাহ্নিক করিব।"

বৃদ্ধ শিরোমণি ঠাকুর সে আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, সংবাদ যে বিশেষ সুবিধা ও সন্তোষজনক হইবে, তাহা বিবেচনা করা যায় না,—অতএব মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াটা সম্পন্ন করিয়া লাওয়াই কর্ত্তব্য; নতুবা উদ্বেগ, চিন্তা এবং কল্যাণ সিংহের ক্রন্দনে অদ্যকার মত সে কার্য্যগুলা বন্ধ থাকিতেও পারে, অথবা, অঙ্গহানি যে সম্পূর্ণরূপে ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কল্যাণ সিংহের ইচ্ছা ছিল,

এত নিকটে আসিয়া তাঁহার সংবাদ না লইয়া স্নানাহারের জন্য সময়ক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বৃদ্ধ যখন তাহাতে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন ও বিবিধ হেতু প্রদর্শন করিলেন, তখন কল্যাণ সিংহ অগত্যা স্বীকৃত হইয়া সেই পল্লীগ্রামের নিকট গঙ্গাতীরে বজরা বাঁধিবার আদেশ করিল।

তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইল,—দুইখানি বজরা পাশাপাশি করিয়া গঙ্গাতটে বাঁধা হইল। আরোহিগণের মধ্যে অনেকেই অবতরণ করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল। কেহ বা আহারীয় দ্রব্যের অনুসন্ধানে, কেহ বা গ্রামের অবস্থা পরিদর্শনে, কেহ বা অপরাপর মনোভিলাষ পূরণার্থে চলিয়া গেল। শিরোমণি ঠাকুর তাঁহার স্থবির-দশাপ্রায়োগত দেহ খানি লইয়া ধীরে নামিলেন, এবং তথা হইতে গ্রাম্যঘাটে গিয়া মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ গড়াইয়া স্নানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বামা ঝি সেদিন-কার ডাকাতের ভয়ে ভীতা ছিল, সে আর তীরে নামিল না। কল্যাণ সিংহও বজরা হইতে অবতরণ করিয়া, যে দিকে একটি সরু পথ গ্রাম হইতে আসিয়া নদীর জলে নামিয়াছে, সেই দিকে গিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং একমনে পল্লীপথের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল।

তখন সবে উষার আগমন,—অন্ধকারাবৃত পূর্ব্বদিক্‌চক্রবাল পূর্ব্বগগনে উষা-সমাগম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। চারিদিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। পল্লীপথের ধূলি'পরে বিহগ তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে ;—দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনরাজি হইতে কুসুমগন্ধামোদিত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রকৃতির অঙ্গে স্নেহস্পর্শ দিতেছে। সে স্পর্শে বৃষ্টিবারিবিধৌত স্নিগ্ধশ্যাম বৃক্ষপত্রে মৃদু মর্ম্মর উঠিতেছে। চারিদিকে বিহগকাকলী। তখন বসন্ত-অন্ত ; কিন্তু কোকিল-কূজন নিবৃত্ত হয় নাই ;—চারিদিকে আর সেই ক্রমোচ্চ গ্রামস্পর্শী স্বরের ছড়াছড়ি নাই ; কিন্তু দূরাগত বিরল বিরাব আরও মধুর। আর কোকিল ভিন্ন আরও কত বিহগের গান।

দয়েল প্রভাতী ধরিয়াছে;—বৌ-কথা-কও কোন অনির্দ্দিষ্টা প্রণয়িণীর বাক্যশ্রবণলোলুপ হইয়া সাগ্রহ মিনতি জানাইতেছে; গৃহস্থের-খোকা-হোক অযাচিত হইয়াই গৃহস্থের গৃহে শুভঘটনার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেছে। আরও কত বিহগ উচ্ছাসিত স্বরভঙ্গিতে কূজন আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত প্রাচীন সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই; সে কৌলীন্য-গৌরব-হীন হইয়াও তাহারা পল্লীবাসীর স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। তাহারা পল্লীজীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ। কত দিন হইতে তাহারা পল্লীবাসীর কর্ণে সুধাধারার বর্ষণ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে যেন রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বগগনে প্রথম রবিরশ্মি ফুটিয়া উঠিল;—সেই কিরণে পথিপার্শ্বে দূর্ব্বাদলে শিশির-বিন্দু বিগলিত-রবিকর-বিন্দুর মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যেন মন্ত্রবলে সহসা নানা বিহগের প্রভাতী নীরব হইল। দূরে-দূরে—নিকটে-দূরে—জনহীন পল্লীপথে ও ক্ষেত্রে কৃষকেরা দেখা দিতে লাগিল। সেই প্রভাতালোকে গঙ্গাতীরস্থ বাবলাগাছের কণ্টক-বহুল শাখা-রাজি হরিদ্রাবর্ণ কুসুমে শোভিত হইল; মাঝে মাঝে তৃণে তৃণে ফুল ফুটিয়াছে;—তটিনী তপনকর-জালধৌত প্রভাতের মত বহিয়া চলিয়াছে;—গ্রাম্য কৃষকবধূ পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া ঘাট হইতে ফিরিতেছে।

কল্যাণ সিংহ আপন মনে সেই সকল শোভা দেখিতেছিল, আর তাহার মনের মধ্যে চিন্তা-কল্পনার একটা প্রবাহ উঠিয়া পড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, "এই সুখ-সন্তৃপ্ত ধরণীর মাঝখানে মানুষ সীমা চায় কেন? নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নাম শুনিয়া কল্যাণীর প্রাণ এত ব্যাকুল হয় কেন? শোভা ত জগৎময়,—তবে একটি সীমার মধ্যে যাইতে প্রাণ এত ব্যাকুল হয় কেন? বুঝি, এত বৃহৎ—এত অসীম ধারণায় আসে না, ধরিতে পারে না, তাই মনুষ্যের প্রাণ সসীমের দেবতা চায়।"

সহসা কল্যাণ সিংহ দেখিতে পাইল, এক খানি শিবিকা অতিক্রুত সেই ঘাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে একজন অশ্বারোহীও ছিল। ঘাটে আসিয়া শিবিকার গতি স্থগিত হইল, এবং বাহকেরা শিবিকা নামাইল। শিবিকার মধ্যে একজন পুরুষ শায়িত ভাবে ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে নামালি যে?"

একজন বাহক উত্তর করিল, "আজ্ঞে, মোরা ঘাটে এয়েছি; পার হতি হবে।"

আরোহী বলিলেন,—"ঘাটে নৌকা নাই?"

বাহক বলিল,—"ওপারের কিনারে না নাগান আছে। দাঁড়িমাঝি কেউ নেই।"

অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, শিবিকারোহীও শিবিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া শিবিকা হেলান দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন;—বাহকেরা পার হইবার বিলম্বের সম্ভাবনা বুঝিয়া একটু দূরে গিয়া জোট পাকাইয়া বসিয়া তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিল।

যে দিকে কল্যাণ সিংহ ছিল, তাহারা সেই দিকের একটি বৃক্ষতলে গিয়া বসিয়াছিল।

এত লোক দেখিয়া কল্যাণ সিংহের বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু নিজের পরিচ্ছদাদি স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইয়া সে, বাহকদিগের সন্নিকটস্থ হইল।

দীনু বেহারা তখন কেবল রামার হাত হইতে সাজা কলিকাটা লইয়া হুঁকার মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক দম কসিতে যাইতেছিল, সহসা কার্ত্তিকের ন্যায় রূপবান কল্যাণ সিংহকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মুখ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বিস্মিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

কল্যাণ সিংহ বলিল,—"তা, তামাক খাও না। আমি ত তোদের প্রভু নহি।"

কি মিষ্ট স্বর! দীনু বুঝিল, ইনি কোন রাজপুত্র হইতে পারেন। বলিল, "হুজুর, আমরা বেহারা মানুষ,—আমাদের মনিব সকলেই।"

ক। পাল্কীতে যাইতেছেন, উনি কে?

দী। আজ্ঞে হুজুর; উনি কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ানজি।

ক। উনি কোথায় যাইতেছেন?

দী। মুর্শিদাবাদে। টাকার জন্যে মহারাজকে নবাব সাহেব আটক ক'রে রেখেছেন, তাই বুঝি উনি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে আরও দশ পনের জন সিপাই আছে,—তারা গ্রামের মধ্যে একটা দোকানে ব'সে তামাক-টামাক খাচ্চে।

ক। আর ঘোড়ায় চ'ড়ে এলেন, উনি বুঝি দেওয়ানের মুহুরী হবেন?

দী। না, উনি কৃষ্ণনগর থেকে আসেন নি। এই একটু আগে —ভোরের সময় আমাদের সঙ্গে এসে মিশেছেন। উনি কে, তার পরিচয় জানিনে। তবে দেওয়ানজির কাছেই উনি এসেছেন। এর মধ্যে পাল্কী আর কোথাও ভুঁই দেওয়া হয়নি,—উনিও দেওয়ানজির সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন নি,—এই এতক্ষণ আমাদের পাছে পাছেই আস্‌ছেন।

কল্যাণ সিংহ আর সে স্থলে দাঁড়াইয়া শ্রান্ত বাহকগণের তামাকু সেবনের অন্তরায় হইতে ইচ্ছা করিল না। তথা হইতে একটু অগ্রসর হইয়া দেওয়ানজি যেখানে পাল্কী হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সেই দিকে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের ইচ্ছা, মুর্শিদাবাদের ব্যাপারের সংবাদ অবগত হয়, কিন্তু স্ত্রীজনোচিত স্বভাবে নিকটস্থ হইতে পারিতেছিল না। অনতিদূরে দাঁড়াইয়া অশ্বারোহণে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত আর দেওয়ানজির সহিত যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহাই শুনিতে লাগিল। দেওয়ানজি ভ্রুকুটি-কুটিল নয়নে সেই ব্যক্তির মুখের

দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জয়চাঁদ! তোমার নায়েব কি নাসিকায় সর্ষপ-তৈল দিয়া নিদ্রাসুখানুভব করিতেছেন? আমি টাকার জন্যে লোকের উপরে লোক পাঠাইতেছি, সংবাদের উপরে সংবাদ পাঠাইতেছি,—মহারাজা বন্দী। টাকা লইয়া মুর্শিদাবাদে আসিব। কিন্তু তোমার নায়েবের গ্রাহ্যই হইতেছে না। শেষে গত পরশ্বঃ টাকা পাঠাইবার কথা ছিল, আমি শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কোথায় টাকা!—কোথায় লোক! এমন হারামজাদকি সে কোথায় শিখিয়াছে?"

জয়চাঁদ কৃষ্ণনগর মহারাজের ফুলতলা কাছারির মুহুরি। বাড়ী ফরিদপুর জেলায়, বয়স চল্লিশের কিছু অধিক।

জয়চাঁদ বলিল,—"হুজুর; তানার দোষটা কি বল্‌বার পারেন? প্রজারা খাজনা দিবারে চায় না—তাদের গরু আটক করবার লাগ্‌লিও খাজনা আদায় হয় না—তা তানার দোষ কি? অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, তৎপরে এই সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন। আমি পথেই শোন্‌বার পাইলাম যে, হজুরের শিবিকা গমন করিয়াছে—তাই অশ্ব চালাইয়া আসিয়া ধরলাম।"

দেওয়ানজি রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"হাজার টাকা সে কি ভিক্ষা পাঠাচ্ছে না কি? দশ হাজার টাকার জন্য তাহাকে লিখিয়াছিলাম, আর এক হাজার পাঠাইয়াছে? যাও, আমি টাকা চাহিনা।"

জ। ক্যাম্বাই কথা কহিতে লাগ্‌চেন হজুর? যদি দ্যাশে গিয়ে দেখ্‌বার চান্, তবে যেয়ে দেখতি পারেন,—প্রজা লোক সব না খাতি পেয়ে মারা যাচ্চে। আমরা যে অত্যাচার ক'রে টাকা আদায় ক'চ্চি, তা দ্যাখ্‌তি পেলে আপনারা অশ্রু রক্ষা কর্ত্তে পারেন না।

দে। তাও বুঝি, কিন্তু মহারাজা যে, টাকার দায়ে বন্দী,—এখনও দেড় লক্ষ টাকা বাকি। বিশ হাজার টাকার সংস্থান করিয়া যাইতে পারিলাম না। যাহাও লইয়া যাইতেছি, তাহার অর্দ্ধেক আবার

অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য রেজাখাঁকে ঘুস দিতে হইবে। মহারাজের উদ্ধারের উপায় কি? যাও জয়চাঁদ, যে টাকা আনিয়াছ, আমাকে দিয়া তুমি এখনই ফিরিয়া কাছারি যাও,—নায়েবকে আমার কথা বলিয়া বলিবে, পশুর ন্যায় হৃদয় করিয়া প্রজার নিকটে টাকা আদায় করে। আমরা যাঁহার ভৃত্য—সেই মহারাজা বন্দী, সুতরাং আমাদের ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে?

জ। আপনি কি বলবার লাগ্‌চেন,—ধর্ম্মপথ কি আছে! আচ্ছা প্রজাদের মেয়ে মানুষগুলা কেড়ে নিয়ে বেচে নিলে হতি পারে না কি? মেয়ে মানুষ বেচ্‌লি নাকি অনেক টাকা হতি পারে।

দে। তুমি একটি গর্দ্দভ!

জ। নায়েব মশায়ও মধ্যে মধ্যে ও কথাটি বলিয়া থাকেন। গর্দ্দভ হইলে যে, আমার চারি খানা পা হইত।

দে। নায়েব যে তোমার মত নিরেটকে দিয়ে টাকা কড়ি পাঠায়, আমি সেজন্য তাহাকেও আহাম্মক বলি। কোন্ দিন টাকাকড়ি হারিয়ে ব'সে থাক্‌বে। বাঙ্গাল, মনুষ্য মধ্যেই গণ্য নহে।

জ। আপনি মনিব,—মা-বাপ। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কন কেন। ওতে বক্ষস্থলে বড় আঘাত লাগে! আমার হাত হতি টাকা কেরে নেয়, সে আমার সহধর্ম্মিণীর মাস্‌তুতা ভ্রাতা।

দে। (হাসিয়া) তা পারে না বটে,—দশজনেও তোমার কিছু করিতে পারে না। দেহে তোমার অসীম শক্তি। কলির ভীম বলিলেও চলে। তবে বুদ্ধিটা এত সূক্ষ্ম যে, একেবারে নাই বলিলেও হয়। ভাল, জমিদারি কাগজ পত্র লেখ কেমন ক'রে?

জ। বল্‌তি লাগ্‌চেন কি? হনোর আমার যা আছে, তা দেখে নায়েব মশায় তারিব মেরে যান। তিনি যা লিখা করে দেন, আমি তা মুক্তার স্তার নকল ক'রে দি।

দে। তা বুঝেছি,—নকল কর, আর হুড়হাঙ্গামের যায়গায় যাও;—নির্ব্বুদ্ধি লোকগুলা বিশ্বাসীও হয়, এই জন্যেই নায়েব তোমাকে রাখে। যাই হোক্, টাকা দিয়ে তুমি এখনই চলিয়া যাও। নায়েবকে টাকা আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতে বলগে।

জ। আর একটা বাক্যি জিজ্ঞাসা করিতে বাকি আছে।

দে। কি?

জ। নায়েব মশায় কহিয়া দেছেন, আপনার কুশল অবগত হইয়া যাইতে।

দে। কুশল আর অকুশল। সর্ব্বদাই যাহাদিগকে অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ হইতে হইতেছে,—যাহার মণিব টাকার দায়ে কারারুদ্ধ, তাহার আবার কুশল! বলিও, শারীরিক একরূপ আছি।

জ। আর একটা কথা,—গত চৈত্রি মাসে যে একটা মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সে আপনার না আপনার ভ্রাতার?

দে। সাধে কি তোমায় সকলেই গর্দ্দভ বলে! আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে।

জ। হয়,—সেই জন্যি কয়বার যাতায়াতে তানার সহিত সাক্ষাৎ হয় নি। কি শোচনীয় সংবাদ! তানার কি রোগে মৃত্যু হইয়াছিল?

দে। সর্পদংশনে।

জ। সর্পদংশন? কি সর্ব্বনাশ! কোথায় দংশন হইয়াছিল?

দে। পায়ে।

জ। তবু ভাল! চক্ষু দুটা যে বাঁচিয়াছে—সে পিতৃপুণ্য! চক্ষু মহারত্ন ধন!

কল্যাণ সিংহ অনতিদূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেওয়ানজি সে সুন্দর মুখে সৌন্দর্য্যের হাসি দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। তিনিও একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বানর! তুমি টাকা দিয়া যাও। আর জ্বালায়ো না।"

জ। প্রাতঃকালে বানর কইবেন না, ওটা অযাত্রা বলিয়া শোনা যায়।

তারপরে, দেওয়ানজির হস্তে সহস্র মুদ্রার মোহর প্রদান পূর্ব্বক অভিবাদন করতঃ জয়চাঁদ অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি কল্যাণসিংহকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যুবক! তোমার নাম কি?"

ক। আজ্ঞে, আমার নাম কল্যাণ সিংহ।

দে। এই স্থানেই কি তোমার বাড়ী?

ক। আজ্ঞে না;—আমি গোষ্ঠবিহার হইতে আসিতেছি।

দে। কোথায় যাবে?

ক। মুর্শিদাবাদে।

দে। কেন?

ক। গোষ্ঠবিহারের রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়, বাকি রাজস্বের দায়ে সেখানে বন্দী হইয়াছেন। তাই আমরা কিছু টাকা লইয়া যাইতেছি। ঐ যে বজরা দুই খানি দেখিতেছেন, উহাতে আমাদের লোক জন আছে।

দে। বজরা বাঁধিয়া এখানে অবস্থান করিতেছ কেন? মুর্শিদাবাদের অতি নিকটে আসিয়াছ ত?

ক। আমাদের সঙ্গে শিরোমণি ঠাকুর আছেন, তিনি এই স্থান হইতে মাধ্যাহ্নিক ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া যাইতে চাহেন।

দে। শিরোমণি, তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উদর-সেবার ব্যবস্থা লইয়াই ব্যস্ত। বালক! তুমি বুঝিতেছ না, বঙ্গীয় ভূস্বামিগণের উপরে সেখানে কি অত্যাচার হয়? এক মুহূর্ত্তের অত্যাচারে—একদণ্ডের পীড়নে অনেকের প্রাণবায়ুও বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। আর বিলম্ব করিও না। এখনই বজরা ভাসাইয়া চলিয়া যাও। সম্পূর্ণ রাজস্ব না

দিতে পারিলেও কিছু রাজস্ব, কিছু উৎকোচ দিয়াও কয়েকদিনের জন্য অত্যাচারের হস্ত হইতে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিবে।

কল্যাণ সিংহের হৃদয়ের সুপ্ত-চিন্তা জাগিয়া বসিয়া তাহার ভীমভ্রূকুটিতে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কল্যাণ সিংহ বলিল,—"মহাশয়! আমি কখনও বিদেশে আসি নাই। সঙ্গে তেমন বুদ্ধিমান লোকও নাই। বাকি রাজস্ব সমস্তও আনিতে পারি নাই,—কাহাকে কি প্রকারে উৎকোচ দিতে হয়, কাহার সহিত কি প্রকার বন্দোবস্ত করিতে হয়,—আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আপনিও মুর্শিদাবাদ যাইতেছেন, যদি দয়া করিয়া আমাকে ঐ সকল বিষয়ের সদুপদেশ প্রদান করেন, তবে বাধিত হইব।"

দেওয়ানজি বলিলেন,—"সদর ঘাটের উপরে কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ীতে যাইও, আমার সহিত সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে। যাহা যাহা করিতে হইবে, আমি সে সমস্ত বলিয়া দিব।"

এই সময় পাটনী খেয়ার নৌকা লইয়া এপারে আসিল। দেওয়ানজির লোকজনও আসিয়া পঁহুছিল। দেওয়ানজি বাহকদিগকে ডাকিয়া শিবিকা তুলিতে আদেশ করিলেন।

তাহারা পার হইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে চলিয়া গেল।

কল্যাণ সিংহ বজরার নিকটে গিয়া বৃদ্ধ শিরোমণি ঠাকুরকে সমুদয় কথা বলিল। বৃদ্ধ শিরোমণি বলিলেন, "আমাদের বজরা ভাসাইবার আর বিলম্ব নাই। আহারাদি প্রস্তুত। অনেকে স্নানাদি করিয়া আহারও করিতেছে। তুমিও সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লও।"

তারপরে, আহারাদি অন্তে সকলে বজরায় উঠিয়া পড়িল। বজরা হেলিতে দুলিতে ছুটিতে ছুটিতে সৌধ-কিরীটিনী মুর্শিদাবাদ নগরের দিকে প্রধাবিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দিবা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কল্যাণ সিংহদিগের বজরা দুইখানি মুর্শিদাবাদের জাহ্নবীতটে গিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণ সিংহ, বৃদ্ধ শিরোমণি ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর এবং কয়েকজন সিপাহী তীরে উঠিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল ও চেষ্টা করিয়া গোষ্ঠবিহারের রাজার বাসার সন্ধান করিয়া লইল।

তখন, প্রত্যেক জমিদার ও রাজন্যবর্গের এক একটি বাড়ি মুর্শিদাবাদে থাকিত। সেখানে রীতিমত পাচক ব্রাহ্মণ, দাস দাসী ও এক এক জন উচ্চ-বেতনভোগী কর্ম্মচারী থাকিত, তাহাদিগকে মোক্তার বলা হইত। নবাব-সরকারে রাজস্ব আদান-প্রদান বা জমিদারি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের কাজ-কর্ম্ম এই কর্ম্মচারী দ্বারাই সম্পন্ন হইত। গোষ্ঠবিহারের রাজারও সেরূপ একটি বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীকে বাসাবাড়ী বলা হইত। যথা,—'গোষ্ঠবিহারের বাসাবাড়ী', 'কৃষ্ণনগরের বাসাবাড়ী' ইত্যাদি।

বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহারা শুনিতে পাইল, মহারাজা এত দিন বাসাতেই রেজাখাঁর নজরবন্দীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু গত পরশ্বঃ হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছে।

কল্যাণ সিংহের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে, তখন কি

করিবে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। একখানা চৌকির উপরে বসিয়া পড়িয়া মোক্তারকে তলব দিল।

মোক্তার নিকটে আসিলে, শঙ্কাভিনম্র নয়নদ্বয় উত্তোলন করিয়া আবেশ-স্তিমিত বক্র-নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কল্যাণ-সিংহ বলিল,—"মহারাজকে কারাগারে লইয়া গিয়াছে; আপনি তাঁহার বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কি উপায় করিতেছেন?"

মোক্তার মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! মহম্মদ রেজাখাঁর নিকটে অন্য উপায় কিছুই খাটে না। রাজস্ব পরিশোধ না হইলে কোন প্রকার উপায়ই কার্য্যকারী হয় না।"

ক। আমরা টাকা আনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ হইবে বলিয়া বিবেচনা হয় না।

মো। রেজাখাঁ রাজস্বের এক পয়সা বাকি থাকিতে কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না।

ক। তাহাকে উৎকোচ দিলে নাকি ছাড়িয়া দেয়?

মো। কেবল উৎকোচ দিলে কিছুই হয় না। রাজস্বের কতক টাকা পরিশোধ করিতে হয়, এবং উৎকোচ প্রদান করিতে হয়।

ক। তাহা হইলে ছাড়িয়া দেয়?

মো। ছাড়িয়া দেয় না। জমিদারগণের উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার করে, কয়েক দিনের জন্যে মাত্র তাহা হইতে নিরস্ত হয়।

ক। অমানুষিক অত্যাচার!—তাহা আমি শুনিতে চাইতেছি না। উৎকোচ দিলে, অন্ততঃ বাসায় আসিতে দিবে ত?

মো। না না, আর তাও দিবে না। যত দিন নজরবন্দী অবস্থায় বাসাবাড়ীতে রাখিয়াছিল, তাহার মধ্যে, রাজস্বের মধ্যে কিছু টাকা ও উৎকোচের টাকা দিতে পারিলে, বাসাতেই নজরবন্দী অবস্থায় রাখিতে পারিত;—কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। এখন কারাগারে লইয়াছে,

বাকি রাজস্বের কিয়দংশ ও উৎকোচ প্রাপ্ত হইলে, কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিবে না, কারাবদ্ধই রাখিবে—তবে বেত্রদণ্ড, বৈকুণ্ঠবাস প্রভৃতি সাজা দিবে না। সমুদয় রাজস্ব মিটাইয়া দিলে তবে ছাড়িয়া দিবে।

কল্যাণ সিংহের সমস্ত বুকটা ধসিয়া বসিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সেই ভগ্ন-হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তপ্ত-শ্বাস বাহির হইয়া প্রকৃতির করুণ-বক্ষে বিলীন হইল।

কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া চিন্তিয়া কল্যাণ সিংহ বলিল,—"মন্দের ভাল। যাহাতে মহারাজের কোন প্রকার সাজা না হয়, তাহা করিতে হইবে। যে টাকা আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার কতক অংশ রাজস্ব ও কতক অংশ উৎকোচ স্বরূপে রেজাখাঁর ভাণ্ডারে পাঠাইতে হইবে। উৎকোচ কত দিতে হইবে?"

মো। উৎকোচের সংখ্যায় ঠিক নাই। তবে অন্ততঃ দশ হাজারের কম উৎকোচ তাঁহার নিকটে নাই।

ক। কি সর্ব্বনাশ! যাহাদিগকে রাজস্বের দায়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, যাহাদিগকে টাকার জন্য পশুর অধমভাবেও যন্ত্রণা দিতেছে, তাহাদিগের নিকটে এত উৎকোচ গ্রহণ! মা জয়দুর্গে! এ তোমার কোন্ লীলার অভিনয় মা?

মো। আপনি বোধ হয়, মুর্শিদাবাদে এই সবে নূতন আসিয়াছেন?

ক। হাঁ।

মো। বয়সেও আপনি নবীন। কিন্তু আপনার চেহারা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি; হয় আপনি গোষ্ঠবিহার-রাজের পুত্র, না হয় নিকট আত্মীয় কেহ হইবেন। যখন মহারাজা আমার প্রভু, তখন আপনিও প্রভু। প্রভু! এ মুসলমানের রাজত্ব। হৃদয়ের আবেগে কোন কথা যদি বলিয়া ফেলেন এবং তাহাই তাহাদিগের কর্ণগোচর হয়, তবে অনর্থ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। আপনার রূপ দেখিয়া বোধ হয়,

আপনার হৃদয় স্বাধীন,—পরাধীন, পরপদাবদলিত বঙ্গে জন্মিবার জন্য বুঝি ও-রূপের সৃষ্টি হয় নাই, তাই ভয়,—পাছে স্বাধীন ভাবে কোন কথা বলিয়া ফেলিয়া একটা অনিষ্টপাত করিয়া বসেন; তাই সাবধান করিয়া দিলাম, অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

মোক্তার বয়সে বৃদ্ধ, জাতিতে কায়স্থ। নবাব-সরকারে যাতায়াতে কুর্ণিস্ করিয়া করিয়া, তোষামোদের বাক্য প্রয়োগ করিয়া করিয়া, মাথার চুল পাকাইয়া বসিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তারের কথাগুলি কল্যাণ সিংহের কর্ণে পঁহুছিলে সে তাহার অবস্থা স্মরণ করিল, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর করিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল,—"রেজাখাঁর সহিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে কখন তুমি যাইবে?"

মো। আজ আর হইবে না। প্রতিদিন প্রত্যূষে দরবার বসিয়া থাকে, সেই সময় সমস্ত স্থির করিতে হইবে।

তারপরে আরও নানাবিধ কথায়, নানাবিধ কাজে সময় কাটিয়া গেল। সঙ্গী লোকজন আপন আপন সুখানুসন্ধানে লিপ্ত হইল, কিন্তু কল্যাণ সিংহের চিত্তের স্থৈর্য্য ও সুখ কোথায়? ক্রমে বেলা অবসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন কল্যাণ সিংহ আপনার সঙ্গী লোকজনকে বাসাবাড়ীতে টাকা প্রভৃতি লইয়া বজরা হইতে উঠিয়া আসিতে আদেশ প্রদান করতঃ মাথায় একটা পাকড়ী বাঁধিল, পায়ে দিল্লীবাজ জরির জুতা পরিল, একখানা রেশমের কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরিল এবং পরিশেষে পাঞ্জাবী ধরণের ঢিলে অথচ মোটা জামা পরিধান করতঃ রাজপথে বাহির হইল।

বঙ্গপল্লীর অপরাহ্ণের নয়ন-মুগ্ধকর স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রী, কল্যাণ সিংহ, জন-কোলাহল-মুখরিত বহুসৌধ-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ-রাজপথ-সমন্বিত সহরের কুত্রাপি দেখিতে পাইল না। পল্লীপ্রকৃতির অপরাহ্ণ-রৌদ্রের সেই হিরণ্ময়ী

আভা, পথে ধূলিরাশির অপ্রাচুর্য্য, দিঙ্মণ্ডলের প্রসন্নভাব, বনান্তরালের কুসুমের বিকাশ, সুনীল অম্বরপথে নির্গলিতাম্বুগর্ভ অভ্র-শুভ্র মেঘের নীরব নিশ্চিন্ত লঘুগতি—বঙ্গদেশের রাজধানী সৌধকিরিটিনী জন-কোলাহল-মুখরিত মুর্শিদাবাদে এ সকল লক্ষণের বড় একটা পরিচয় পাওয়া গেল না।

গোধূলি ও ধূলি ধরাতল পূর্ণ করিয়া গগন-পথ অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছিল। দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত মানবগণ শুষ্ক-আননে আপন আপন বাড়ী ফিরিতেছিল। বলীবর্দ্দ-বাহিত পণ্যবোঝাই শকটরাশি সারি বাঁধিয়া নানা শব্দ উত্থাপিত করিতে করিতে বাণিজ্য-কুঠি অভিমুখে চলিতেছিল। তাহাদের শব্দ শুষ্ক-ধরণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের ন্যায় কল্যাণ সিংহের কাণে বাজিতে লাগিল এবং দূরস্থ নবাব-বাড়ীর নহবতখানা হইতে পূরবীর উচ্চ অথচ অত্যন্ত করুণ সুর উত্থিত হইয়া যেন সেই ছায়াচ্ছন্ন ধূলিলাঞ্ছিত স্তব্ধ সান্ধ্য-প্রকৃতির মাতৃ-বক্ষে মর্ম্মাহত বেদনাকাতর সন্তান-জীবনের নিদারুণ ক্ষোভ ও হাহাকারের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। সহরের চারিদিকে উদ্যম, উৎসাহ, প্রীতি ও প্রফুল্লতার ভাব; কিন্তু কল্যাণ সিংহের মনে হইতেছিল, মুর্শিদাবাদে সে সকলের কিছুই নাই। এখানে কেবল দুর্ব্বহ মানব-জীবনের মর্ম্মোচ্ছ্বাস ও নিরানন্দময় হৃদয়ের অবসাদ আকাশ-পথে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

কল্যাণ সিংহ আপন-মনে রাস্তা বহিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা,—সে কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ীতে গমন পূর্ব্বক দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিবে; তবে সে বাসাবাড়ী কোন্ দিকে, তাহা সে অবগত নহে,—কাহারও নিকট কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। দেওয়ানজির নিকট সে তখন শুনিয়াছিল, সদরঘাটের নিকটে কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ী। তাই সে, যে দিকে, গঙ্গা প্রবাহিতা, সেই দিকে যাইতেছিল। সে একটা ছোট পথ অতিক্রম করিয়া বড়

রাস্তায় পড়িল,—এত বড় রাস্তা কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। এ পথে জনতা অত্যন্ত অধিক। রাস্তার দুই ধারে বিবিধ প্রকার দ্রব্য-পরিপূর্ণ বিপণী সকল সজ্জিত রহিয়াছে। কাপড়ের দোকানের সারি, মুসলমান ও খোট্টা দোকানীগণ বাঙ্গালী-তাঁতির বস্ত্ররাশি ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিয়াছে এবং বিক্রয় করিতেছে। পাশেই মনোহারী দোকান,—মাথার টুপী কোলের কাছে রাখিয়া দিল্লীর দোকানদার গুরু গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে, কাঁসা পিতলের বাসনের দোকানে দোকানদারের ভৃত্যগণ ক্রমাগত পিতলের উপর ঠংয়াস ঠংয়াস শব্দ করিতেছে। দোকানদার মহাশয় দোকানের সম্মুখে পথের উপর রক্ষিত খাটিয়ায় শুইয়া, কেহ বা বসিয়া গল্প করিতেছে। উটের উপরে বসিয়া কেহ কেহ রঞ্জিত উষ্ট্র-গলরজ্জু ধারণ পূর্ব্বক গন্তব্যপথে চলিয়াছে,—উটের গলদেশাবদ্ধ ঘণ্টা ক্রমাগত ঠুন্ ঠুন্ করিয়া শব্দিত হইতেছে।

রাজপথ দিয়া হন হন করিয়া গরুর গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, বলদের গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে, গাড়ীতে আরোহিগণ বসিয়া ঢুলিতেছে। সুদৃঢ় কাটিবারি বা সুবৃহৎ ওয়েলার সংযোজিত শকটগুলি ধনি-সন্তানগণকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দিক্ হইতে দিগন্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। গাধার পিঠে ধোবারা কাপড় বোঝাই দিয়া সারি সারি বাসায় ফিরিতেছে। কল্যাণ সিংহ এরূপ জনতা জীবনে দেখে নাই, তাহার হৃদয়ের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু গতির বিরাম নাই, সে ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে সহর সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ রাস্তার পার্শ্বস্থ আলোকমালা সকল জ্বালিয়া জ্বালিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কল্যাণ সিংহ কোন্ দিকে গমন করিলে কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ী প্রাপ্ত হইবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না,—ক্রমে ক্রমে তাহার মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে সহরের পথ যেন

তাহার নিকটে অগাধ, অনন্ত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। সে তখন বুঝিতে পারিল, কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিলে সেখানে উপস্থিত হওয়া সহজ নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে কাহাকে? সকলেই যেন আপন আপন কাজে মহাব্যতিব্যস্ত—কেহ কাহারও সহানুভূতির জন্য একবিন্দু সময় নষ্ট করিতেও যেন সম্মত নহে।

সহসা কল্যাণ সিংহ দেখিতে পাইল, সন্ধ্যার আধ বিকশিত সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, পুষ্পব্যজনী ও পুষ্পোপাধান একটি চুপড়ীতে লইয়া এক বর্ষীয়সী রমণী সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পুষ্পগন্ধে পথিক-মনে আনন্দের সৃষ্টি হইতেছিল।

কল্যাণ সিংহ কল্যাণী,—সে পুরুষবেশে থাকিলেও পুরুষের সহিত কথা কহিতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই, এইবার একটি রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া সে, তাহাকে ডাকিল।

রমণী পশ্চাৎ ফিরিয়া পথিপার্শ্বস্থ আলোকস্তম্ভস্থ উজ্জ্বলালোক সাহায্যে দেখিতে পাইল, অতি সুন্দর অনিন্দ্যমুখ এক কিশোর পুরুষ তাহাকে ডাকিতেছে। সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। রমণী পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া যুবকের সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি আমায় ডাকিয়াছ?"

ক। হাঁ, আমি তোমায় ডাকিয়াছি।

র। কেন ডাকিয়াছ?

ক। কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ী কোন্ দিকে? আমি সেখানে যাইব।

রমণী সে স্বর শুনিয়া মোহিত হইল। যেন পরিপূর্ণ বাঁশরীর মিঠা আওয়াজ। রমণী বলিল,—"তুমি কি বিদেশী?"

ক। হাঁ, আমি বিদেশী। আ'জ মাত্র এ সহরে আসিয়াছি।

র। কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ী সদরঘাটের কাছে, সেত এ পথে নয়!

ক। তবে কোন্ পথে যাইব ?

র। আমি নবাববাড়ী যাইব, সময় নাই, নতুবা তোমাকে সে বাড়ী দেখাইয়া দিয়া যাইতাম। আমার সঙ্গে ফিরে এস,—খানিক আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে, তারপরে আমি যে পথ দেখাইয়া দিব, সেই পথে গেলে সে বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারিবে।

রমণী কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ী যে চিনে, তাহা কল্যাণ সিংহের প্রত্যয় হইল, কেন না দেওয়ানজির মুখে সে শুনিয়াছিল, তাঁহাদের বাসা সদরঘাটের নিকট, রমণীও তাহাই বলিল। কল্যাণ সিংহ ফিরিয়া রমণীর সঙ্গে চলিল।

যাইতে যাইতে রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

ক। আমার বাড়ী গোষ্ঠবিহারে।

র। সে কোন্ দেশে ?

ক। কি বলিলে চিনিবে, আমি তাহা জানি না।

র। চিনিয়াই বা আমার ফল কি ? তুমি কি হিন্দু ? পোষাক দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে।

ক। হাঁ, আমি হিন্দু।

র। ব্রাহ্মণ কি ?

ক। হাঁ, ব্রাহ্মণ।

র। তোমার নাম কি ?

ক। আমার নাম কল্যাণ সিংহ।

র। এ সহরে কত দিন থাকিবে ?

ক। এখনও অনেক দিন থাকিব।

র। তোমার বাসা কোথায় ?

ক। গোষ্ঠবিহারের রাজার বাসাবাড়ী জান কি ?

র। হাঁ হাঁ,—তা জানি বৈকি। তুমি বোধ হয়, গোষ্ঠবিহারের রাজার ছেলে,—কেমন?

ক। তাহা কেমন করিয়া বুঝিলে?

র। ওগো, তোমার মত রূপ কি রাজার ছেলের ভিন্ন অন্য কারু হয়?

ক। তুমি কি এই নগরে বাস কর?

র। হাঁ, আমি ফুল বিক্রয় করিয়া থাকি,—বড় বড় রাজারাজড়াদের বাড়ী বাড়ী ফুল যোগান দিয়া থাকি। মহম্মদ রেজাখাঁর বাড়ীতে নূতন যোগান দিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ক। তুমি কি মুসলমান?

র। না, আমি হিন্দু।

ক। তুমি হিন্দু, কিন্তু হিন্দুদ্বেষী রেজাখাঁর বাড়ীতে হিন্দু ফুলওয়ালী কেন? মুসলমান ফুলওয়ালী যাতে দু'পয়সা পায়, তা না করিয়া তোমার ফুল লয়েন কেন?

র। আমার মালার, আমার পাখার, আমার বালিশের যেমন গাঁথনি হয়, কোন মুসলমান ফুলওয়ালীই তেমন গাঁথিতে পারে না, তাই মহম্মদ রেজাখাঁর বেগম আমার যোগান লইয়া থাকেন। আর আর যোগান মুসলমান ফুলওয়ালীরাই দিয়া থাকে।

ক। তুমি কি এখন সেই স্থানেই যাইতেছ?

র। হাঁ।

ক। একটু আগে বলিয়াছিলে, নবাববাড়ী যাইতেছি।

র। মহম্মদ রেজাখাঁর বাড়ীও অনেকে নবাববাড়ী বলে। তিনি নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর নাতিনীর খসম।

ক। মহম্মদ রেজাখাঁর কয়টি বেগম?

র। চারিটি বিবাহিত,—আর উপসর্গ অনেক আছে।

ক। কয়টিকে ভালবাসেন?

র। নফিসা বেগম নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর নাতিনী, তারই খাতিরে—তারই জন্যে রেজাখাঁ দেওয়ান, কাজেই তাকে মৌখিক খুব ভালবাসাই দেখান হয়, কাজে কিন্তু ফতেমা বিবিকে ভালবাসেন।

ক। নেফিসা বেগম তাহা বুঝিতে পারেন?

র। হাঁ, তা বুঝতে পারেন বৈকি। নারীজাতি ভালবাসার একটু দাগও ধরিয়া দিতে পারে।

ক। যাক্, সে সকল বড় ঘরের বড় কথায় আমাদের কাজ কি? তোমার ঘর কোথায়?

র। কেন?

ক। না,—না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

র। মহাজনপটীর মধ্যে। আমি তোমাদের বাসাতেও মধ্যে মধ্যে যাইয়া থাকি। যত বড় বড় লোক এখানে আসেন, আমার ফুলের জন্য সকলেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। তোমার কি ফুলের প্রয়োজন হইবে না?

ক। যদি হয়, তোমার নিকট হইতেই লইব।

র। হাঁ, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া তোমার সন্ধান লইব। এক্ষণে এই বাঁ ধারে যে পথ দেখিতেছ, এই পথ বহিয়া বরাবর চলিয়া যাও,—খুব খানিক গেলে সম্মুখে একটা চাঁপা-ফুলের গাছ দেখিতে পাইবে, সে চাঁপাগাছের গোড়া দিয়া একটা গলি-পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া একটু গেলেই সম্মুখে একটা লাল রঙ্গের বাড়ী দেখিতে পাইবে, সেই বাড়ীই কৃষ্ণনগর-রাজের বাসাবাড়ী।

কল্যাণ সিংহ সে পথ বহিয়া চলিয়া গেল। পুষ্পবিক্রয়িণী তাহার গন্তব্য পথে চলিল।

যথা- নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া কল্যাণ সিংহ কৃষ্ণনগর-রাজার বাসাবাড়ীতে

উপস্থিত হইল। প্রথমেই একজন ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কল্যাণ সিংহ সাহসে ভর করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দেওয়ানজি কোথায় ?"

যে গৃহের বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া কল্যাণ সিংহ ভৃত্যকে দেওয়ানজির কথা জিজ্ঞাসা করিল, সে গৃহের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ফরাসের উপরে বসিয়া দেওয়ানজি কাহার সহিত গল্প করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে গা ?"

কল্যাণ সিংহ স্পন্দিত হৃদয়ে বলিল,—"আজ্ঞে আমি।"

দে। আমি কে ? ঘরে আইস।

কল্যাণ সিংহ গৃহপ্রবিষ্ট হইল। দেওয়ানজি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ও! তুমি পঁহুছিয়াছ ? এস।"

শঙ্কাভিস্পন্দিত হৃদয়ে ফরাসের একপার্শ্বে ধারের দিকে জড় সড় ভাবে পা ঝুলাইয়া উপবেশন করিয়া কল্যাণ সিংহ বলিল,—"আজ্ঞে, দুপুরের পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি।"

দে। রাজার সংবাদ কি ?

ক। মোক্তারের মুখে শুনিলাম, বাকি রাজস্ব আদায় করিতে করার অতীত হওয়ায়, কয়েক দিন হইল, তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়াছে।

দে। এখন কি উপায় চিন্তা করিতেছ ?

ক। মোক্তারের নিকট শুনিলাম, বাকি রাজস্বের কিয়দংশ ও প্রচুর উৎকোচ প্রদান না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই।

দে। সমস্ত রাজস্ব এককালীন পরিশোধ করিতে না পারিলে সেই ব্যবস্থাই বটে।

ক। কিন্তু সেই উৎকোচের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মোক্তার প্রকাশ করিলেন।

দে। কত?

ক। তিনি বলিলেন, যেরূপ বন্দোবস্ত হইবে—তবে দশ সহস্র মুদ্রার কম রেজাখাঁর উৎকোচ নাই।

দে। তাহাই সত্য বটে!

ক। তাহাতেও নাকি নিস্তার নাই।

দে। কি প্রকার?

ক। কারাগার হইতে নাকি মুক্তি দিবে না। তবে কারাগারে বন্দী করিয়া যে অত্যাচার করিত, অত টাকা উৎকোচ লইয়া নাকি পুনরায় টাকা দিবার করারের কাল পর্য্যন্ত সেই অত্যাচার করিবে না, এই মাত্র।

দে। মোক্তার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য।

ক। যদি সেই করারের মধ্যে বাকি টাকা সমস্ত আসিয়া না জুটে?

দে। আবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে।

ক। তবে এত টাকা ঘুস দেওয়া কিসের জন্য?

দে। এই কয়দিনের অত্যাচারে প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

ক। আবার যদি সমস্ত টাকা না আইসে, আবার ঘুস দিতে হইবে?

দে। হাঁ।

কল্যাণ সিংহ কি চিন্তা করিতে লাগিল, দেওয়ানজি গৃহস্থিত উজ্জ্বল দীপালোকে দেখিতে পাইলেন, সেই চিন্তাক্লিষ্ট মুখজ্যোতিঃ ভাস্বর, কুটিল এবং নয়নদ্বয় যেন সমগ্র বঙ্গবাসিগণকে ঘৃণা করিতেছে। দেওয়ানজির দক্ষিণ পার্শ্বে একজন বলিষ্ঠ যুবক বসিয়াছিলেন,—তিনিও কল্যাণ সিংহের চিন্তাক্লিষ্ট মুখভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। তবে দেওয়ানজির মোহে, আর সেই যুবকের মোহে প্রভেদ বিস্তর। দেওয়ানজি মুগ্ধ হইতেছিলেন, কল্যাণ সিংহের হৃদয়ে যে ভাবলহরী খেলি

করিতেছিল, তাহার সুন্দর মুখে তাহার ছবি বিকশিত [illegible]ছিল,—তাহাই দেখিয়া; আর যুবক মোহিত হইতেছিলেন, তাহা[illegible]র মুখের বাহুভঙ্গী দর্শন করিয়া। এই যুবক কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা [illegible]জীবনের পুত্র রঘুরাম।

রাজা রামজীবন রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী [illegible]য়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পুত্র রঘুরামও তাঁহার [illegible]ব্যাহারে আসিয়া বাসাবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বলা বা[illegible], রঘুরামই কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা। কিন্তু [illegible]র কথা বলিতেছি, যখন তিনি রাজকুমার,—কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বা [illegible] রঘুরাম নহেন। যোদ্ধা বলিয়া রঘুরামের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল, সাধারণে তাঁহাকে রঘুবীর বলিয়া জানিত।

কল্যাণ সিংহ এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি ভাবিতেছিলে?"

কল্যাণ সিংহ বিনম্রস্বরে বলিল,—"না, এমন কিছু নয়।"

দেওয়ানজি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কুটিল রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছি, সুখে দুঃখে অত্যাচারে অবিচারে অনেক বিষয়ের চিন্তা ও মীমাংসা করিয়াছি,—আমার নিকট মনের ভাব লুকাইবার চেষ্টা কেন করিতেছ, যুবক! কিন্তু তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা হইবার নহে। 'বার রজবুতের তের হাঁড়ি' যে প্রবাদ বাক্য শুনিয়াছ, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহাই। দশজন বাঙ্গালীর মিল নাই,—সুতরাং বুক পাতিয়া বিদেশীর অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। তুমি নব্য যুবক;—সাবধান! ইহা মুসলমানের রাজধানী,—প্রাণের ভাব চাপিয়া যাইও।"

কল্যাণ সিংহ মৃদুস্বরে বলিল,—"এমন বাঙ্গালী বীর কি নাই যে, এই অত্যাচার-স্রোত রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে? আমার ক্ষুদ্র শক্তিও তাঁহার চরণে অর্পণ করিতাম।"

দেওয়ানজি দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন,—"সাবধান যুবক! অমন কথা আর মুখে আনিও না। তাহা হইলে তোমার জীবন থাকিবে না।"

কল্যাণ সিংহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"যে দেশের যুবকগণের পিতাকে বিদেশী অত্যাচারের আগুনে পোড়াইয়া দগ্ধ করে —শৃগাল কুকুরের ন্যায় অপমান করে, যে দেশের যুবকগণের ভগিনী কন্যা ও স্ত্রীর সতীত্ব নিরাপদ নাই, যে দেশের যুবকগণের প্রতিবাসী দরিদ্র বিদেশীর লুণ্ঠনে পথের ভিখারী—দস্যু-তস্করের করে নিষ্পেষিত, সে দেশের যুবকগণের জীবনে কি প্রয়োজন আছে, তা জানি না।"

কৃষ্ণনগর-রাজপুত্র রঘুরাম বলিলেন,—"যুবক! তোমার নাম কি? তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে বীর বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

ক। আজ্ঞে, আমার নাম কল্যাণ সিংহ। আমি বীর নহি—আমি মানুষ নহি। আমি যদি বীর হইতাম, তবে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কি নবাববাড়ীর জেলখানায় অত্যাচারে মরিতে হইত? আমি যদি মানুষ হইতাম, তবে মনুষ্যত্ব হারাইয়া ভূস্বর্গের দেবতা পিতার অত্যাচার শ্রবণ করিয়াও জীবিত থাকিতে পারিতাম?

দেওয়ানজির চক্ষু-কোণে একবিন্দু অশ্রু আসিয়া জমিয়া দাঁড়াইল। তিনি রঘুরামের মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুরাম বীর বলিয়া বিখ্যাত,—রঘুরাম পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুরামের পিতাও বাকি রাজস্বের দায়ে নবাবের অত্যাচারে জেলখানায় বন্দী। তিনিও বিবিধ প্রকারের কষ্ট ভোগ করিয়া কারাগারে অবসন্ন হইতেছেন। কিন্তু রঘুরামের বদনে দেওয়ানজি কোনও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখিলেন না। সেই প্রশান্ত নয়ন, সহাস আনন!

দেওয়ানজি কল্যাণ সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ইনি আমাদের যুবরাজ!"

কল্যাণ সিংহ ব্রীড়াবনত নয়নে রঘুরামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনার পিতাও বন্দী?"

র। হাঁ, যতদিন রাজস্বের টাকা পরিশোধ না হইতেছে, ততদিন তিনি বন্দী আছেন বৈ কি! সমস্ত রাজা ও জমিদারগণকেই এমন অবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে।"

ক। কৃষ্ণনগরের রাজা—ধনে মানে শ্রেষ্ঠ। আপনি তাঁহার বীর-পুত্র,—তাঁহারও সেই দশা!

র। মুসলমান এখন রাজার রাজা,—মুর্শিদকুলীখাঁ দিল্লীর বাদসার নবাব-নাজিম,—তাঁহার নিকটে আবার বীরত্ব, তাঁহার নিকটে আবার রাজত্ব!

ক। বীরত্ব দাসত্বের প্রতিযোগী;—যাহার জীবন দাসত্বের জলে গলিয়াছে, সে বীরত্বের কি জানে!

কল্যাণ সিংহ চলিয়া গেল। দেওয়ানজি বক্র দৃষ্টিতে যুবরাজ রঘুরামের দিকে চাহিলেন। রঘুরাম বলিলেন,—"বালক! নিতান্ত বালক! এখনও কোনও বোধ-শোধ হয়নি!"

দেওয়ানজি সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে মনঃসংযোগ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালে উঠিয়া কল্যাণ সিংহ বাসাবাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল, সদর রাস্তার উপর দিয়া একদল সিপাহী চলিয়া আসিতেছে। সিপাহীর সংখ্যা পঞ্চাশ জনেরও অধিক হইবে,—সিপাহীদিগের পশ্চাতে দর্শক বা পথিকের সংখ্যাও অনেক। তখন বেলা অধিক হয় নাই, কেবল আকাশের গায়ে সূর্য্যদেবের লাল রঙ্গ ধূসরে পরিণত হইয়াছে, মাত্র।

কল্যাণ সিংহ রাস্তার পার্শ্বে তাহাদিগের বাসাবাড়ীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান বা প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিল; সে, সিপাহীদিগের গমন দেখিবার জন্য স্থির হইয়া সেখানে দাঁড়াইল। যেখানে সে দাঁড়াইল, তাহার সম্মুখে লৌহের বড় বড় রেলিং দিয়া ঘেরা। রেলিংএর পরে রাস্তার নর্দ্দামা, তার পরে রাস্তা। রাস্তা দিয়া সিপাহীগণ যাইতে লাগিল। কল্যাণ সিংহ স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, সেই সিপাহীগণের মধ্যে অনেকগুলি বন্দী ধীরে ধীরে চলিতেছে। বন্দীর সংখ্যা খুব অধিক নহে—দশ বার জনের বেশী হইবে না। বন্দীগণ হেটমুণ্ডে মন্থরগমনে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের দৈহিক গঠন দর্শনে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াই জ্ঞান হইতেছিল। চরণতলে ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের গর্জ্জনশব্দ শ্রুত হইলে পথিক যেমন বিপন্ন,

চমকিত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, কল্যাণ সিংহও তদ্রূপ হইল। সে, দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল; তাকাইয়া ছিল, নয়ন মুদ্রিত করিল;—সেই বন্দীগণের মধ্যে তাহার পিতাও আছেন। তাহার পিতার দেহে সে লাবণ্য নাই,—তেমন যে, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, তাহা কালী হইয়া গিয়াছে। সে পুষ্ট দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে কালশিরা বাহির হইয়াছে। সেই গম্ভীর সদা-প্রফুল্ল নয়ন কোটরপ্রবিষ্ট ও ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কল্যাণ সিংহ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে যাইতেছিল; কিন্তু অবস্থা ও ঘটনা স্মরণ করিয়া অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া, সে সেইস্থানেই বসিয়া থাকিল। ক্রমে ক্রমে বন্দীগণকে লইয়া সিপাহীগণ তাহাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কল্যাণ সিংহ সেই স্থানেই সেই ভাবে বসিয়া আছে,—বুঝি তাহার ভালরূপ চৈতন্য ছিল না। বুঝি সে ভাল করিয়া সকল কথা স্মরণ করিতে পারিতেছিল না। বুঝি তাহার বাহ্য দৃষ্টি সে সময় সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতেছিল না,—এমন সময় রেলিংএর বাহিরে রাস্তার উপর হইতে কে ডাক দিল,—"কল্যাণ সিংহ!"

একবার ডাকিতে সে শুনিতে পায় নাই; উপর্য্যুপরি দুই তিনবার ডাকিলে, তবে সে চাহিয়া দেখিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"দেওয়ানজি? দেওয়ানজি! আপনারা কোথায় যাইতেছেন?"

দেওয়ানজির সহিত রঘুরাম ও তিন চারিজন আর্দ্দালী ছিল। দেওয়ানজি বলিলেন,—"এই পথ দিয়া তোমার পিতা, কৃষ্ণনগরাধিপতি ও অন্যান্য জমিদারগণ—বন্দী অবস্থায় সিপাহী-পরিবৃত হইয়া গমন করিয়াছেন, তুমি কি তাহা দেখ নাই?"

ক। হাঁ, দেখিয়াছি। তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া গেল?

দে। বৈকুণ্ঠে।

ক। বৈকুণ্ঠে?—সে নরকে। সেখানে লইয়া গিয়া বোধ হয়, সাজা দিবে?

দে। তাই বৈ কি।

ক। আপনারা কোথায় যাইতেছেন?

দে। সেই স্থানে।

ক। কেন?

দে। তাই দেখ্‌তে।

ক। দেখিয়া সহ্য করিতে পারিবেন? কৃষ্ণনগর-রাজপুত্রের গায়ে ও মখমলের পোষাক কেন? সঙ্গে আর্দ্দালী কেন? যাহার পিতা বন্দী—শৃঙ্খলাবদ্ধ—সিপাহীর আজ্ঞাবহ—তার সঙ্গে আর্দ্দালী! তার গায়ে মখমলের পোষাক! আসুন, আমরা ছিন্ন কাপড় পরিয়া, দাঁতে তৃণ করিয়া মুসলমানের চরণতলে পড়িগে,—যদি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন।

রঘুবীর কল্যাণ সিংহের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে একবার মাত্র চাহিয়া, দেওয়ানজির মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"ঐ লোকটির মাথা বোধ হয় খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

দেওয়ানজি সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কল্যাণ সিংহকে বলিলেন,—"তুমি যাবে?"

ক। না।

দে। কেন?

ক। আমি তাহা দেখিতে পারিব না। আমার সহ্য হইবে না।

রঘুবীর বলিলেন,—"বিপদ-আপদ সুখ-সম্পদ বুক পাতিয়া সহ্য করাই বীরের কার্য্য।"

ক। তা হইতে পারে।

র। এস, দেখে আসি।

ক। আমরা দেখিলে কি তাঁহাদের কষ্টের লাঘব হইবে। আমার বিবেচনায় আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলে অধিকতর কষ্টের কারণ হইবে।

দে। এস, ব্যাপারটাই একবার দেখিয়া যাবে।

কল্যাণ সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া একটু কি চিন্তা করিল, অবশেষে রেলিং পার হইয়া রাস্তায় উঠিল, এবং দেওয়ানজিদিগের সহিত মিশিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান কেল্লার দক্ষিণতোরণ-দ্বারের সম্মুখে মুর্শিদকুলীখাঁর 'বৈকুণ্ঠ' নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় একটি গর্ত্ত; সেই গর্ত্তে মানুষের কোমর পরিমিত জল,—জল মল-কর্দ্দম-পরিপূর্ণ। তাহাতে এমন দুর্গন্ধ যে, তাহার নিকটেও মানুষে দাঁড়াইতে পারে না। সেই নরক বা বৈকুণ্ঠ-হ্রদের চারিদিকে বিস্তৃত জমি পড়িয়াছিল, তারপরে সুউচ্চ প্রাচীর। যখন হতভাগ্য হিন্দু জমিদারগণকে সেখানে লইয়া দুর্দ্দশার একশেষ করা হইত, তখন সেখানে সেই নির্জ্জিত ও অত্যাচারিত জমিদারগণের আত্মীয়-স্বজন বা কর্ম্মচারিগণকে অবাধে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অত্যাচারের চরমসীমা দর্শন করিলে, তাহারা যে প্রকারেই হউক, সত্বরে রাজস্বের টাকা হাজির করিয়া দিতে পারে।

দেওয়ানজির সহিত রঘুরাম ও কল্যাণ সিংহ সেই বৈকুণ্ঠের দ্বারে প্রবিষ্ট হইল। দারোয়ান পরিচয় চাহিলে, দেওয়ানজি আপনাদের পরিচয় দিলেন, দারোয়ান দ্বার ছাড়িয়া দিল।

প্রাচীরাভ্যন্তরে বিস্তৃত চত্বরমধ্যে বৈকুণ্ঠের হ্রদ;—হ্রদ হইতে ত্বক্কার-জনক অতিশয় দুর্গন্ধময় বাষ্প উঠিয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করিয়া দিতেছে। সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা, পশুরও অসাধ্য; কিন্তু সেই পূতিগন্ধপূর্ণ হ্রদমধ্যে বঙ্গের দ্বাদশজন ভূস্বামী কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া

নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছেন,—মল-দুর্গন্ধ-পঙ্ক-জন্য কৃমি-কীট সকল চারি-দিক হইতে জুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের নগ্নদেহ দংশন করিতেছে। সকলেরই হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। মুখ বিকট করিয়া চক্ষু মুদিয়া ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছেন,—এবং দূরে সিপাহীগণ সঙ্গীন উঁচু করিয়া সারি দিয়া বসিয়া আছে।

সেখানে পঁহুছিয়া, সেই দৃশ্য দেখিয়া কল্যাণ সিংহ বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল।

এই সময় একজন সিপাহী বাহির হইতে আসিয়া বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষের হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল।

অধ্যক্ষ লিপি পাঠ করিয়া একজন ভৃত্যকে বলিলেন,—"গোষ্ঠবিহারের রাজাকে তুলিয়া লইয়া আয়।"

ভৃত্য হ্রদের তটে গমন করিয়া বলিল,—"গোষ্ঠবিহারের রাজা কে?"

বৈকুণ্ঠবাসী ভূস্বামিগণের কাহারই প্রায় তখন সংজ্ঞা ছিল না। গোষ্ঠবিহার-রাজার একজন কারাভৃত্য তথায় দাঁড়াইয়াছিল, সে দেখাইয়া দিলে, ভৃত্য তাঁহাকে তুলিয়া আনিল।

বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষ চারিজন সিপাহীর জিম্মায়, নবাগত সিপাহীর সহিত তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

কল্যাণ সিংহ অশ্রুসিক্ত নয়ন দেওয়ানজির বিষণ্ণ মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার বাবাকে কোথায় লইয়া গেল? বোধ করি, নূতন কোন প্রকার কষ্ট দিবে?"

দে। না। তোমাদের মোক্তারের সহিত বোধ হয়, রেজাখাঁর বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, তাই তাঁহাকে এই অত্যাচার হইতে কয়েক দিনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল,—বর্ত্তমানে তাঁহাকে আবার কারাগারে লইয়া গেল।

ক। আপনার অনুমান ভ্রমও ত হইতে পারে? এমনও হইতে পারে

যে, আমাদের মোক্তারের নিকট রেজাখাঁ যাহা চাহিয়াছে, তাহা না পাইয়া অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়া পীড়ন করিবে।

দে। আজ যে অত্যাচার হইবে, তাহা এই স্থানেই সম্পাদিত হইবে। আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহাই ঠিক। তুমি বরং বাসায় গিয়া মোক্তারের নিকট সংবাদ লও।

ক। মোক্তার কি এতক্ষণ ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে?

দে। বোধ হয় আসিয়াছেন। বন্দোবস্ত হইয়া টাকা হস্তগত না করিতে পারিলে, রেজাখাঁ কখনই তোমার পিতাকে বৈকুণ্ঠ হইতে উদ্ধার করে নাই। তাইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তোমাদের মোক্তার এতক্ষণ বাসায় ফিরিতে পারেন।

ক। আপনিও সম্ভবতঃ কিছু টাকা লইয়া আসিয়াছেন,—কৃষ্ণনগরাধিপতির জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই কেন?

দে। হাঁ, সে চেষ্টা আমরা করিয়াছি, কিন্তু ঘুস এবং রাজস্বের হিসাবে কিছু একত্রে দেওয়া আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। রাজস্বও আমাদের অনেক বাকি, টাকাও সঙ্গে অতি অল্প আসিয়াছে।

কল্যাণ সিংহ সে কথার আর কোনও উত্তর প্রদান করিল না। সে, একদৃষ্টে বঙ্গীয় ভূস্বামিগণের নরকযন্ত্রণা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল,—তাহার চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। দেওয়ানজি কল্যাণ সিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যুবক! তোমার পিতাকে ত লইয়া গিয়াছে, তবে আর তুমি এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন? বাসায় যাও।"

কল্যাণ সিংহ সে কথারও কোন উত্তর প্রদান করিল না। সে ভূস্বামিগণের কাতর চীৎকার, যন্ত্রণাময় বিকট মুখভঙ্গী, নয়ন-বিনির্গত বক্ষঃ-বিপ্লাবিত অশ্রুরাশি দর্শন করিয়া, দীর্ণবিদীর্ণ বক্ষঃপঞ্জর চাপিয়া ধরিয়া, কেবলই অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছিল

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কোন কোন ভূস্বামী যন্ত্রণায় অসহ্য পীড়নে অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সেই নরকহ্রদে ঢলিয়া পড়িলেন,—তাঁহাদের মূর্চ্ছিত জ্ঞানবিরহিত দেহের সর্ব্বত্র—নাসিকারন্ধ্রে, কর্ণরন্ধ্রে, মুখ-বিবরে সর্ব্বত্র সেই পূতিগন্ধপূর্ণ নরকরাশি প্রবিষ্ট হইল; যাহারা তখনও কম্পিত-কলেবরে আড়ষ্ট দেহে নরকমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"জাঁহাপনা, আজ আমাদিগকে রক্ষা কর; আমাদিগকে কারাগারে লইয়া চল,—আমরা যে রূপেই পারি, রাজস্ব দিবার বন্দোবস্ত করিব। আর সহ্য হয় না,—ম'লাম—গেলাম! আমাদিগকে রক্ষা কর।"

জাঁহাপনা তখন হয় ত সুরম্য হর্ম্ম্যতলে দুগ্ধফেননিভ সুখ-শয্যার উপরে সুন্দরী বেগমগণের অধর-সুধা লইয়া স্বপ্নহীন নিদ্রায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। আর্ত্তের—অত্যাচারিতের করুণ ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে পঁহুছিল না,—তদীয় কর্ম্মচারী বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষ ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন,—"উহাদিগকে তুলিয়া আন্।"

নিগৃহীত শৃগাল কুকুরের ন্যায় বঙ্গের রাজা, মহারাজা ও জমীদারগণকে ভৃত্যগণ তুলিয়া আনিয়া, সারি দিয়া দাঁড় করাইল। যাহারা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তাহারা আর দাঁড়াইতে পারিল না।

বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষ একগাছি লিক্‌লিকে বেত্র হস্তে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রুগুল্ফ আন্দোলন করিয়া বলিলেন,—"কাফেরগণ! রাজকর না দিয়া রাজত্ব ভোগ করা কি তোদের অতি অপবিত্র হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রেত? নেমকহারামগণ! এত কষ্ট সহ্য করিয়াও বাদসাহের প্রাপ্য রাজকর দিতে তোদের অবহেলা? বল, টাকা মিটাইয়া দিবি কি না?—যদি না দিস্, তবে কুত্তা দিয়া তোদের অপবিত্র দেহ খাওয়ান হবে, তোদের বৌ—ঝি এনে বাজারে বিক্রয় করা হবে, আর জমিদারি কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেওয়া হবে।"

অবশদেহ ভূস্বামিগণের কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা করিয়া কেহ কেহ বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! ইচ্ছা করিয়া আমরা রাজকর দিতে ক্রটী করিতেছি না। দিবার উপায় নাই বলিয়াই দেওয়া হইতেছে না। আর কিছুদিন সময় দিলে, সমস্ত টাকা মিটিতে পারিবে।"

এই সময় কৃষ্ণনগর-রাজের দেওয়ান এবং অন্যান্য ভূস্বামিগণের কর্ম্মচারিগণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষ রক্তচক্ষুতে বলিলেন,—"তোরা কুকুর; তোদের কথার কোনও ঠিক নাই। তোরা যাদের খা'স্, তাদের এত দুর্দ্দশা দেখেও তোরা কোনও উপায় করিস্ না।"

কল্যাণ সিংহও তাঁহাদের সহিত অধ্যক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিল। সকলের কথা কহিবার আগে, সে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া, করযোড় করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ ঈষদুন্নত,—দীর্ঘায়ত নীলপদ্মের মত চক্ষু দুইটি হইতে নীরবে জল ঝরিয়া গণ্ডযুগল বিপ্লাবিত করিতেছিল, পক্কবিম্বের ন্যায় ফুল্ল অধরযুগল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কল্যাণ সিংহ তখন বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত,—অন্তর্জ্ঞানে তন্ময়ভাবে সে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিতেছিল। বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষ একমনে তাহার কথা শুনিতেছিল,—দর্শকগণ, ভূস্বামিগণ তাহার কথা শুনিতেছিল। প্রাণের কথা একমনে ব্যক্ত করিলে, তন্ময় হইয়া কথা বলিলে, তাহাতে আকৃষ্ট না হয়, তাহা একমনে শ্রবণ না করে, এমন কেহ নাই। কথা ত শব্দ-সমষ্টি! শব্দই ব্রহ্ম। কথায় সাপের বিষ বিনষ্ট হয়,—কথায় ব্যাধি আরোগ্য হয়,—কথায় প্রেতজীবন আজ্ঞাবহ দাসের দাস হয়!

কল্যাণ সিংহ বলিতে লাগিল,—"হুজুর! যাঁহাদিগকে আপনার সম্মুখে ক্ষুদ্র পশুর ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহারা বঙ্গের সম্ভ্রান্ত জমীদার।

ইহারা বঙ্গের আদর্শজাতি—ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য। যেরূপে ইহাদের প্রতি পাশব অত্যাচার করা হইতেছে, এরূপ অত্যাচার পশুর উপরে করিলেও তাহারা সহ্য করে না। হয় মরিয়া বাঁচে—নয় বাঁচিয়া মরে! কিন্তু ইহাদের কোন শক্তি নাই,—নামে জমিদার, কাজে দুর্ব্বলের যম। আপনাদের পাদুকা বহনই এখন আমরা আমাদের জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি। আপনারাই আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আমরা ভাবিয়াছি, আমরা যুগযুগান্তর বাঁচিয়া থাকিয়া আপনাদের এই অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ হইব। আর আপনাদের নাগরা জুতা লেহন করিয়া বাঙ্গালী-জীবন ধন্য করিব। সে অবস্থায় কেহ যে, ইচ্ছা করিয়া রাজকর বন্ধ করিয়াছে, তাহা মনেও ভাবিবেন না,—দেশের অবস্থা অতি-শয় মন্দ। জমিদারগণের রাজকর আদায় করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে—দেশের প্রজারা খাইতে পাইতেছে না,—দস্যুগণের জ্বালায় ঘর পাতিয়া বসত করিতে পারিতেছে না। কে খাজনা দেয়! কাজেই আদায় অভাবে জমিদারগণের এই দুর্দ্দশা! আপনারা যদি দয়া করিয়া ক্রমে ক্রমে বাকি রাজস্ব আদায় করেন, জমিদারগণ অবশ্যই তাহা প্রদান করিতে পারিবেন। দয়া করুন,—দেশ রক্ষা করুন। নতুবা বাঙ্গালীর ধন মান প্রাণ সব গেল। বাঙ্গালী জড় হইয়াছে,—আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা তরবারি ধরিয়া বেড়ায়, কেবল বাহার দিতে; জমিদার বলিয়া পরিচয় দেয়, কেবল দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করিতে; পুরুষ বলিয়া অভিমান করে, প্রণয়িনী ভুলাইয়া দাসের জাতি সৃষ্টি করিতে;—কিন্তু আপনারাই আমাদের সব—আপনাদের হাতের আমরা ক্রীড়া-পুতুল। যেমন নাচাইবেন, তেমনি নাচিব; যেমন বলাইবেন, তেমনি বলিব; যেমন খেলাইবেন, তেমনি খেলিব। তোমরা প্রভু, আমরা দাস,—দাসজাতির উপরে দয়া কর। দাসের শরীরও রক্ত মাংসে গঠিত। চাহিয়া দেখ,—এই সকল সুখ সম্পুষ্ট ভদ্রগণের কি দুর্দ্দশা

হইয়াছে। তোমাদের প্রাপ্য তোমরা লও, দুনো করিয়া লও;—কিন্তু বন্দোবস্ত কর। দাসের জাতি যাহাতে দিতে পারে, তাহা করিয়া লও।”

কল্যাণসিংহের কথায় সকলেই মুগ্ধ হইতেছিল। বৈকুণ্ঠের অধ্যক্ষ মহম্মদখাঁ বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ জানিত না,—সকল কথা ভালরূপে বুঝিল না। মোটের উপর যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার প্রাণের কোণে বুঝি একটু করুণারসের উদ্রেক হইল। সে, তাহার সমস্ত দাড়িগুলা বামহস্ত দ্বারা একবার উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—“বালকটি বেশ সুন্দর। ইহার কার্য্যগুলাও বড় মিঠা। কিন্তু বালক! আমিও প্রভুর অধীন। প্রভুর হুকুম মতে আমায় কার্য্য করিতে হইবে। আমি এখনও উহাদিগকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিব।”

একজন ভৃত্য একগাছি বেত্র লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—“হুজুর! ভূস্বামিগণকে মারিয়া ফেলিলে, টাকা আদায় হইবে না। উহাদিগের এখন যে অবস্থা, সামান্য আঘাতেই মরিয়া যাইবে।”

মহম্মদখাঁ বলিলেন,—“টাকা দিবার কড়ার না করিলেই বেত্রদণ্ড দেওয়া হইবে।”

কল্যাণসিংহ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“এই হতভাগ্যগণের কি ত্রিজগতে কেহ নাই? কাহারও কাহারও পুত্রও উপস্থিত আছে, আমি জানি। এখনও কি তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না? আরও কি দেখিবার সাধ আছে! মহম্মদখাঁ কুকুর বলিয়া আমাদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কুকুরেরও অধম। কুকুর আপন প্রভুর অনিষ্টকারীকে প্রাণপণে আক্রমণ করে, প্রভুর বিপদে প্রাণ দিয়া কার্য্য করে,—আর আমরা ভূ-স্বর্গের দেবতা পিতা, জীবনের অন্নদাতা প্রভুর এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। বোধ হয় অত্যাচারের

কঠোর হস্তে ইহাদিগের মৃত-দেহ দর্শন না করিয়া কি আমরা ফিরিব না ?”

ভূস্বামিগণের জ্বলিত শুষ্ক নয়ন দিয়া অনেকখানি জল গড়াইয়া পড়িল। তাঁহাদের কর্ম্মচারী বা আত্মীয় স্বজনগণ আরও অগ্রগামী হইয়া টাকা কড়ার করিতে লাগিলেন।

পনর দিন সময় প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে টাকা পরিশোধ না হইলে, এবার প্রাণান্তকর অত্যাচারের আগুনে জমিদারগণকে পোড়ান হইবে বলিয়া আজ্ঞা প্রচার করা হইল। তারপরে মূর্চ্ছিত ভূস্বামিগণকে গোশকটে এবং চলনক্ষমগণকে পদব্রজে সিপাহীর জিম্মায় পুনরায় কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেদিনকার মত বৈকুণ্ঠ হিন্দু অধিবাসী শূন্য হইয়া উদাস প্রাণে তাহার পূতিগন্ধ বাতাসে বিলাইয়া দিয়া পথিকের প্রাণে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

দর্শক মাত্রেরই উৎসুক দৃষ্টি কল্যাণসিংহের উপরে পড়িল। এত অল্প বয়সে, এমন হৃদয় লইয়া কে আসিয়াছিল ? অনেকে পরিচয় পাইল, অনেকে পাইল না। যাহারা তাহাকে গোষ্ঠবিহার-রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় পাইল, তাহারা ভাবিল, বঙ্গের সকল ভূস্বামীর সকল পুত্রই যদি এমন হইতেন, তবে বুঝি আজি মুসলমানের কঠোর চরণে এমন করিয়া মরিতে হইত না!

কৃষ্ণনগর-রাজের দেওয়ান কল্যাণসিংহকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে বাহির হইলেন। রাজপুত্র রঘুরামও সে সঙ্গে গমন করিলেন।

কল্যাণসিংহের বাসাবাড়ীর নিকটে পঁহুছিয়া দেওয়ান বলিলেন,— “যুবক, বেলা অধিক হইয়াছে, এখন বাসায় যাও। সন্ধ্যার পরে একবার আমাদের বাসায় যাইও। তোমার সহিত কথা আছে।”

কল্যাণসিংহ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালের অস্তগমনোন্মুখ লোহিত সূর্য্যের কিরণ রেজাখাঁর অন্তঃপুরোদ্যানের নীল-সবুজ বৃহৎ বৃক্ষের পত্রকুঞ্জ আশ্রয় করিয়াছিল ; সঞ্চরণশীল মৃদুমারুত সংস্পর্শে পত্রান্তরাল হইতে দুই একটি কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত হইতেছিল,—দুই একটি পক্ষী উদ্যানের সুখ-সমীরণ সেবনার্থে বৃক্ষনীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, পাপিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমগণের নয়ন-বিমোহন রূপ দেখিয়া 'চোক গেল' বলিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, কোকিলের কাকলী আর তেমন গ্রামোচ্চ মধুর নাই ; বর্ষা আগতপ্রায়, ভেকেরা এখন বক্তা হইবে ভাবিয়া কোকিল নীরব হইয়া উঠিতেছে।

উদ্যানের পুষ্পবীথিকা-পার্শ্বে মাধবীকুঞ্জ। মাধবীকুঞ্জের তলে রূমের শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত বেদী। সেই বেদীর উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর দৌহিত্রী নেফিসা বেগম ফুলভূষণে ভূষিতা হইয়া অবস্থিত। বেহেস্তের পরীর ন্যায় দুই জন কৃষ্ণনয়না সুন্দরী যুবতী বাঁদী ফিরোজা রঙ্গের ওড়নায় শরীর আবৃত করিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। এমন সময় তথায় আর একটি রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীর হস্তে একছড়া বিচিত্র

পুষ্পমাল্য। পুষ্পমাল্য ছড়াটি নেফিসা বেগমের পদপ্রান্তে রাখিয়া রমণী করযোড়ে বলিল,—"বেগম সাহেব! মালা ছড়াটি দেখুন। বাঁদী হুকুম তামিল করিতে পারিয়াছে কি না, দেখিলে বাধিত হইব।"

নেফিসা বেগম তাঁহার কম-বপু ঈষদুত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে মালা ছড়াটি গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ তাহা অবলোকন করিয়া বলিলেন,—"ফুলওয়ালী! এই ফুলের মালার মত কি পুরুষ মানুষ মনোহর হয় না?"

ফুলওয়ালী করযোড়ে বলিল,—"বেগম সাহেব! আপনার স্বামী কি ঐ ফুলের মালার মত সুন্দর নন?"

নেফিসা বেগম আবেশতরল দৃষ্টিতে ফুলওয়ালীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার স্বামী? হাঁ, আমার স্বামী সুন্দর বটে; এই ফুলের মালার মত কোমল নহেন। এই ফুলের মালার মত সুরভিও নহেন।"

ফু। বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন;—সে বুঝি বাদসা-নবাব নামদারগণ হইতে জানেন না। যাঁরা বিষয় আর আস্‌রকিতে মত্ত, তাঁরা বুঝি প্রেম আর সোহাগের কিছু জানেন না।

নে। তোর ভুল, ফুলওয়ালী। আমার স্বামী আমার নিকটে যেমন, ফতেমার নিকট তেমন নয়। জগতে সুন্দর রূপ নয়,—সুন্দর কি তা জানিস্?

ফু। ফুলের বাহারই আজীবন দেখিয়া আসিয়াছি, আরত কিছু বুঝি না।

নে। রূপ দেহে নাই—রূপ প্রেমে। যার উপর যার প্রেম আছে, তার উপরেই সে জগতের সৌন্দর্য্য দেখে।

ফু। কিন্তু অন্য লোককে যে অন্য লোকে সুন্দর দেখে?

নে। সেটা সাধারণ সৌন্দর্য্য,—আমার স্বামীকে আমিও তেমন

দেখিয়া থাকি। কিন্তু যে রূপ দেখিলে মানুষ আর কিছু দেখিতে চায় না, সে রূপ প্রেম ভিন্ন হয় না ?

ফু। কৈ, জীবনে তেমন রূপত কখনও দেখি নাই। মিন্‌ষে যখন ছিল, তখন তাকে ভাল বাসতাম বৈকি ; কিন্তু আর যে পাঁচ জনকে দেখতে ইচ্ছা করতো না, তাত নয় !

নে। তেমন ভালবাস্‌তিস্‌ না, তাই দেখিতে ইচ্ছা করিত।

ফু। বাঁদীর গোস্তাকি মাফ করেনত একটা কথা বলি।

নে। কি বল্‌ ?

ফু। আপনি কি এখনও সেরূপ ভাল কাহাকেও বাসিয়াছেন ?

নে। না।

ফু। কেন ?

নে। সেরূপ লোক পাই নাই।

ফু। পাইলে ?

নে। তা হ'লে বাসি।

ফু। সে লোক কেমন চাই ?

নে। কেন, আমদানী করিবে নাকি ?

ফু। সেত বাঁদীর বাগানের ফুল নয়।

নে। তা হ'লেত গলায় পরিতাম।

ফু। আমিও কৃতার্থ হ'তাম।

নে। ফুলওয়ালী !

ফু। বেগম সাহেব !

নে। তুই হিন্দু ?

ফু। বাঁদী হিন্দু, তাত আপনি অনেক দিন হইতেই জানেন।

নে। তা জানি।

ফু। তবে নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?

নে। ফুলওয়ালী! তোদের হিন্দু রমণী ভালবাসিতে জানে ?

ফু। আমি কাঙ্গালিনী,—ভালবাসার কি খবর রাখি; আপনারা বড় লোক,—আপনারাই ও সব জানেন।

নে। হিন্দুদের মধ্যে কি বড় লোক নাই ?

ফু। তা আছে বৈকি,—তারা হয়ত ভালবাসাও জানে।

নে। আমার বিশ্বাস, হিন্দু রমণীতে ভালবাসিতে জানে না।

ফু। তা হইতে পারে। কিন্তু সে বিশ্বাস কিসে হইল, বাঁদী শুনিতে পাবে কি ?

নে। হিন্দুর মেয়ের প্রাণ স্বাধীন নয়,—বাপ-মায় যাকে ধ'রে দেয়, তাকেই ভালবাসিতে হয়।

ফু। আপনাদেরও ত তাই। এই আপনার বাপ-মা মহম্মদ রেজা খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে সাদি ক'রে দিয়েছেন, আপনি তাঁহার বেগম হয়েছেন।

নে। তা হয়েছি বটে, তবে আমরা ইচ্ছা করিলে তালাক দিয়ে আবার আর একজনকে ভজনা করিতে পারি।

ফু। হিন্দুর মেয়েরা বলে, ঐ জন্যই মুসলমানের মেয়েরা ভালবাসতে পারে না। একান্তে একজনকে সারা জীবন ধ্যান করিতে না পারিলে, প্রাণ তন্ময় হয় না।

নে। ভুলরে, তোর হিন্দুদের উহা ভুল। ভালবাসা আপনার সুখের জন্য,—পরের ভাবনায় জন্য নহে।

ফু। আর হিন্দুর মেয়েরা বলে, ভালবাসা আপনার সুখ জলাঞ্জলি দিবার জন্য।

নে। তোদের হিন্দুর মেয়েরা আগুনে পুড়িয়া খাক হয়,—তারা নাকি বলে, ওতেও ভালবাসা আছে। ছি ছি! ঐ কি ভালবাসা! মরিলে মনুষ্যের কি হয়, কেহ জানে না। সুখ চাই;—বাঞ্ছিতের আদর রমণী জীবনের সুখ।

ফু। যার যেমন রুচি বেগম সাহেব, সে তেমনই চায়।

নে। চাহিলে মিলে কৈ ?

ফু। চাহিতে চাহিতে মিলিয়া যায়,—লোকের মুখে ঐ রূপই শুনিয়া থাকি।

নে। ভুলরে, ফুলওয়ালী, ও কথা ভুল। যৌবনত চিরদিন আশা-পথ চাহিয়া থাকে না,—চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইলাম, পাইলাম কৈ ?

ফু। কেন বেগম সাহেব ! খাঁ বাহাদুর কি তোমার মনের মত নহেন ?

নে। আবার ঐ কথা ! আমি চাই আদর, সোহাগ। আমি চাই অভিমানে সাধা সাধি। আমি প্রেমের ভরে লতার মত দুলিব, —সে গাছের মত আমার প্রেম-কম্পিত মস্তক তাহার বাহুতে ধরিয়া রাখিবে। তাহার দেহ এই কুসুমের মালার মত কোমল হইবে,— এই কুসুমের হৃদয়ের মত তার হৃদয় সুগন্ধে পূর্ণ হইবে। আজীবন চাহিলাম,—পাইলাম না। ফুলওয়ালী ! আমার এ রূপ, এ ভরা যৌবন বৃথায় গেল।

ফু। আপনারা হিন্দুকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু হিন্দুর মধ্যে এমন পুরুষ আছে।

নে। আছে ?

ফু। আছে বৈকি।

নে। আমায় দেখাইতে পারিস্ ?

ফু। পারি, কিন্তু ভয় হয়।

নে। কিসের ভয় ?

ফু। কিসের ভয় বেগম সাহেব ? এ কাহার অন্দর ? মহম্মদ রেজাখাঁ সাক্ষাৎ যমের অবতার।

নে। ঠিক ব'লেছিস্, ফুলওয়ালী ! রেজাখাঁ সাক্ষাৎ যমের অবতার,— সংহার করিতে খুব মজবুত। কিন্তু আমি তাঁহার যমের যম। তিনি

আমায় ভালবাসেন না, তবে ভয় করেন। আমারই নানার কৃপায় তিনি প্রতিষ্ঠাবান্।

ফু। কিন্তু যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে বলিতেছেন, সে কাজে দরিদ্রেও তাহার পত্নীকে কঠোর সাজা দিয়া থাকে।

নে। জানিতে না পারিলে কি করে?

ফু। যাহার সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছে, সে যদি তাহা জানিতে না পারে, তবে তাহার কিছুই চুরি যায় নাই।

নে। একবার আমায় দেখাইবি?

ফু। আপনি যদি কোন প্রকারে গোলাপবাগের বাড়ীতে গিয়া, গোসল-খানার ছাতে উঠিতে পারেন, আমি তাহাকে লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে পারিব—আপনি স্বচ্ছন্দে দেখিতে পারেন।

নে। তাই হবে। তার বয়স কত ফুলওয়ালী?

ফু। বয়স?—বয়স বোধ হয় সতর আঠার হইতে পারে।

নে। আমার একবয়সি? দেখিতে কেমন?

ফু। কি দিয়া বুঝাইব? ঠিক আমার ঐ ফুলের মালার মত সুন্দর। আমি যে এই বুড়া হইয়াছি, তাহাকে দেখিয়া আবার আমার যুবা হইতে সাধ যায়। সমস্ত সহরে তার মত রূপবান্ আর দেখি নাই। যেন মাখমের দলা।

নে। সে কে?

ফু। গোষ্ঠবিহারের রাজপুত্র।

নে। এখানে কেন আসিয়াছে?

ফু। তার বাপ বাকি রাজস্বের দায়ে রেজাখাঁ বাহাদুরের জেলে বন্দী হইয়া আছেন।

নে। তার রং কেমন?

ফু। বসরাই গোলাপের মত।

নে। চোখ কেমন ?

ফু। নীলপদ্মের মত।

নে। হাসি কেমন ?

ফু। পূর্ণিমার তরল অথচ গম্ভীর জ্যোৎস্নার মত।

নে। কথার সুর কেমন মিষ্ট ?

ফু। দূরাগত বংশীধ্বনির মত।

নে। আমাকে একবার দেখাবি ?

ফু। বলিলাম ত, আপনি যদি গোলাপবাগের গোসল-খানার ছাতে উঠিতে পারেন, আমি রাস্তা দিয়া লইয়া যাইব,—আপনি দেখিবেন।

নে। কবে যাবি ?

ফু। যে দিন আপনার হুকুম হবে।

নে। তবে কা'লই বৈকালে।

ফু। তাই হবে।

নে। তোর সঙ্গে তার আসনাই আছে না কি ?

ফু। আমার সঙ্গে আসনাই! চাঁদের সঙ্গে বুড় গুব্‌রে পোকার সম্বন্ধ কি ?

নে। তবে তোর কথা শুনিয়া সে আসিবে কেন ?

ফু। আমি তিনচারি দিন তাকে ভাল ভাল ফুলের মালা দিয়ে এসেছি,—তাতেই তার স্বভাবের পরিচয় জানতে পেরেছি। তার স্বভাব কামিনী ফুলের মত কোমল। কাহারও অনুরোধ সে পদদলিত করে না।

নে। ফুলের মালা নিয়ে সে কি করে ফুলওয়ালী ? তার কি কোন প্রণয়িনী এখানে আছে ?

ফু। বোধ হয় না।

নে। তবে ফুলের মালা কার গলায় পরায় ?

ফু। সে তা দিয়ে শিবপূজা করে।

নে। ঐগুলো তোদের হিন্দুদের বড় বোকামি। যা দিয়ে ভালবাসার মনোরঞ্জন করিতে হয়, যার গন্ধে প্রাণের কাণে ভালবাসার বাঁশীর আওয়াজ লাগিয়া থাকে, তাই নাকি কাদার ঢেলা, পাথরের পুতুলের গলায় পরিয়ে দেয়!

ফু। বোধ হয় তেমন ভালবাসার পাত্র পায় না বলিয়াই হিন্দু অমন করে।

নে। ঠিক বলেছিস্ ফুলওয়ালি; তোর কথা শুনিয়া আমার বড় প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু অনেক আহাম্মক হিন্দু অন্য রকম অর্থ করে।

ফু। সে অর্থে আর আমার অর্থে বড় প্রভেদ নাই। তা যাক্,—আমি তবে এখন বিদায় হই।

নেফিসা বেগম সম্পূর্ণ ভাবে উঠিয়া বসিল। চরণ-সেবা-নিরতা বাঁদীদ্বয় সরিয়া বসিল। নেফিসা ডাকিল,—"বাঁদী!"

একজন বাঁদী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল। নেফিসা বলিল,—"সিরাজি আন্।"

বাঁদী পুনরায় কুর্ণিস্ করিয়া বলিল,—"সিরাজির পাত্র সঙ্গে আসে নাই। গৃহে গিয়া পান করিলে ভাল হয়।"

"তবে তাই চল্।" বলিয়া নেফিসা উঠিল। বাঁদীদ্বয় তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। ফুলওয়ালী অন্য পথ গমনে উদ্যতা হইতেছিল, কিন্তু নেফিসা যাইতে দিল না। বলিল,—"একটু সিরাজি খেয়ে মনটাকে একটু চাঙ্গা ক'রে নিয়ে যাবি।"

ফুলওয়ালী তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল।

মহম্মদ রেজাখাঁর অন্তঃপুর-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশোভায় শোভমান সর্ব্বরত্নালঙ্কারে বিভূষিত প্রকোষ্ঠ নেফিসা বেগমের।

মরকত-খচিত সুরম্যহর্ম্ম্যতলে বৈকালের অর্দ্ধস্ফুটিত পুষ্পশয্যা আস্তৃত, চারিদিকে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের গাত্রে ফুলের ব্যজনী, ফুলের ছবি,

ফুলের মালা লম্বমান। ফুলওয়ালীর ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী নেফিসা বেগম সেই ফুলশয্যার উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল,—তাহার পূর্ব্ব-বিলম্বিত কালভুজঙ্গিনী তুল্য বেণী একবার দুলিয়া উঠিল। আকর্ণ বিশ্রান্ত সুরমা-রঞ্জিত চক্ষুর কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া নেফিসা ডাকিল—"বাঁদী!"

বাঁদী সম্মুখে দাঁড়াইল। নেফিসা বলিল,—"সিরাজি কৈ?"

বাঁদী স্বর্ণপাত্রে সিরাজি লইয়া হাজির হইল। পূর্ণপাত্র সিরাজি হস্তে লইয়া নেফিসা বলিল,—"ফুলওয়ালীকে এক পিয়ালা দে।"

ফুলওয়ালী নেফিসা বেগমের পুষ্পশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিল বাঁদী তাহার হস্তে সিরাজি দিল। ফুলওয়ালী তাহা এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিল।

পুনরায় নেফিসা সিরাজি লইয়া পান করিল,—ফুলওয়ালীও খাইল। নেফিসার দীর্ঘ নয়ন কুঞ্চিত হইয়া আসিল, রক্তফুল্ল অধর আরও ফুলিয়া উঠিল। গোলাপী গণ্ড লোহিত হইল। নেফিসা ডাকিল,—"বাঁদী!"

বাঁদী হাজির ছিল, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নেফিসা বলিল,—"এক দল নাচওয়ালী ডাকিয়া দে।"

বাঁদী ছুটিয়া বাহির হইল, এবং অল্পক্ষণমধ্যেই চারিজন সুন্দরী যুবতীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

আজ্ঞামাত্র একজন যুবতী একটা সারেঙ্গের তার টানিয়া লইল, অপরা বাঁয়া তবলার সুর ঠুকিল। অপর দুইজন গান ধরিল।

তাহারা বড় সুন্দর গাছে। গান গাহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাহাদিগের ব্যবসায়। নবাব, বাদসা এবং ওমরাহগণের বাড়ীতে বাড়ীতে তখন বেগম সাহেবগণের তুষ্ট্যর্থ এইরূপ অন্তঃপুর-গায়িকাগণ বেতন-ভোগিনী হইয়া বসতি করিত।

গৃহ-সজ্জিত কুসুমরাশি হইতে সুবাস-সুরভি উঠিয়া চতুর্দ্দিক আমো-

দিত করিতেছিল, বেগম সাহেবের মদিরা আঁখির বিলোল কটাক্ষ স্তব্ধ গৃহের শূন্য বক্ষে আপতিত হইতেছিল,—আর সুন্দরী গায়িকাগণের গানের সুর, কথার ভাব মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

তাহারা প্রথমে গাহিল,—

আজি গুলসন্‌মে মেরা
গুলচেহারা আয়া নেহি।

কাগা তু চল্ যা না,
চলন্ মে হ্যায় একেলা
জল্‌দি লাও উস্‌কো বোলা;
দিল্‌কো পিয়া আয়া নেহি।

সিসামে হ্যায় সরাপ,
ধরি হ্যায় সরি কাবাব
সব কো সব হোতা খারাপ,
পিয়া বিনু জিয়া নেহি।

গান সমাপ্ত হইলে নেফিসাবেগম কামধনুর ন্যায় ভ্রূ দুইখানি কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"ওছাই পুরাণ গান ভাল লাগে না!"

গায়িকা করযোড় করিয়া বলিল,—"তবে কি গাহিব?"

আবেশ তরল নেত্রের কুঞ্চিত দৃষ্টিতে গায়িকার মুখের দিকে চাহিয়া নেফিসা বলিল,—"একটা বাঙ্গালা গাও।"

ফুলওয়ালী মৃদু হাসিয়া বক্র দৃষ্টিতে বেগমসাহেবার মুখের দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া বলিল,—"বাঙ্গালার উপরে হঠাৎ এত অনুগ্রহ কেন বেগমসাহেব?"

নেফিসা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া বলিল,—"বাঙ্গালী মেরা জান।"

ফু। না দেখতেই।

নে। হৃদয়-দর্পণে দেখিয়াছি,—সেই আমার হৃদয়-চোর।

ফু। চাপিয়া যাও বেগমসাহেব।

নে। চাপাচাপি বুঝি না, মনের মত হইলে খসম করিয়া লইব।

ফু। কি সর্ব্বনাশ! জাতি ত্যাগে সম্মত হইবে?

নে। মুর্শিদকুলীখাঁর দৌহিত্রীর নিকট অসম্মত হইবে? জানের ভয় করে না কি?

ফু। জান কবুল করাইয়া ভালবাসাইবে? উহার নাম কি প্রেম?

নে। তুই গরীব মানুষ,—আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিবি কেন?

ফু। তা বৈকি—তা বৈকি, আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিব কেন? তবে সেই বেচারার ভাবনা ভাবতে হয়! কেনই বা তার নাম কর্‌লাম।

নে। নেমকহারাম মাগীকে শূলে দিব।

ফু। বড়র পিরীতি এমনই বটে।

নে। সামলে থাকিস্,—গরীবলোক বড়লোকের হুকুমবরদার—বড়লোকের সুখের সামগ্রী যোগাড় করিয়া দিবার জন্যই খোদাতালা গরীবলোকের পয়দা করিয়াছেন। আমি যা হুকুম করিব, তাই তামিল কর্‌বি। বাঁদী!

বাঁদী সম্মুখে হাজির হইল। নেফিসা বলিল,—"আর এক পিয়ালা সিরাজি দে।"

বাঁদী পুনরায় সিরাজি আনিয়া দিল। নেফিসা তাহা পান করিয়া বলিল,—"ফুলওয়ালীকে দে।"

ফুলওয়ালী বলিল,—"বেগমসাহেব! আমি গরীব মানুষ, আর খাইতে পারিব না। পথ দিয়া আমায় হাঁটিয়া যাইতে হইবে, বে-এক্তার হইলে পাহারাওয়ালায় ধরিয়া গারদে লইয়া যাইবে।"

দর্পিতা সিংহীর মত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া নেফিসা বলিল,—"নেফিসা বেগমের ফুলওয়ালীকে পাকড়া করে, এমন লোক মুর্শিদাবাদে কে আছে? বাঁদী! ফুলওয়ালীকে আমার পাঞ্জা আনিয়া দে।"

বাদী, মুর্শিদকুলিখাঁর নামাঙ্কিত পাঞ্জা আনিয়া ফুলওয়ালীর হস্তে প্রদান করিল। নেফিসা বলিল,—"এ পাঞ্জার বলে কি হয়, জানিস্ ফুলওয়ালী?"

ফুলওয়ালী সেলাম করিয়া বলিল,—"আমি বাঁদী। আমি অত জানিব কি প্রকারে?"

নে। এই পাঞ্জার বলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারে। এই পাঞ্জা যে কোন রাজকর্ম্মচারীকে দেখাইয়া তাহাকে যাহা করিতে বলিবে, সে তদ্দণ্ডেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহাই সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইবে।

ফু। ইহা হাতে থাকিলে পাহারাওয়ালারা আমায় ধরিবে না ত?

নে। না;—পাহারাওয়ালা কি, অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকেও এই পাঞ্জা দেখাইয়া যাহা করিতে বলিবে, সে তাহাই করিবে।

ফু। এ পাঞ্জা এখন কি হইবে?

নে। তোর নিকট রাখ্। ফুলওয়ালী!—আমার গলার এই রত্নহার বখ্‌সিস্ নিবি?

ফু। বাঁদী বখ্‌সিসের আশা কবে না করে?

নে। আমায় একবার এনে দেখাতে পারিস্?

ফু। সেত আমার বাক্সেপুরা রত্ন নহে।

নে। যত্ন পেলে রত্ন আহরণ করিতে পারিস্,—তুই যা। সবে সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে। আ'জ যদি তাকে এখানে আন্‌তে পারিস্,—আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তাহ'লে আমি তোকে এই রত্নহার বখ্‌-সিস্ দেব—আর চিরদিন কেনা হয়ে রব।

ফু। যদি সে না আসে?

নে। তবে তোর বাহাদুরি কি ?

ফু। যদি আসতে বাধা পাই ?

নে। পাঞ্জা দেখাইলে যমেও দ্বার ছাড়িয়া দিবে।

ফু। যদি না আসে, বাঁদীর অপরাধ লইবেন না।

নে। তোর অপরাধ লইব না, কিন্তু রাত্রি প্রভাতে ছলে বলে কৌশলে সেই অহঙ্কারী যুবকের জান লইব। নেফিসা বেগমের প্রেমের আবাহন অবহেলা করিয়া জানেরখেয়েরে থাকে, এমন লোক বাঙ্গালা মুলুকে কেহ নাই।

ফুলওয়ালী বিদায় হইল। নেফিসা বেগম সেই পুষ্পশয্যার উপরে অৰ্দ্ধশায়িতাবস্থায় শয়ান করিয়া মদিরা আঁখি ঈষচ্চালিত করিয়া বলিল,—"এখানে যে যে আছিস আমাদের কথা শুনেছিস্ ?"

বাঁদীদ্বয় বলিল,—"বেগম সাহেব, আমরা কিছুই শুন নাই।"

নেফিসা আঁখিদ্বয়ের কুঞ্চিত দৃষ্টি নৰ্ত্তকীগণের দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বলিল,—"তোরা ?"

নৰ্ত্তকীগণ সমস্বরে বলিল,—"আমরাও কিছু শুনিতে পাই নাই।"

নেফিসা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তোরা কি কালা ?"

একটি নৰ্ত্তকী কুর্ণিস করিয়া বলিল,—"নবাব-ওমরাহগণের ভবনে বেতনভোগী হইয়া থাকিতে হইলে, কেবল কালা নহে, কাণা ও কালা হইয়া থাকিতে হয় ; আমরা তাহা ভালরূপই জানি।"

নে। তবে একটা বাঙ্গালা গান্ গা।

তাহারা হুকুম তামিল করিল। গাহিল,—

খুঁজতে প্রণয় জগৎ-মাঝে ছুটে ছুটে ধাই,
পুরে না আশা ভালবাসার খোঁজ কোথা না পাই।

বিষাদে-বিরাগে খুঁজেছি প্রণয়
নয়ন-নীরে খুঁজেছি কত ;
হরষ-মথিত হৃদয়ে খুঁজেছি
পাইনি কখনো কণার মত।

প্রভাত-সমীরে সাঁঝের আকাশে
চাঁদের হাসিতে রবির করে,
প্রাণের মাঝারে পরের প্রাণেতে
পাইনি তথাপি ক্ষণিক-তরে !

কোথা পাওয়া যায় প্রণয়, বল না ?
জানি না শুধুই ছুটিয়া ধাই,
জানিনা তথাপি পাইতে বাসনা
কোথা গেলে বল প্রণয় পাই !

থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া ডাকিয়া
কাণে যেন বলে শুনিতে পাই,
নয়নের কোণে থাকে ভালবাসা
একের একটি অপরে নাই !

গীত সমাপ্ত হইলে নেফিসা বেগম বলিল,—"তোরা গান বন্ধ করিয়া এখন চলিয়া যা। প্রয়োজন হইলে আবার ডাকাইব।"

নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল। নেফিসা সেই পুষ্পশয্যার উপরে সটান শয়ন করিয়া মদিরা আখির মুদিত নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি নবকল্পিত সুখময় মূর্ত্তি গঠিয়া লইয়া রসোল্লাস উপভোগ করিতে লাগিল, এবং বাঁদীগণ সেই মেদীরাগ-রঞ্জিত নবনীত-কোমল চরণ যুগলে হস্ত বুলাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কয়দিনের যাতায়াতে কৃষ্ণনগরাধিপতির বাসার সকলের সহিত কল্যাণ সিংহের একটু ঘনিষ্টতা হইয়া গিয়াছে;—আর তাহার স্বভাব-সৌন্দর্য্যে, শাস্ত্রের অভিজ্ঞতাদর্শনে, হৃদয়ের তেজোগর্ব্বভাবে সকলেই তাহাকে একটু ভাল বাসিয়াছে; বিশেষতঃ দেওয়ানজি কল্যাণ সিংহকে সমধিক স্নেহ-ভক্তির নয়নে দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ নগরাধিপতি রাজা রামজীবনের বাকি রাজস্বের জন্য যে প্রকার যন্ত্রনা প্রদান করা হইতেছিল, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া দেওয়ানজি ও রাজপুত্র রঘুরাম অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বাকি রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, তাহা পরিশোধের উপায় সুদূর পরাহত। উৎকোচ দিয়া অত্যাচার নিবারণও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! রেজা খাঁর নিয়ম ছিল, কেবল উৎকোচ প্রদান করিলে তিনি তাহা লইতেন না। বাকি রাজস্বের কিয়দংশ ও প্রচুর উৎকোচ পাইলে, তবে কয়েক দিনের জন্য সেই হতভাগ্যের উপর যমদণ্ডের ব্যবস্থা স্থগিত হইত। অনেক দিন হইতে এইরূপ-প্রকারে টাকা দিয়া আসিয়া সকলেরই রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণনগর রাজেরও তাহাই।

সন্ধ্যার পরে একটা ক্ষীণদীপালোকিত গৃহমধ্যে দেওয়ানজি ও

যুবরাজ রঘুরাম বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। উভয়েই নীরব—কেহ একটি কথাও কহিতে ছিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে অতি সন্তর্পণে, অতিধীরে এক একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িয়া সেই স্তব্ধ গৃহের শূন্য বক্ষে মিশিয়া যাইতেছিল।

ভৃত্য গিয়া সেই সময় সংবাদ দিল, "কল্যাণ সিংহ আসিয়াছেন, দেখা করিতে চাহেন।"

দেওয়ানজি তাহাকে তথায় আসিতে দিতে বলিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই কল্যাণ-সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেওয়ানজি উদাস্‌তরাস্‌ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। কল্যাণ সিংহ, দেওয়ানজি ও রঘুরামের একটু দূরে সম্মুখভাগে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"আজি আপনাদিগকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন ?"

দেওয়ানজি অতি সন্তর্পণে এক ক্ষুদ্র-শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমরা বিমর্ষ কেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তুমি কি জান না, আমরা বিমর্ষ কেন ?"

ক। মহারাজের প্রতি মুসলমানের অত্যাচার স্মরণ করিয়াই কি আপনারা বিমর্ষ ?

রঘুরাম একটু পিছাইয়া বসিয়া বক্রদৃষ্টিতে কল্যাণ সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন;—"বিমর্ষের উহা কারণ বলিয়া কি তোমার মনে হয় না ?"

ক। মনে হয়, কিন্তু পুরুষ মানুষ স্ত্রীলোকের মত বসিয়া বসিয়া ভাবিবে কেন,—ইহা বলিয়াই আমার মনে হয়।

র। ভাবিবে না, তবে কি করিবে।

ক। যাহাদের সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ-দেবতা পিতা, অত্যাচারীর প্রবল

ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত, তাহাদের অকর্ত্তব্য কি আছে; আমি তাহাও বুঝিতে পারি না।

র। কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্যই চিন্তা করিতে হয়। যাহারা অসভ্য—যাহারা বর্ব্বর, তাহারাই কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কেবল গায়ের জোরে কার্য্য করিতে উদ্যত হয়।

ক। আর যাহারা সভ্য—শিক্ষিত, তাহারা কি কেবল অত্যাচারের প্রতিকূলে হাটুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে ?

র। তুমি বোধ হয়, বল্‌বে, বিশাল মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে ?

ক। সকল সময় কেবল নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারে অত্যাচারের স্রোত রুদ্ধ হয় না। অত্যাচার যখন সীমাহারা হইয়া পড়ে, তখন তাহা রোধ করিবার শক্তি এক অস্ত্রবলই ধরিয়া থাকে।

র। কিন্তু মোগলশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাও যা, আর জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়াও তা।

ক। আমাদের বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি ? যাদের পিতা অত্যাচারের কষাঘাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছেন। অত্যাচারীর বেত্রাঘাতে যাহাদের পিতার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরধারা ছুটিতেছে,—অত্যাচারের অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া যাদের পিতা মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতেছেন, তাদের বাঁচিয়া থাকা কিসের জন্য ? কেবল পিতৃ-দেবতার হাহাকার আর নয়নজল দেখিবার জন্যই কি বাঁচিয়া থাকা ? এ বাঁচার চেয়ে মরা ভাল !

র। তুমি আমি মরিলেই কি তাঁহাদের কষ্ট বিদূরিত হইবে ? বরং ঐ অত্যাচারের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে পুত্রশোকে আরও অধীর হইয়া যন্ত্রণার বৃদ্ধি করিবে।

ক। তোমার আমার মত পুত্র মরণে পিতৃ-শোকের উদ্দীপনা হওয়া

অসম্ভব। যে পুত্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাটীর পুতুলের মত পিতার যন্ত্রণা দেখিতে পারে, পিতার প্রতি অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, সে পুত্র-মরণে পিতার অশৌচ গ্রহণও নিষিদ্ধ।

র। কিন্তু মরিলেই কি তাঁহাদের কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে?

ক। নিশ্চয় আছে।

র। কিরূপে উপকার হইবে?

ক। তুমি আমি যদি আমাদের পিতার উপর অত্যাচার দেখিয়া অস্ত্রধারণ করি, তুমি আমি যদি আমাদের সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া অত্যাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হই,—অনেকেই আমাদিগের সহিত যোগদান করিবে। তারপরে, দশ জন অত্যাচারীর প্রাণসংহার করিয়াও যদি আমরা মরিতে পারি,—অত্যাচারীর আসন তাহাতে একটুও বিচলিত হইবে, এবং ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার করিতে হইলে একটু ভাবিয়াও করিবে।

র। কিন্তু আমাদের জীবনটা ত এইরূপেই নষ্ট হইবে!

ক। তুমি নাকি বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ!

র। বীর, বীরত্ব করিবে—মরণের জন্য অস্ত্র ধরিবে না।

ক। যাহাদের পিতাকে সামান্য পদাতিকে শৃঙ্খল পরাইয়া বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করে, তাহাদের বীরত্বের স্থান কোথায়?

র। যাহাদিগের সহিত বলে পারিব না, নিশ্চয়ই জানি,—তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৃথা!

কল্যাণ সিংহ অনেকক্ষণ বক্রদৃষ্টিতে রঘুরামের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার বাহুতে যদি তোমার বাহুর মত বল থাকিত, আমার পিতার যদি তোমার পিতার মত বিস্তৃত জমিদারী ও সৈন্যবল থাকিত,—তবে দেখাইতাম, শূদ্রের দ্বারাও কত মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে!"

র। মোগল আমাদিগের রাজা,—রাজ-বিদ্রোহী হওয়াও মহাপাপ।

ক। তাহা আমি জানি। আমাদের শাস্ত্রে ভূস্বামীকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভূস্বামী বা রাজা, প্রজাকে আপন সন্তান অপেক্ষাও স্নেহের চক্ষে দেখিবেন—ন্যায়ের বিচারে প্রজাকে রক্ষা করিবেন, সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন—যে রাজা তাহা না করেন, তিনি অত্যাচারী—তিনি দস্যু। তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে পাপ হয় না।

র। তোমাকে আমি একটি কথা বলিতে চাহি।

ক। কি বল?

র। তুমি মুসলমান-গহ্বরে আসিয়া বাস করিতেছ, তোমার মনের যেরূপ ভাব, যেখানে সেখানে যেরূপে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বেড়াও, তাহাতে তোমার জীবনের আশা কম।

ক। তা, জানি। কিন্তু আমি বিবেচনা করি—আমাদের বাঁচার চেয়ে মরা ভাল!

র। যদি মরিতে এত সাধ, তবে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই পার।

ক। হয়ত আমার ভাগ্যে তাহাই আছে।

র। আমার বিশ্বাস, মুসলমানের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াই তোমার সে কার্য্য সাধিত হইবে।

ক। সে জন্য আমি চিন্তিত নহি, কিন্তু কি প্রকারে দেশের দুর্দ্দশার নিরাকরণ হইবে, কি প্রকারে আমাদের বঙ্গের ভূস্বামিগণ অত্যাচারের অগ্নি-দাহ হইতে ত্রাণ পাইবেন, তাহাই আমার চিন্তার বিষয়। দেশের মধ্যে যাহারা ক্ষমতা-পন্ন, যাহারা বীর বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহারা সকলেই নিশ্চেষ্ট—জড়ের ন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতেছে! এখন উপায় কি?

র। উপায় এই যে, আমার বিবেচনায় কয়েকজনে মিলিয়া একবার

দিল্লি গিয়া বাদসাহের নিকটে এই অত্যাচারের কথা জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়া দেখিলে হয়।

ক। ভুল! সে পরামর্শ ভুলের শূন্য কল্পনা। দিল্লির বাদসাহ বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজস্ব প্রাপ্ত হন নাই,—বহুদিন হইতে বঙ্গদেশের রাজকর বাদসাহের ভাণ্ডারে প্রেরিত হয় নাই,—এখন মূর্শীদ কুলীখাঁ রাশি রাশি রাজকর প্রেরণ করিতেছেন,—সুতরাং তাঁহার আদায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি কখনই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। দেব-হৃদয় হইলে এমন হইতে পারে, কিন্তু মুসলমান এদেশে সুখভোগ করিতে আসিয়াছেন, বিশেষতঃ দিল্লির সিংহাসনে এখন দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত নাই—সুতরাং তোমার পরামর্শে কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

র। তবে কি কেবল অস্ত্রবলেই অত্যাচার রুদ্ধ হইবে?

ক। আমার বিবেচনা তাহাই।

র। ভরসা করি, সে বিবেচনা অধিক খরচ করিবে না। তাহা হইলে কোন্ দিন শুনিতে পাইব যে, তুমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছ।

ক। ভাল, আমি সে চিন্তা পরিহার করিলাম। এক্ষণে পিতৃগণের উদ্ধারের উপায় কি?

র। রেজা খাঁর করুণা।

ক। সে করুণা লাভের উপায় কি?

র। তাহাই চিন্তনীয়।

ক। বঙ্গের ভূস্বামি-গণের গৃহে যে টাকা কড়ি মণি মুক্তা ছিল, তাহা সমস্তই রেজা খাঁর ভাণ্ডারে উঠিয়াছে। বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যত তোষামোদ সঞ্চিত ছিল, সমস্তই তাহার চরণে অর্পিত হইয়াছে,—আরত কোন পুঁজি নাই,—কি দিয়া তাহার করুণা লাভ করা যাইবে।

র। তবে মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট করুণা প্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য।

ক। বাতুলতা।

র। কেন ?

ক। এই যে বঙ্গব্যাপী অত্যাচার, এই যে, দেশব্যাপী হাহাকার, ইহা কি তিনি কিছু জানেন না ? তাঁহার ইঙ্গিত, তাঁহার আদেশ, তাঁহার অনুজ্ঞা না পাইলে কি রেজাখাঁর সাধ্য আছে যে, এমন ভীষণ অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় ?

র। তথাপি একবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ক। ইতিপূর্ব্বে কি সে চেষ্টা কেহ করে নাই ?

বৃদ্ধ দেওয়ান নীরবে বসিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন,—এবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন,—"অধিক দিন নহে, চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে এই অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ ও সমগ্র জমিদারগণের স্বাক্ষর সম্বলিত হইয়া তাঁহার দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল।"

কল্যাণসিংহ দেওয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তাহাতে কি ফল হইয়াছিল ? মুর্শিদকুলী খাঁ সে আবেদনের কি উত্তর দিয়াছিলেন ?"

দে। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—"আপনাদের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের দেওয়ান, তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম না।"

ক। ঠিক উত্তর দিয়াছেন। এর চেয়ে অপদার্থ দরখাস্তের উত্তর আর কি দিয়া থাকে ! যুবরাজ ; দিল্লীগেলেও এইরূপ উত্তর পাইবেন।

যুবরাজ সেকথার আর কোনপ্রকার উত্তর প্রদান করিলেন না। কল্যাণ সিংহ বলিল,—"যুবরাজ ; বঙ্গের ভূস্বামি-গণের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, পিতার কারাকষ্ট স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি—

হৃদয় সর্ব্বদাই উন্মত্ত। এ অবস্থায় যদি কোন কঠোর কথা বলিয়া থাকি, মাপ করিও।”

রঘুরাম কথা না কহিতেই দেওয়ানজি বলিলেন,—“তোমার কথা খাটি সত্য, উহাতে রাগ করিবার কিছুই নাই,—তবে বঙ্গ জড় হইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রাণে আর সজীবতা নাই, সুতরাং এইরূপেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।”

“ভুল, দেওয়ানজি! আপনারও ভুল। এত অত্যাচার পৃথিবী সহ্য করেন না। অত্যাচার সীমাহারা হইলে, পুনরায় তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া মহাশক্তির সৃজন করিয়া থাকে। বঙ্গের সকলেই বীর রঘুরাম নহেন,—এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবশ্যই কোন না কোন বঙ্গবীর দণ্ডায়মান হইবেন!”—এই কথা বলিয়া কল্যাণ সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঘুরাম ক্রোধে অধর দংশন করিয়া পার্শ্বপতিত তরবারি টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেওয়ানজি তাঁহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—“যুবরাজ! ক্ষমা করুন। কল্যাণ-সিংহ বালক মাত্র! বাল-স্বভাব চপলতা এখনও উহার বিদূরিত হয় নাই।”

রঘুরামের বলিষ্ঠ দেহ ক্রোধে কাঁপিতেছিল, কল্যাণ-সিংহ দ্রুতপদে গৃহের বাহির হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া হাঁপ ছাড়িল। তার পরে সে পথ বহিয়া বরাবর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিতেই রমানাথ ঠাকুর তাহাকে সংবাদ দিল যে, “যে ফুলওয়ালী তোমাকে নিত্য নিত্য পুষ্প যোগান দিয়া থাকে সে তোমায় খুঁজিতেছে। অনেকক্ষণ হইল আসিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।”

কল্যাণসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে কোথায়?”

রমানাথ বলিল,—“তোমার ঘরে।”

কল্যাণসিংহ আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিল। গৃহ-দরোজায়

ঠেসান দিয়া ফুলওয়ালী বসিয়া ছিল. সে কল্যাণসিংহকে সমাগত দেখিয়া বলিল,—"তোমার জন্য আমি কতক্ষণ এখানে বসিয়া আছি।"

সম্মুখে একখানা কাষ্ঠাসন পড়িয়াছিল, তাহার উপরে উপবেশন করিয়া কল্যাণ সিংহ বলিল,—"কেন, আমায় খুঁজিতেছ কেন?"

মালিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"তোমার জন্য একছড়া ফুলের মালা সংগ্রহ করিয়াছি; সে মালা চন্দ্র সূর্য্যেও দেখিতে পায় না। তুমি গলায় পরিলে সে মালা ভাল মানাইবে।"

কল্যাণ সিংহ তাহার কথার অর্থ সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারি নাই।"

মালিনী বলিল,—"বুঝিয়াছ, কেবল কথাটা বিস্তৃত ভাবে শুনিবার জন্য বোধ হয়, আবার আমাকে বলিতে বলিতেছ।"

ক। ভাল তাহাই বল।

মা। ভগবান তোমায় যেরূপ দিয়াছেন, সেরূপ রূপ জগতে দুর্ল্লভ।

ক। তা ত বুঝিলাম, তারপর? এরূপের কেহ প্রার্থী আছে নাকি?

মা। আছে।

ক। কে?

মা। যাহাকে চন্দ্র-সূর্য্যও কখনও দেখিতে পায় নাই।

ক। কে সে?

মা। নেফিসা বেগম।

ক। নেফিসা বেগম! কি বলিতেছ? মুর্শিদকুলীখাঁর দৌহিত্রী, রেজাখাঁর স্ত্রী নেফিসা বেগম?

মা। হ্যাঁগো! তোমার কি কপালের জোর কম?

ক। জোর কি দুর্ব্বল কপাল, তাহা জানিব কি প্রকারে! তিনি আমার উপরে আসক্ত হইবেন কেন? কখনও কি আমায় দেখিয়াছেন?

মা। না।

ক। না দেখিয়া প্রেম হয় কি প্রকারে?

মা। কেন, তাকি হয় না? এইত শাস্ত্রে আছে,—কুম্ভকর্ণের নাম শুনিয়াই তার উপরে নখীন্দরের প্রেম হ'য়েছিল, বলরামের বাঁশীর গানে সত্যভামা মূর্চ্ছিত হ'য়েছিল—সে সকল কি তুমি জান না?

মালিনী শাস্ত্রজ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শিতা বুঝিয়া মনে মনে হাসিল। কিন্তু বাহিরে সে ভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া 'ব্যাপার কত দূর' বুঝিবার জন্য বলিলেন,—"হাঁ, তা হয় বৈ কি! কিন্তু তিনি আমার নামই বা জানিলেন কি প্রকারে?"

মা। কেন আমার জিহ্বা কি অচল? আমার নিকটেই তোমার সুন্দর মুখের, সুন্দর দেহের বর্ণনা শুনেছেন।

ক। এখন কি বলেন?

মা। আর তস্ সয় না। এখনই চাই।

ক। ওমা সে কি! কোথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা?

মা। কেন, তাঁর অন্দরে।

ক। সেখানে যাইবার উপায় কি?

মা। যাইবার উপায়? যাইবার উপায় এই পাঞ্জা। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে এই পাঞ্জা দিয়েছেন।

ক। পাঞ্জা দেখি।

মালিনী পাঞ্জা খানি কল্যাণসিংহের হস্তে প্রদান করিল। গৃহ-বিলম্বিত আলোকের সাহায্যে কল্যাণসিংহ দেখিল, তাহা পারস্য ভাষা-খোদিত ও মোহরাঙ্কিত বটে। কিন্তু কল্যাণসিংহ পারস্যভাষা না জানায় তাহা পাঠ করিতে পারিল না। বলিল,—"ইহা নকল কি আসল জানিতে হইবে।"

মা। তুমি কি পড়িতে জান না?

ক। না। পার্সি জানি না।

মা। তবে না হয়, আর কাহারও দ্বারা পড়াইয়া শোন। কিন্তু এমন লোককে পড়াইবে যেন একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়—বড় কঠিন সমস্যা।

ক। তা জানি। আমাদের মোক্তারকে দিয়া পড়াইয়া আনিব?

মা। বিশ্বাস হয়ত তাই কর।

কল্যাণসিংহ পাঞ্জা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল, এবং একটা গৃহ-মধ্যে গমন করিয়া মোক্তারকে ডাকিয়া লইয়া তাহাকে পাঞ্জা খানি পড়িয়া দেখিতে বলিল। পাঞ্জা দেখিয়া মোক্তার শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—"ইহা আপনি কোথায় পাইলেন?"

ক। সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি? ওখানি কি নবাবি পাঞ্জা?

মো। আজ্ঞা হাঁ।

ক। উহাতে কি লেখা আছে?

মো। নবাব মুর্শিদকুলির নাম ও মোহর অঙ্কিত আছে,—আর লেখা আছে, "এই পাঞ্জাধারীর আজ্ঞা পালন কর।"

ক। এ পাঞ্জা দেখাইলে, পাঞ্জাধারীর আজ্ঞা পালন করিতে কে কে বাধ্য?

মো। সকলেই।

ক। সকলেই কে কে?

মো। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ ব্যতীত আর সকলেই এই পাঞ্জাধারীর আজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য।

ক। পাঞ্জা দেখাইয়া কেহ যদি রেজা খাঁকে বলে দশহাজার টাকা দাও।

মো। রেজা খাঁও তদ্দণ্ডে তাহা প্রদান করিতে বাধ্য। তবে টাকা লইয়া ঐ লোক কি করে, কোথায় যায়, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি পশ্চাতে লোক নিযুক্ত করিতে পারেন।

ক। এই পাঞ্জা লইয়া যাহাকে যে আজ্ঞা করা যায়. সে তাহাই শুনে?

মো। তদ্দণ্ডেই।

ক। আমার নিকট এই পাঞ্জা আপনি দেখিয়াছেন, ইহা যেন কোথাও প্রকাশ না হয়।

মো। প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না। কিন্তু অধীনের এক নিবেদন।

ক। কি?

মো। এই পাঞ্জা, যেমন শুভ ফল প্রদানে সক্ষম, আবার বিবাদ ডাকিয়া আনিতেও তদ্রূপ মজবুত। ভরসা করি, বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

কল্যাণসিংহ বুড়ার কথার মর্ম্ম বুঝিয়া মৃদু হাস্য করিলেন, সে কথার আর কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তারপরে, পাঞ্জা লইয়া যে গৃহের দাবায় মালিনী বসিয়া ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

মালিনী বলিল,—"কি শুনিলেন?"

ক। শুনিলাম, সত্যই ইহা নবাবি-পাঞ্জা।

মা। এক্ষণে দাসীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে।

ক। কি অভিলাষ?

মা। দাসীর সহিত যাইতে হইবে।

ক। কোথায়?

মা। যে চাহে, তাহার কাছে।

ক। ভাল, এই পাঞ্জার সাহায্যে না হয়, গমন করিলাম,—ছদ্মবেশে পাঞ্জা দেখাইয়া না হয় অন্দরেই ঢুকিলাম, কিন্তু বেগম-সাহেবার গৃহে যদি তখন রেজা খাঁ আগমন করেন?

মা। সে ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। সে ভাবনার অন্ত যে করিতে পারে, সেই করিবে। তুমি চল।

ক। আজিই?

মা। আজিই।

ক। আমাকে এক দিন ভাবিবার অবসর দাও।

মা। তোমার পায়ে ধরি, আজি একবার চল। নতুবা আমার জান থাকিবে না।

ক। গেলে আমার জান থাকিবে কি না, সেটা ভাবিতে দিবে না? তোমার জান রক্ষার জন্য ত আমার জান দিতে পারি না!

মা। তোমার কোন ভয় নাই,—তুমি আমার সঙ্গে চল।

কল্যাণসিংহ কি ভাবিল। ভাবনা অনেকক্ষণ ধরিয়া;—সে, এক মনে চিন্তা করিতেছিল। মনে মনে ভাবিতেছিল,—আমি স্ত্রীলোক, যদিই ধরা পড়ি, তখন স্ববেশ দর্শন করিলে আমাকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দিবে। এই পাঞ্জা খানি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা সংগ্রহার্থ যদি আমাকে বিপদেও পড়িতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। আজি হাতে পাইয়া যদি আর না দেই, কল্য প্রভাতেই আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে। আর যাতায়াত করিয়া কৌশলে যদি পাঞ্জা খানি সংগ্রহ করিতে পারি, ইহাদ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব। হয়ত ইহাদ্বারা পিতাকেও উদ্ধার করিয়া লইতে পারিব। সে, চিন্তা করিয়া স্থির করিল, মালিনীর সহিত রেজাখাঁর অন্দরমহলে গমন করিবে এবং নেফিসা বেগমকে ভুলাইয়া পাঞ্জাখানি সংগ্রহ করিয়া উহাদ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবে। সে মালিনীকে বলিল,—"আমি যাইব, কিন্তু সকল ভার তোমার উপর।"

মালিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"যার ভার, সেই বুক পাতিয়া লইবে, আমি নিমিত্ত মাত্র।"

ক। তোমার নিকটে আমার রূপবর্ণনা শুনিয়া বেগম আমার অনুরাগী হইয়াছেন, কিন্তু যদি আমাকে দেখিয়া তাঁহার পসন্দ না হয়?

মা। আমি কি তোমার ঐ সুন্দর চেহারার বর্ণনা করিতে পারি? দেখিতে তুমি যেমন, বর্ণনায় কি তেমন হয়? তোমাকে দেখিলে

মুনির মন টলিয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, কালনেমিকে দেখে, গোপীরা সব আকুল হয়ে দক্ষযজ্ঞে প্রাণ পরিত্যাগ করেছিল,—তোমাকে দেখ্‌লেও সবার সেইরূপ দশা হয়।

ক। শাস্ত্রজ্ঞান তোমার খুব; কোন্ অধ্যাপকের নিকট পড়া শুনা করা হয়েছিল?

মা। ওমা; পড়া শুনা কি আমরা কর্‌তে পেরেছি। তবে এক ভট্-চার্য্যির সঙ্গে আমার আস্‌নাই ছিল, তিনিই আমাকে ওসব শিখিয়েছেন।

ক। তা খুব ভালই শিখিয়েছেন। ফুলবেচা ছেড়ে দিয়ে তুমি কথক ঠাকুর হলেও অনেক রোজগার করিতে পার।

মা। কতক ঠাকুর কেন,—পুরো ঠাকুরই হতে পারি। তবে কি জান, ফুলবেচায় একটু আমোদ আছে। কত বিরহিণী নারীর দীর্ঘশ্বাস, কত মিলনের মধুর গান, কত গোপনের মৃদু-চুম্বন দেখে শুনে তৃপ্ত হওয়া যায়।

ক। আচ্ছা বেগম সাহেবার কাছে আর কোন দিন কোন নাগর লইয়া গিয়াছ?

মা। কখনও না। আহা, তার বয়সই বা কত! ষোল সতরর উপর নহে।

ক। এর মধ্যে কি আর দুই একটি নাগর জুটে নাই?

মা। না না, কখনও না। আমি তাকে বিশেষ ক'রে জানি সে কাব্যি রস, আর ফুলের বাস নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌তো।

কল্যাণসিংহ মনে মনে ভাবিল, আকাঙ্ক্ষার আগুন এই হতভাগিনী-দের বাতাসে কেবল দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—এখনও নিবাইলে নিবাইতে পারা যাইতে পারিবে।

তারপরে মালিনীর সহিত রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। একটা চাদরে কল্যাণসিংহের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ-পুঞ্জের মধ্যে—বীচিবিক্ষোভ-চঞ্চলা ভাগীরথীর কূলপ্রান্তে নিদাঘ-নিশীথের নীলাম্বরতলে, শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত মহম্মদ রেজাখাঁর সর্ব্বশোভাময় বিরাট ভবন শোভা পাইতেছিল। প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে প্রহরী,—বড় বড় সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া প্রহরণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। রাত্রি প্রায় দ্বাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—নবাব-বাড়ীর নহবৎখানায় বেহাগের প্রথম করুণ আলাপচারি আরম্ভ হইয়াছে।

পুষ্পসম্ভার ও পুষ্প-সুগন্ধ পরিসেবিত এক সমধিক, শোভাময় হর্ম্ম-তলে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী পুষ্পশয্যার উপরে নিজ দেহ ঢালিয়া দিয়া অর্দ্ধ-মুদিত নেত্রে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল। যুবতীর বক্ষের বসন স্খলিত, মস্তকের কেশ বেনী-রূপ লম্বমান—এবং পরীরূপত সুন্দরী রমণীদ্বয় কর্ত্তৃক পরিসেবিতা।

এই সময় তথায় অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়চকিত পদক্ষেপে দুইটি মনুষ্য যাইয়া উপস্থিত হইল। একজন একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিল, অপর নিকটস্থ হইয়া কুর্ণিস্ করিয়া বলিল,—"বেগমসাহেব; বাঁদী কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া আসিয়াছে।"

নেফিসা বেগম উঠিয়া বসিলেন। তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আঁখি-পাতা যেন মুদিত হইয়া আসিল। কথা কহিতে

গিয়া যেন থামিয়া পড়িতে হইল,—বুকের মধ্যে অতি দ্রুততর স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। মালিনীর মুখের দিকে আবেশ-তরাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিল।

মালিনী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"রত্নহার পুরস্কার দিয়ে, আমার আনা রত্নহার গলায় পর।"

নেফিসা এই প্রথমে পাপাভিযানে যাইতে বসিয়াছে। তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। কি বলিতে হয়, কি করিতে হয়, তাহা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার হৃদয়ে আবেগ, ভয়, উচ্ছাস এ তিনেরই সমাবেশ হইতেছিল, শঙ্কাভিনম্র নয়নে মালিনীর মুখের দিকে চাহিল।

মালিনী বলিল,—"দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাকিয়া লও।"

ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে নেফিসা বলিল,—"তুই ডাকিয়া আন্।"

দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া কল্যাণসিংহ সমস্তই শুনিতে ছিল। আর অপেক্ষা না করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

গৃহপ্রবেশ করতঃ গাত্রাচ্ছাদিত রেশমী বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কল্যাণসিংহ একখানা আস্তৃত শয্যায় উপবেশন করিল। গৃহাস্থিত উজ্জ্বল আলোকে সঙ্কুচিত নয়নের বাসনাদিগ্ধ নয়নে নেফিসা বেগম চাহিয়া দেখিল,—এমন রূপ বুঝি বেহেস্তাতেও নাই। এমন দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য বুঝি যার তার ভাগ্যে ঘটে না! এ রূপ লইয়া ডুবিয়া না মরিলে বুঝি নারীজন্ম ব্যর্থ হয়, অথবা অতুল ধন-সম্পত্তির সম্ভ্রম-গৌরবের অধিকারিণী বেগমগণের এমন রূপ উপভোগ করাই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা। সে, আকর্ণ-বিশ্রান্ত সুরমারঞ্জিত দীর্ঘ নয়ন-পল্লব নত করিল।

মালিনী বলিল,—"বেগমসাহেবা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন বাঁদীর বখ্‌সিস্?"

নেফিসা তদ্দণ্ডে নিজ কণ্ঠ হইতে রত্নহার উন্মোচন পূর্ব্বক বাঁদীর হস্তে দিয়া মালিনীকে দিতে আজ্ঞা করিলেন।

মালিনী রত্নহার কণ্ঠে পড়িয়া বলিল,—"রাজকুমার; তোমাদের বড়লোকের গানেই নাকি প্রেমের প্রথম সম্ভাষণ! আর আমাদের শাস্ত্রেও ত আছে, দুর্য্যোধন রাজা গান গাহিয়াই সুপ্পনখার মন মজাইয়া ছিলেন। তুমিও একটি গান গাও।"

নেফিসার ঈঙ্গিতে একবাঁদী একটা বীণ্ লইয়া কল্যাণসিংহের হস্তে প্রদান করিল।

কল্যাণসিংহ বীণ্ লইয়া, নিখাদ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত একটা মিড় কসিতেই নেফিসার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

কল্যাণসিংহ মৃদু হাসিতে হাসিতে গাহিল,—

কেন না যেতে যামিনী কাঁদায়ে আমায়
ওগো সখা যাবে চলিয়ে?
আমি কত নিশি কেঁদে পেয়েছি তোমারে
আশা না মিটেছে দেখিয়ে।

রয়েছে গগনে তারার মালা,
নিশীথের পাখী ডাকে বিভোলা,
সুরভি ঢালিছে ফুলের মালা
নিজ ভাবে নিজে মজিয়ে।

উষার বায়ু এখনো বহেনি,
প্রভাত-গাথা পাখীরা ধরেনি,
সমীর-পরশে ঝরেনি কামিনী
লাজেতে মরমে মরিয়ে।

কুলবধূগণ বঁধু-বাহুপাশে
এখনো আছে গো জড়া'য়ে,

তটিনীতটেতে এখনো তাহারা
যায়নি কুম্ভ লইয়ে।

অশ্রুকুম্ভ তবে মোরে দিয়ে
কেন তুমি যাবে চলিয়ে?
আমার মেটেনি এখনো পরাণ-পিয়াসা
ওচারু আনন চুমিয়ে।

গান সমাপ্ত হইল,—গানের সুর থামিয়া গেল, কিন্তু নেফিসার প্রাণের তারে তারে তখনও সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে বুঝি ভাবিতেছিল, জগতে ইহাহইতে সুখ আর কিছুই নাই,—এ সুখের কোলে মরিতে পারিলেও বুঝি নারীজন্ম সার্থক হয়।

কল্যাণসিংহ নেফিসার মুখের দিকে তাহার আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক বলিল,—"আমায় কেন ডাকিয়াছেন? আপনি অতুল প্রতাপশালী মহম্মদ রেজাখাঁর বেগম,—আপনার কিসের অভাব? আপনি কি অভাবে আমায় খুঁজিয়াছেন?"

নেফিসার দেহ কাঁপিতেছিল। কথাটার জবাব দিতে গিয়া থামিয়া পড়িল। তাহার প্রাণের কথা মুখে আসিতেছিল না;—প্রেমের প্রথম স্পর্শে প্রাণের ভাব এমন হয়!

কল্যাণসিংহ পুনরপি বলিল,—"আমায় যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই প্রতিপালন করিব। শুনিতে চাহি, আমায় কেন ডাকিয়াছেন?"

মালিনী বলিল,—"বেগমসাহেবার উপযুক্ত খসম তুমি, তাই তোমাকে ডাকিয়াছেন। কেন, তুমি কি শাস্ত্র জান না,—বলরামের রূপ দেখে রাণী কৈগুল্যে তাঁকে গোপণে গোপণে ঘরে নিয়ে ছিলেন?"

কল্যাণসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"মালিনী, তোমার শাস্ত্রজ্ঞান গভীর, বর্ত্তমানে একটু ক্ষান্ত হইলে সুবিধা হয়।"

নেফিসা বেগম বক্র দৃষ্টিতে মালিনীর মুখের দিকে চাহিল। মালিনী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বুঝেছিগো, বুঝেছি। বলে—

"আমে দুধে এক হলো
আঁটির আদর ঘুচে গেল।"

আমি তবে এখন যাই?"

কল্যাণসিংহ মালিনীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায়?"

মালিনী কুটীল নয়নের ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল,—"কোথায় আর যাব! নিজের কুঁড়েয়।"

ক। একত্রে যাব। তুমি এখন যাবে কেন?

মা। আমাকে দেখিয়া এখন তোমাদের রাগ হতেছে বৈত নয়!

নেফিসা মৃদুস্বরে বলিল,—"তুই পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক্।"

মালিনী বলিল,—"কেবল ঘুমাব! এমন আনন্দের দিনে কি শুধু শুয়ে থাকা পোষায়?"

কল্যাণসিংহ হাসিয়া বলিল,—"শুধু শোবে না, বঁধু পাবে কোথায়?"

নেফিসা ও হাসিল। কল্যাণসিংহ পুরুষ হইলে, সে জ্যোৎস্না-ভরা হাসিতে মরিয়া যাইত।

মালিনী বলিল,—"বঁধু চাই না। বাসিফুলে আদর করিবার জগতে কেহ নাই। দুই এক পিয়ালা সিরাজি পেলে সুখী হইতাম।"

নেফিসার ইঙ্গিতে দুইটি হৈমপাত্র পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট সিরাজি আনিয়া বাঁদী, কল্যাণসিংহ ও নেফিসা বেগমের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিল, এবং রৌপ্যপিয়ালায় এক পিয়ালা সিরাজি মালিনীর হস্তে দিল। মালিনী তাহা এক চুমুকে পান করিয়া খালি পিয়ালা বাঁদীর হস্তে দিয়া বলিল,—"রাজপুত্র ওটুকুর সদ্ব্যবহার কর। তুমি না খাইলে সম্ভবতঃ বেগমসাহেবা খাবেন না।"

কল্যাণসিংহ নেফিসার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের মদ খাইতে নাই। প্রয়োজন হইলে আপনি খাইতে পারেন।"

নেফিসা তাহার সুদীর্ঘ নয়নের আকুল দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"আমিও খাব না।"

ক। কেন?

নে। তুমি খাবে না বলিয়া।

ক। আমি কখনও খাইনি বলিয়া খাব না।

নে। তুমি খাওনা বলিয়া আমি আর ইহজীবনে খাব না।

ক। আমার জন্য তোমার আনন্দ রোধ করিবে কেন?

নেফিসা আরও একটু সরিয়া আসিল। বলিল,—"তুমি আমার আপনি বলিতে বলিতে তুমি বলিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম।"

মালিনী বলিল,—"যখন তুমি ছাড়িয়া তুই হবে, তখন আরও সুখ হবে।"

কল্যাণসিংহ নিজ সম্মুখস্থিত সিরাজিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র তুলিয়া লইয়া মালিনীর হস্তে দিয়া বলিল,—"তুমি এইটুকুর সদ্ব্যবহার করিয়া—পাশের ঘরে গিয়া সুখ-স্বপ্ন দর্শন কর; তারপরে আমি যাইবার সময় ডাকিয়া সঙ্গে লইব।"

নেফিসাও তাহার সম্মুখস্থিত পাত্র তুলিয়া মালিনীর হাতে দিল। মালিনী দেখিল, অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। পুনঃপুনঃ সিরাজি সেবনেও যাহার বাসনার ক্ষুধা বিদূরিত হয় না, সে অম্লানবদনে সেই সুরাপাত্র অপরের হস্তে তুলিয়া দিল। কিন্তু মালিনী মনে করিল, নাগরের মনরক্ষার্থে নাগরীর এই ত্যাগ স্বীকার!

মালিনী দুই পাত্রই গলাধঃকরণ করিয়া টলিতে টলিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বাঁদীদ্বয়ও তথা হইতে সরিয়া গেল।

কল্যাণসিংহ বলিল,—"আমায় কি তুমি ভাল বাসিয়াছ?"

নেফিসার সর্ব্বশরীরের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল, সে মস্তক সঞ্চালনে বলিল,—"বাসি।"

ক। কেন আমায় ভালবাস,—আমি তোমার কে?

নে। তুমি আমার কেহ নহ, তথাপি তোমাকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছি। জীবনে-মরণে তুমি আমার।

ক। আমি যদি তোমায় ভাল না বাসি?

নে। তথাপি আমি তোমায় ভালবাসিব। কিন্তু তুমি কি আমায় ভালবাসিবে না?

ক। প্রাণভরিয়া তোমাকে ভালবাসিব। তুমি বেগম—তুমি অতুল ক্ষমতাশালিনী—অনন্ত ধন-সম্পত্তি ও সম্ভ্রমের অধিকারিণী, তুমি কি চির-দিন আমায় মনে রাখিবে?

নে। আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমায় মনে রাখিব। মরিলেও বুঝি ভুলিতে পারিব না।

ক। তুমি অমরবাঞ্ছিতা সুন্দরী—তুমি প্রহরী-বেষ্টিত প্রাসাদে অবস্থিতা; আমি কি করিয়া তোমার নিকটে আসিব?

নে। যদি তোমার আসিতে কষ্ট হয়,—যদি অনুমতি কর, আমি এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।

ক। আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে?

নে। তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই স্থানে যাইব।

ক। তুমি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্রী, মহম্মদ রেজা খাঁর স্ত্রী—তোমাকে লইয়া আমি কোথায় গিয়া লুকাইতে পাইব?

নে। কিন্তু তোমায় না পাইলে আমি বাঁচিব না।

ক। তোমার জন্যে আমিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত; কিন্তু আসিবার উপায় কি?

নে। যে পাঞ্জা দেখাইয়া আজ আসিয়াছ, স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া ঐ পাঞ্জা দেখাইয়া আসিবে, প্রহরীগণ তোমায় বাধা দিবে না।

ক। পাঞ্জা খানি এখন মালিনীর নিকটে আছে। উহা কি আমার নিকটে থাকিবে?

নে। হাঁ, উহা তুমিই নিকটে রাখিও।

ক। যদি তোমার কোন প্রয়োজন হয়?

নে। জগতে নেফিসার একমাত্র প্রয়োজন এখন তোমাতে, আর সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন রহিত হইল।

ক। যদি তোমার স্বামী উহা খুঁজেন?

নে। ও পাঞ্জা আমার স্বামীর নহে,—আমার। আমার নানা উহা আম্মাকে দিয়াছেন। ত্যর পরে স্বামীও উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ক। তোমার স্বামীকে কি তুমি ভালবাস না?

নে। না।

ক। কেন?

নে। ভালবাসিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি ভালবাসিতে দেন নাই। আমার বুক্‌ভরা ভালবাসা এত দিন কেহ নেয় নাই—আর কাহাকেও দিতে ইচ্ছা হয় নাই,—তোমাকে উহা অর্পিত হইল; আশা করি, তুমি ভালবাসার ভাল ব্যবহার করিবে।

ক। তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসিতে দেন নাই কি প্রকারে?

নে। দেন নাই কি প্রকারে শুনিবে? তিনি ফতেমা বেগমকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন,—আমার ভালবাসা তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি আমার যৌবন ও নানার খাতির এইজন্যই যা একটু মৌখিক আদর করেন।

কল্যাণসিংহ মনে মনে ভাবিল, বিলাস-দ্রব্য-পরিসেবিতা, সিরাজি-পান-নিরতা, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-জ্ঞান-বিরহিতা সুন্দরী যুবতীগণকে নবাব-ওমরাহ-

গণ ইন্দ্রিয় সেবার জন্য রক্ষা করিয়া, তাহাদের মনোবেদনার কারণ হয়েন, —তার পরে মালিনীর ন্যায় চরিত্রহীনা রমণীগণের সহায়তায় তাহারা এইরূপেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

নেফিসা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি ভাবিতেছ?"

ক। ভাব্‌ছি, তোমার প্রাণভরা ভালবাসা আমায় দিলে, এখন আমি উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে হয়।

নে। সে তোমার দয়া। তুমি দূরে কেন—এই ফুলশয্যার উপরে এস।

ক। আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে।

নে। তোমার অনুরোধ? তুমি আমায় যা বলিবে, আমি তাই করিব। আমি তোমারই।

ক। আমার অশৌচ হইয়াছে,—এগার দিন আমি তোমার শয্যা-স্পর্শ করিব না।

নে। অশৌচ কাকে বলে?

ক। হিন্দুদের আত্মীয় বা জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে অশৌচ হয়। সে সময়ে মাছ মাংস খাইতে নাই, স্ত্রীলোকের শয্যা স্পর্শ করিতে নাই।

নেফিসা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কল্যাণসিংহ বলিল,— "এ কয়দিন আর আসিব না। অশৌচ অন্তে আবার আসিব।"

নে। তোমার যাতে অসুখ হয়, আমি তাহা করিতে চাহি না। কিন্তু ছুঁইলেও কি দোষ হয়?

ক। দোষ হয়—তবে একবার ছুঁইব, না ছুঁইয়া যাইতে পারিব না।

নেফিসা সরিয়া আসিল। কল্যাণসিংহ সতর্ক হইল;—তারপরে সাবধানে তাহার ফুল্ল-রক্ত কুসুম-কান্তি অধর-যুগল নেফিসার ফুল্ল-রক্ত কুসুম-কান্তি অধর-যুগলে সংস্থাপন করিল। নেফিসার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—তাহার অবসন্ন অলসাবেশিত দেহ কল্যাণসিংহের দিকে ঝুঁকিতেছিল, কল্যাণসিংহ সতর্ক হইল।

তারপরে মালিনীকে ডাকিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া কল্যাণসিংহ বিদায় হইল।

বিনিদ্রনয়নে নেফিসা রাত্রি কাটাইয়া দিল। প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইল,—সমস্ত বাড়ীতে দাস-দাসীগণের কর্ম্মজীবনের কোলাহলময় ছুটাছুটি। সে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমারই হৃদয়ের মত আজকার প্রভাতটাও খারাপ! সমস্ত প্রভাতের উপর যেন কেমন একটা ম্লানতা ব্যাপিয়া আছে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে; আকাশের মধ্যস্থলে—ঈষৎ পশ্চিমদিকে বসিয়া সূর্য্যদেব আপন মনে তীক্ষ্ণ কররাশি পৃথিবীর উপরে ঢালিয়া দিতেছেন। রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর উষ্ণশ্বাসে জীবজন্তু ব্যাকুল হইয়া বর্ষার আগমন প্রার্থনা করিতেছে, এবং একটা পাখী এক ফোটা জলের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির নিকটে 'ফটিকজল, ফটিকজল' করিয়া করুণ প্রার্থনা জানাইতেছে।

জনকোলাহল-মুখরিত সমস্ত মুর্শিদাবাদ নিদাঘ-দাবাদহে আক্রান্ত হইয়া যেন নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছে;—সকলেই আপন আপন কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া শীতল স্থানে মাথা গুঁজিয়াছে।

গোষ্ঠবিহারের রাজার বাসাবাড়ীর দ্বিতলের একটা শীতল নীরব প্রকোষ্ঠে একখানা কুশাসনের উপরে বৃদ্ধ শিরোমণিঠাকুর উপবিষ্ট,—অদূরে মেঝের উপরে পায়ের উপরে পা রাখিয়া কল্যাণসিংহ উপবিষ্ট। উভয়েরই আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কল্যাণসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"মুর্শিদাবাদ আসিয়া যেন ঠাকুরদার কাণ খট্ খটে হ'য়ে উঠেছে। ছোট কথাও এখন যেন শুন্‌তে বিলম্ব হয় না।"

এক টীপ্ নস্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, পার্শ্বস্থিত গাত্র-মার্জ্জনীতে হস্ত মুছিয়া বলিলেন,—"একটু বিশেষ সতর্ক আছি, সর্ব্ব

দাই কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র আছি, তাই কথাগুলা সহজেই শুনিতে পাই। গৃহিণীর কথা তেমন মিষ্ট নয় বলিয়া ইষ্টধ্যানে মন ফেলিয়া রাখিতাম; মনের চিন্তাটা অন্য দিকে থাকাতে বাহিরের কথাগুলা তত শীঘ্র কাণে পঁহুছিত না। আর এখন কল্যাণসিংহের মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য প্রাণ সদাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—ইষ্টচিন্তনটা সেই কারণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাই কাণের শ্রবণশক্তির একটু স্ফুরণ হইয়াছে।"

ক। আমায় একটা ব্যবস্থা দিতে হইবে।

শি। কিসের ব্যবস্থা? অপালনের নাকি? অপালনে ছ কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে।

ক। (হাসিয়া) অপালন নয়, জ্ঞানকৃত বধ। ছ কাহনে কুলাইবে না,—সত্যি একটা ব্যবস্থা চাই।

শি। কি হইয়াছে?

ক। যবনীর ওষ্ঠ-চুম্বনে যে পাতক হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত কি?

বৃদ্ধ শিরোমণি ঠাকুরের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল। মুণ্ডিত মস্তকের শিখাগুচ্ছ ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিল। তিনি বসিয়াছিলেন, ঝাঁপ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—মুখভঙ্গী করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে কহিলেন,—"তুষানল, তুষানল! তখনই বলিয়াছিলাম, মুর্শিদাবাদে গেলে সর্ব্বনাশ হইবে! দুর্গে! তোমার মনেও এত ছিল!"

কল্যাণসিংহ হাসিতে হাঁসিতে বলিল,—"ঠাকুর দা, তোমার কর্ণদ্বয় এখনও নিজের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই। অত রাগের কারণ হয়নি ঠাকুর দা;—যবন নয়, যবন নয়,—যবনী। স্ত্রীলিঙ্গ।"

শিরোমণিঠাকুর বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের বক্র দৃষ্টি কল্যাণসিংহের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া বলিলেন,—"যবনী? যবনী কোথায় পাইলে?"

ক। এক সুন্দরী বেগমের সহিত প্রেম করিয়াছি।

শি। কি বলিতেছ?

ক। ঠাকুর দা; বসিয়া শোন,—আমি জাতি-ভ্রষ্টা হই নাই।

শিরোমণিঠাকুর বসিয়া পড়িলেন। পুনরায় আর এক টীপ্ নস্য গ্রহণ করতঃ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমি কি বলিতেছিলে?"

ক। এক বেগমের সহিত প্রণয় করিয়াছি,—আমি কল্যাণসিংহ কি না—বুঝেছ ঠাকুর দা। তাই সেই বেগমের ওষ্ঠচুম্বন করিয়াছি। বেগম সাহেবা অবশ্য মুসলমানী,—মুসলমানীর ওষ্ঠচুম্বনের প্রায়শ্চিত্ত কি?

শি। গঙ্গাজলে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই সে পাপ নষ্ট হইতে পারে। কেননা, কোন হিতকর কার্য্যোদ্ধারার্থ এমন ঘটিলে তার প্রায়শ্চিত্ত লঘু।

ক। ব্রাহ্মণটি কি আবার শিরোমণি উপাধিধারী হওয়া চাই?

শি। হাঁ, তা হ'লেই ভাল হয়,—কেননা, 'অনন্তং বেদ-পারগে।'

ক। ঠাকুর দা; তোমার স্মৃতিশাস্ত্রের কুষ্মাণ্ডভোজনের বিধিনিষেধের মধ্যে বেদ কোথায় জানি না,—মুগ্ধবোধ বা পাণিনির দু'পাতা উল্টাইয়াও তোমরা বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ হইয়া দান গ্রহণে শিরোমণি হও।

শি। তা হই হই;—এখন তুমি কোথায় কি করিতেছ, তা বল?

ক। একটা ভারি যোগাড় হ'য়ে গিয়াছে ঠাকুর দা।

শি। কি রকম?

ক। রকম শোন,—যে মালিনী আমাদের বাসায় ফুল যোগান দেয়, হঠাৎ একদিন রাত্রে আসিয়া ধরিয়া পড়িল, মহম্মদ রেজাখাঁর বেগম নেফিসা বেগম তোমার প্রণয়প্রার্থী—এবং লইয়া যাইবার জন্য এক নবাবি-পাঞ্জা পাঠাইয়া দিয়াছে। পাঞ্জা পাসিতে লেখা, কাজেই তোমার আমার বিদ্যেয় কুলাবে না বলিয়া গোপনে মোক্তারকে পড়াইলাম।

মোক্তার দেখিয়া বলিল—এ পাঞ্জার বলে মুর্শিদাবাদ সহরে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করা যাইতে পারে—যাহাকে যাহা বলা যায়. সে তাহাই করে। পাঞ্জাখানি হস্তগত করিতে ভারি ইচ্ছা হইল,—তাই মালিনীর সঙ্গে বেগমের কাছে গেলাম। বেগম মালিনীর নিকটে রূপবর্ণনা শুনিয়া খাবি খাইতেছিল,—দেখিয়া একেবারে মরিল। একাদশ দিবসের আর্চ্চা ও পাঞ্জা লইয়া চলিয়া আসিয়াছি।

শি। তারপরে?

ক। তারপরে, এর মধ্যে চম্পট দিলেই সুবিধা।

শি। বুঝিয়াছি, তুমি ভাবিয়াছ—ঐ পাঞ্জা দেখাইয়া তোমার পিতাকে খালাস করিয়া লইয়া পলায়ন করিবে।

ক। তার চেয়ে আরও একটু বেশী।

শি। কি?

ক। আমার ইচ্ছা, অত্যাচার-পীড়িত সমগ্র জমিদারগণকেই খালাস করিয়া লইব।

শি। তারপর মুসলমানে আক্রমণ করিলে?

ক। অতটি জমিদারের সমগ্র শক্তি একত্রীভূত করিয়া একটা লড়াই করা যাইবে।

শি। জমিদারগণ যদি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হয়?

ক। এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও, জমিদারগণ মুক্ত হইতে চাহিবে না। শৃগাল-কুকুরের উপরে অত্যাচার করিলেও তাহারা অত্যাচারীকে দংশন করিতে উদ্যত হয়।

শি। বঙ্গবাসী বহুদিন পর্য্যন্ত দাসত্ব করিয়া প্রভুত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।

ক। প্রভুত্ব করিতে কে বলিতেছে, দাসেরও ত জীবন। দাসও ত রক্ত-মাংসে গঠিত। দাসের অধিকার পাইবার জন্যও দাসের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

শি। চেষ্টা করিয়া দেখ; কিন্তু যদি তাহাতে সফলকাম না হইতে পার?

ক। তখন কেবল বাবাকে লইয়া পলাইব।

শি। কিন্তু যাইবে কোথায়? তাহা হইলে গোষ্ঠবিহার চূর্ণ হইবে—গোষ্ঠবিহারের রাজ-প্রাসাদ মাহিসরের জলে ডুবিবে। আর পুনরায় ধরিয়া আনিয়া আমাদিগকে ফাঁসি কাষ্ঠে লট্‌কাইবে।

ক। যতক্ষণ তাহার প্রতিকূল ব্যবস্থা করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ কোন কাজেই হাত দিব না।

শি। আমার বিবেচনায় ঐ প্রকার কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া, টাকার যোগাড় করিয়া রাজস্ব মিটাইয়া দিয়া দেশে যাওয়াই ভাল।

ক। টাকা আসে কৈ? যে কড়ার করিয়া বাবাকে অত্যাচার করিতে না দিয়া কেবল বন্দী অবস্থায় রাখান হইয়াছে, সে কড়ারের দিনও ত আগতপ্রায়। দাদা কি ভাবিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। টাকা আদায় হইল কি না, তিনি বাড়ী আসিলেন কিনা, তাহার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। রমানাথঠাকুর ও মিশ্রঠাকুর আ'জ সাতদিন হইল, দাদার সংবাদ ও টাকা আনিতে গিয়াছে,—তাহাদের আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে,—সম্ভবতঃ আট দশ দিনের মধ্যে তাহারা ফিরিতে পারিবে না। টাকা দিবার কড়ারেরও আর দশ দিন আছে মাত্র,—ইহার মধ্যে যদি টাকা আসিয়া না পঁহুছে, বাবাকে কি করিয়া বাঁচান যাইবে,—আমি ভাবিয়া ভাবিয়া অবসন্ন হইতেছি।

শি। শাস্ত্রে এসকল তথ্যের বড় কিছু লেখা নাই। তবে তোমার পাঞ্জায় যদি কিছু লেখা থাকে।

ক। ঠাট্টা করিও না ঠাকুর দা; সব দিকেই যোগাড় রাখিতে হয়,—এই বিপদের দিনে অমন একখানা শক্তিসম্পন্ন জিনিষ যে বিশেষ কাজে লাগিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শি। তোমার এই কার্য্যকরী বুদ্ধিতে বিশেষ প্রীত হইলাম। হাঁ, সেদিনকার সে কথাটা বলিতে বলিতে উঠিয়া গিয়াছিলে,—নাত জামাইয়ের নাকি দেখা পাইয়াছিলে?

কল্যাণসিংহ হাসিয়া বলিল,—"দেখাপাইয়াছিলাম কি, বন্দী করিয়াছিলাম। একবার ভাবিয়াছিলাম, গলায় শিকলী দিয়ে সহরে এনে দু'পয়সা রোজগার করিব,—কিন্তু সনাক্তের লোক অভাবে তা ঘটে নাই।"

শি। তুমি বড় দুষ্টু।

ক। কেন ঠাকুর দা?

শি। স্বামী দেবতা।

ক। আমি কি অপদেবতার কথা বলিতেছি? অসভ্যেরা যাহাদিগকে খেলিয়ে বেড়ায়, সভ্যেরা তাহাদিগকে পূজা করে।

শি। তুমি যদি আমাকে ডাকাতে, আমি সনাক্ত করিয়া দিতে পারিতাম।

ক। ডাকান প্রয়োজন জ্ঞান করি নাই,—পথের ডাকাত ধরে স্বামী করে নিয়ে এলে ব্যাপার মন্দ হ'ত না। আমার বাবা জেলে পচিতেছেন, আর আমি ডাকাত পোষ মানানর চেষ্টায় ফিরিব।

শি। ডাকাত বলিয়া তুমি কি তোমার স্বামীকে ঘৃণা কর?

ক। ডাকাতকে ঘৃণা করি,—স্বামীকে অবশ্যই পূজা করি।

শি। তুমি আমার শিষ্যা—কিন্তু আমি তোমাকে বুঝিতে পারি না।

ক। আমাকে বুঝিবার প্রয়োজন নাই, ঠানদিদিকে বুঝিলেই তোমার বৈকুণ্ঠবাস হবে ঠাকুর দা।

শি। জমিদারি বা রাজত্ব না থাকিলে আ'জ কা'ল বৈকুণ্ঠবাস সহজে হয় না।

ক। ঠানদিদির শ্রীচরণ-ধ্যানেও ঐরূপ বৈকুণ্ঠ সহজে লাভ হয়।

শি। তুমি কি ভাব স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, বা প্রণয় নরকের কারণ?

ক। নয়ত কি?

শি। শাস্ত্রে আছে, দাম্পত্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, স্বর্গলাভ হয়।

ক। বুড়ো ঠাকুরদার স্বর্গ লাভই প্রার্থনীয়,—আমি স্বর্গ বাসে সম্মতা নহি। তত সুখ আমার সহিবে না।

শি। বুঝিয়াছি,—তুমি কর্ম্মের আসক্তি, সম্বন্ধের আসক্তি, গৃহের আসক্তি, ধর্ম্মের আসক্তি প্রভৃতি কোন আসক্তিই চাহ না। আসক্তি পরিত্যাগই জীবনের সারকর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর,—কিন্তু পাগ্‌লী; আসক্তি পরিত্যাগ করা সহজ নহে। মুখে বলা, আর কাজে করা— অনেক প্রভেদ। তোমার পিতার জন্য যে এত চেষ্টা করিতেছ,—পিতার বিপদে কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছ, উহাও বন্ধন। প্রেমের নিশ্বাসে নিশ্বাসে কাঁদিলে যে ফল হয়, পিতার বিপদে কাঁদিলে, না হয় তার চেয়ে ভাল ফল হয়, কিন্তু ফল হয় উভয়েতেই।

ক। তা জানি।

শি। তবে স্বামীর উপরে বিরাগ কেন?

ক। বিরাগ কোথায় দেখিতেছ, অনুরাগই ষোল আনা,—হাতে পাই না, এই যা।

শি। হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছ।

ক। তোমার ব্রাহ্মণীর নিকটে আমি গিয়া যদি বলি যে, আমি শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র শিরোমণি,—আর অমনি কি তিনি আমাকে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতে থাকেন,—এবং তাহাতেই কি তাঁহার স্বামিভক্তি ষোলকলায় জাঁকিয়া উঠে?

শি। তুমি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়কে কেন আমার নিকটে লইয়া গেলে না, আমি চিনিয়া দিতাম।

ক। কি দেখিয়া চিনিতে?

শি। তাহার নাকের উপর একটা কাটা দাগ আছে।

ক। হাঁ, সে দাগ আছে বটে।

শি। চোখের যোড়া ভ্রূর মাঝে একটি আঁচিল ছিল।

ক। তাও আছে। কিন্তু এত দেখিয়া রাখিবার শিরোমণি ঠাকুরের কি প্রয়োজন ছিল?

শি। কুলীন জামাই—সহজে দেখা পাওয়া যায় না; ভেল সাজিয়া কেহ না আসে, সে জন্য চিহ্ন দেখিয়া রাখিতে হয়।

ক। আমার বিবেচনায় অমন কুলীনে কন্যা দিয়া কন্যার পিতার আর এক কাজ করা কর্ত্তব্য।

শি। কি?

ক। কন্যাদানের পূর্ব্বে জামতার বাম নিতম্বে চক্র এবং দক্ষিণ নিতম্বে ত্রিশূল-চিহ্ন দগ্ধ লৌহশলাকাদ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া ভাল।

শি। তাহা হইলেও চিনিতে পারা যায় না,—কেননা, উৎসর্গ বৃষের ন্যায় সকল কুলীন জামতারই ঐ চিহ্ন থাকে। কার স্বামী কে, তা চিনিবার উপায় কি?

ক। তবে আর এক কাজ করিলেও হয়?

শি। কি?

ক। পৃষ্ঠদেশে নাম অঙ্কিত করিয়া দিলে হয়। যাক্ বাজে কথার প্রয়োজন নাই,—আসল কথা, যদি তিনি তোমার নাতজামাই ঠিকই হন, তবে আবার খোঁজ পাওয়া যাইবে,—আর না পাওয়া গেলেই বা কি? ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াই সাধক তৃপ্ত হয়, ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ যদি না-ই পাওয়া যায়, তবে মরিতে পারে না।

শি। তোমার প্রণয়িনীর নিকট যাইবার দিন কবে?

ক। এগার দিনের কড়ার করিয়া আসিয়াছিলাম,—আ'জ আট দিন, আর তিন দিনমাত্র।

শি। এই তিন দিন পরে না গেলে, হয়ত পাঞ্জা কাড়িয়া লইবে,—তোমার কেবল যবনীর ওষ্ঠচুম্বনই সার হইবে।

ক। কড়ার মাফিক যেতে হবে।

শি। তারপর ?

ক। তারপর জয়দুর্গা একটা বুদ্ধি যুগিয়ে দেবেন।

শি। কৃষ্ণনগরাধিপতির বাসাবাড়ীতে নাকি তোমাদের এক সভা হইবে ?

ক। হাঁ, সে গুপ্ত খবর তোমায় কে দিল ? গোষ্ঠবিহারের কালা কাণ, মুর্শিদাবাদে আসিয়া যে, অতি গুপ্ত সংবাদ গ্রহণেও তুখোড় হইয়াছে !

শি। তা আর হবে না ? মুর্শিদাবাদের গুণ আছে,—গোষ্ঠবিহারের অন্তঃপুরের কোমল কলিকা, এখানে আসিয়া বেগমের প্রণয়পাত্র হইল কেমন করিয়া ?

ক। কৃষ্ণনগরাধিপতির বাসাবাড়ীতে যে গুপ্ত সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি ভূস্বামিগণের কর্ম্মচারী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাদের প্রভুগণকে—ভূস্বামিগণকে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হয়।

শি। একে তোমার বয়স অল্প, তাহাতে ভিতরে অসার—সুতরাং খুব সাবধানে কাজ করিবে ; শেষে যেন বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত ও দণ্ডিত হইও না। বাঙ্গালী এখন জড়, জড়ে শক্তিসঞ্চার করিতে গেলে, জড় কাটিয়া যায়।

ক। শোন ঠাকুর দা ; আমার ভিতরে অসার বলিয়া তাচ্ছিল্য করিও না। ঠান্‌দিদি না থাকিলে এত দিন শাস্ত্রালোচনা মাহিসরের জলে ডুবিত ;—কাজী না থাকিলে কালের বাহাদুরি বিলুপ্ত হইত ; প্রকৃতি না হইলে পুরুষের সৃষ্টিকার্য্য কে করিত। অসুর ভয়ে দেবশক্তি

স্বর্গ ছাড়া হইলে এই অসারেই সার বাঁধিয়া দৈত্য-দলন করিয়াছিল। এই অসারে আবিষ্ট হইলেই তবে সার ক্রিয়াবান,—তাত জান ?

শি। জানি, কিন্তু ভয় হয়।

ক। তবু ভয় ?

শি। হাঁ।

ক। কেন ?

শি। শাস্ত্রে আছে—"অঙ্কে স্থিতাপি রমণী পরিরক্ষণীয়া।"

ক। সে শাস্ত্র জলে ডুবাইয়া দাও। আগুন আঁচলে বাঁধিয়া তাহার দাহিকা শক্তি নিবারণের চেষ্টা মূর্খের কাজ। ছিদ্র কুম্ভে কি জল ধরা যায় ? শিক্ষায় হৃদয়ের বল রক্ষা হয়,—দরোজায় লাঠি হাতে করিয়া বসিয়া থাকিলে হয় না,—আমার প্রণয়িনী বেগম সাহেবার ঘাটিতে ঘাটিতে সঙ্গীন ঘাড়ে করা পাহারা।

শি। কেবল সে জন্য নহে।

ক। আমিও কেবল সে জন্য বলি নাই। আমি বলিতেছি, শিক্ষা পাইলে রমণী পুরুষের চেয়ে হীন নহে।

শি। তোমার ভুল।

ক। তা হইতে পারে। আপনি পণ্ডিত, আপনি প্রাচীন, আপনি বহুদর্শী—আমি আপনার শিষ্যা, বালিকা, অন্তঃপুরাবদ্ধা,—আমার ভুল হইতে পারে। কিন্তু ভুল ভাঙ্গিব না,—হয়, পিতার উদ্ধার হইবে, আর না হয়,—দেহটা গঙ্গাতে সমর্পণ করিব। দেশে গঙ্গা নাই কি মা !

তদনন্তর উভয়ে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, অনেক শাস্ত্রের কথা উঠিয়াছিল, রাজ-নীতির চর্চ্চা হইয়াছিল,—কিন্তু আমাদিগের আখ্যায়িকার অনাবশ্যকীয় ও অনালোচ্য বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দরামের কথাটা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন। গোবিন্দরাম প্রজার নিকটে খাজনা আদায় করিয়া পিতার বিপদ মুক্তি করিবার জন্য জমিদারীতে গমন করিয়াছিলেন। বাড়ীর দেওয়ান, একজন মুহুরী ও চারিজন সাধারণ ভৃত্য এবং পাইক ও সিপাহী অনেক সঙ্গে গিয়াছিল।

বিনোদপুর নামক একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রামে গোষ্ঠবিহারের রাজার কাছারি। কাছারিবাড়ী কপোতাক্ষী-নদীর তীরে বিস্তৃত ময়দানে অবস্থিত। কাছারির সম্মুখে আম্র পনস নারিকেল তাল খর্জ্জুর প্রভৃতি বিবিধ ফলবৃক্ষ ও বকুল চম্পক শেফালি প্রভৃতি ফুলবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে রোপিত। এই গ্রামে গোষ্ঠবিহারের রাজাদিগের স্থাপিত মদনমোহন-বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের গোস্বামী মহাশয়েরা বিগ্রহের সেবাইত। দেব সেবার জন্য প্রায় সহস্র বিঘা জমি নিষ্কর দেওয়াছিল,—তাহার উপসত্ব হইতে দেবসেবা ও পর্ব্বোৎসবাদি সুসম্পন্ন হইত।

গোবিন্দরাম কাছারিতে পঁহুছাইয়া, গ্রামের মাতব্বর প্রজাগণকে ডাকাইয়া, রাজস্বের জন্য তাঁহার পিতার বন্দী হওয়ার কথা বলিয়া যাহাতে খাজনার টাকা আদায় হইতে পারে, তাহা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রজাগণ যথাসাধ্য খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল,—কিছু কিছু আদায় হইতে আরম্ভ হইল।

নিদাঘকালে কপোতাক্ষীর কূলে কূলে আর জল নাই। আশাশূন্য হৃদয়ের মত দুই পার্শ্বে অনেকখানি গহ্বর জলহীন অবস্থায় পড়িয়া হাহা করিতেছিল,—শুধু মধ্যস্থলে এক গাছি নীলসূত্রের মত ক্ষীণাঙ্গী কপোতাক্ষী বহিয়া গিয়াছে। অল্প-পরিসরা হইলেও কপোতাক্ষী প্রৌঢ়ার ন্যায় গম্ভীরা ছিল না,—কিশোরীর ন্যায় চঞ্চলা।

নদীতীরে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন অঙ্গন বেড়িয়া তিন চারিখানি কুটীর। কুটীরের চারিদিকে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষের সারি। কয়েকটী নারিকেল গাছ হেলিয়া জলের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—উত্তর পার্শ্বের একটা পুরাতন বকুলগাছ, তাহার ঘনবিন্যস্ত শাখা প্রশাখা ও পত্ররাশি লইয়া নদীর উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সেই মধ্যাহ্ন-রবি-কর-বিরোধী বকুল-পত্রের আবরণের ভিতর সন্ধ্যার সময় একজন রমণী কপোতাক্ষীর স্ফটিকজলে গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে গাহিল,—

"মান করি রইলে বসি।
কে তোমার সাধিবে আসি॥
না কর এমত মান শুনহ সুন্দরী।
নিশ্চয় কহিল আমি নিতান্ত তোমারি॥"

প্রাচীন কবির গাথা আর সুকণ্ঠ রমণীর সুরে পথশ্রান্তা কুশাঙ্কুর-ব্যথিত-চরণা সুন্দরীর অবসাদ। ঈর্ষাবশতঃ নদীতীরস্থ সেই বকুল বৃক্ষের পত্র-কুঞ্জ হইতে কোকিল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

যে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল, তাহার নাম পান্না। পান্না কিন্নর জাতীয়া, অর্থাৎ কা'ন। ইহারা প্রাচীন পদ ও কৃষ্ণলীলা গাহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পান্না, বিনোদপুরের মদনমোহন-দেবের মন্দিরের কীর্ত্তনওয়ালী। পঁচিশ বিঘা নিষ্কর জমী সে এইজন্য ভোগ করিয়া থাকে। পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাকে দেবতার সম্মুখে কীর্ত্তন গাহিতে হয়। আলোকমালা-সমুজ্জ্বল

প্রশস্ত নাটমন্দিরে পান্না যখন স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া মহাজনপদাবলী গাহিত, তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিত। তাহার কোমল স্বর যখন সপ্তমে উঠিয়া সমস্ত নাটমন্দির ছাইয়া ফেলিত, তখন বুঝি পাষাণ-দেবতারও চমক ভাঙ্গিত।

বাল্যকালে পান্নার একবার বিবাহ হইয়াছিল,—কিন্তু পান্নার তাহা মনে নাই। বিবাহ করিয়া স্বামী কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন, পান্না তাহা জানে না। পান্না যুবতী।

বিনোদপুরে এক ঘর বড় লোক বাস করিতেন। সেই ধনি-সন্তান রামশরণ, পান্নার অনুগৃহীত। টাকার জন্য পান্না এ অনুগ্রহ বিতরণ করিত,—প্রাণের জন্য নহে।

পান্নার একটি ভাই আছে, তাহার নাম রসিক দাস। রসিক দাসের স্ত্রীর নাম জয়া। পান্নার নিষ্কর জমি ও উপার্জ্জিত অর্থেই সংসার চলিত। রসিক দাসের কখনও মনে হইত না যে, সংসারে তাহার কিছু উপার্জ্জনের প্রয়োজন। সে নিশ্চিন্তভাবে গঞ্জিকা-স্বপ্নে মায়াময় মানব জীবনটা কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতে ছিল। নিতান্ত খেয়াল হইলে কখন বা দেবমন্দিরে পান্নার সহিত খোল বাজাইত।

কপোতাক্ষীর তীর হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"নিতান্ত তোমারি জনে পায়ে ঠেলা ভাল নয়—তা জানত ?"

সে, রূপসী জয়া।—"তবে-লো জয়া, আমার সঙ্গে চালাকি, তোকে মজা দেখাচ্ছি"—এই বলিয়া পান্না ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতৃজায়ার অঞ্চল ধরিয়া তীরে নামাইল। জয়া, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অবগাহন ও গাত্র-মার্জ্জনা করিয়া গিয়াছিল, এবার কলসীকক্ষে জল লইতে আসিয়াছিল,—সুতরাং জয়া জলে নামিয়া পা ভিজাইতে আর বিশেষ উৎসুকা ছিল না। কিন্তু নাচার। পান্না তন্বী, সে স্থূলাঙ্গী;—কাজেই অনেক সময়ে ননদের নিকট ভ্রাতৃজায়াকে হারিতে হইত।

টানাটানিতে পান্নার কাণের একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণফুল খলিত হইয়া জয়ার বস্ত্রের উপর পড়িয়াছিল। জয়া কর্ণাভরণটি করতল-মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ভ্রাতৃ-জায়ার গাত্রে সজোরে গাত্রমার্জ্জনী প্রয়োগ করিবার সময় পান্নার কর্ণাভরণের খোঁজ পড়িল। ভবিষ্যৎ ক্ষতির আশঙ্কায় তাহার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। জয়া বলিল,—"হারিয়ে যাবে না! সন্ধ্যার সময় আমাকে এত কষ্ট দেওয়া—ধর্ম্ম আছেন!" কিন্তু ঈষৎ স্ফুরিতাধরের মধ্যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না—জয়া হাসিয়া ফেলিল। গালের মাঝখানে টোল্ খাইয়া তাহার সুগোল সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইল। পান্না জয়ার দুটি গাল' অঙ্গুলী দিয়া চাপিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী, আমার কাণফুল বের কর্"—কিন্তু তাহাকে কর্ণাভরণের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। জয়া স্বয়ং তাড়াতাড়ি কাণফুলটি পান্নার হস্তে সমর্পণ করিয়া এক হাত ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল।

পান্না তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন লোক অনিমেষনেত্রে তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। সে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এপথে গেলে কি হাটের দিকে যাওয়া যায়?"

পান্না বলিল,—"হুঁ, বরাবর এই পথে গিয়া সম্মুখে একটা বড় তাল-গাছ দেখিতে পাইবে, সেই তাল গাছের নিকট থেকে, ডান পাশে ফিরিও, সম্মুখেই হাট। কেন, পথ জিজ্ঞাসা করিবার কি আর দেশে লোক ছিল না?"

লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পান্না মনে মনে হাসিল; ভাবিল, লোকটা ভারি বোকা, একটা কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। কিন্তু মানুষটা সুপুরুষ বটে—আলাপ পরিচয়ের নিতান্ত অযোগ্য নহে। সুন্দর চোখ!

জয়া বলিল,—"তুমি বড় ঠোঁটকাটা। তোমার কথায় লোকটা পালাইবার পথ পায় না।"

পান্না একবার ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে চাহিল। তাহারপর অন্যমনস্কভাবে শুধু একটা 'হুঁ' দিয়া দক্ষিণ হস্তে চুল জড়াইতে জড়াইতে ঘাট হইতে উঠিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশদাম হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ভূপৃষ্ঠে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

ঐ-ঘটনার পরদিবস স্নানযাত্রা। স্নানযাত্রা উপলক্ষে সন্ধ্যার সময় মদন-মোহনদেবের মন্দিরে লোকারণ্য।

দেবতার সম্মুখে স্ফটিকাধারের উপর দুইটি ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণ-প্রদীপ। পুষ্পপাত্রে স্তরে স্তরে চন্দনসিক্ত চম্পক, তগর ও পদ্ম। সেই স্নিগ্ধালোকে মন্দিরের প্রধান গোস্বামী মহাশয় ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি সচন্দন পুষ্প মদনমোহনবিগ্রহের পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছিলেন।

প্রধান গোস্বামীর ললাটে গোপীচন্দনের দীর্ঘরেখা। সুদীর্ঘ-বপু শুভ্র প্রাবারে আচ্ছাদিত। আনন প্রসন্ন ও প্রতিভাদীপ্ত।

ক্রমে আরও রাত্রি হইল, অরও অনেক লোক আসিয়া নাট-মন্দিরের আস্তৃত গালিচায় আসর জাঁকাইয়া বসিতে লাগিল। মন্দিরের সোপানশ্রেণীর উপর রমণীদের অলঙ্কারশিঞ্জিত অবিশ্রান্ত শ্রুত হইতেছিল।

পান্না আসিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। নূপুর-শিঞ্জনে সকলের চক্ষু সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

পান্নার পরিধানে একখানি বারাণসীর স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী। হস্তপ্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়। দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলীতে একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক। কর্ণাভরণ দুই খানি স্বর্ণ-বিন্দু। কেশপাশ মস্তকের বাম দিকে ফিরাইয়া বাঁধা,— বেণীর উপরে স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল। ওষ্ঠদ্বয় তাম্বুলরাগে রঞ্জিত। হস্তে তাম্বুলপূর্ণ একটি সুদৃশ্য তাম্বুলাধার। সমস্ত অঙ্গে গোলাপী আতরের সৌরভ।

পান্না বিস্তৃত গালিচার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিল। তাহার পশ্চাতে ধনুরাকারে তাহার দোয়ার ও বাজিয়েগণ বসিয়া যন্ত্রের সুর মিলাইয়া লইয়া গান ধরিল।

যে আসনে পান্না আসর লইল, তাহার সম্মুখের আর এক খানি আস্তরণের উপর সেই প্রদেশের অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি ও ধনিসন্তান রামশরণ উপবিষ্ট। সকলেরই পোষাক-পরিচ্ছদের বেশ পারিপাট্য ছিল।—এই সকল লোকের সম্মুখভাগে, ঠিক মধ্যস্থলে সেই আসনের উপর স্বর্ণখচিত আর একখানি বিচিত্র আসন। আসনের পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে স্বর্ণখচিত মখমলে মণ্ডিত বহুমূল্যবান্ তিনটি বালিস,—সম্মুখে রৌপ্যের ফর্সির মাথায় স্বর্ণ-কলিকায় সুগন্ধি তামাকু পুড়িতেছিল,—আসনে রাজকুমার গোবিন্দরাম উপবিষ্ট; একটু দূরে—পার্শ্বে লোহিতরঙ্গের পরিচ্ছদে সঙ্গিন ঘাড়ে করিয়া দশ বারজন সিপাহী দণ্ডায়মান।

গোবিন্দরামকে দেখিয়া পান্না একটু হাসিল। হাসির অর্থ,—তুমি না সেদিন হাটের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে? তখন বড় পলাইয়াছিলে, কিন্তু আজ আমার জালে তোমায় পড়িতে হইবে। আমি তোমায় দেখিয়া লইয়া ছাড়িব।

গোবিন্দরাম একটু মুখ ফিরাইয়া ভাবিল,—ছি ছি এত লোকের মধ্যে!

কপোতাক্ষীর ন্যায় পান্নার হৃদয়তট প্রায় শুষ্ক; শুধু ছলনা, শুধু মুখের কথা—কেবল ভ্রাতৃস্নেহের একটু ক্ষীণধারা ঝিরি ঝিরি করিয়া বহিত। কিন্তু হঠাৎ আজ প্রবল বন্যার উপক্রম হইল। সুদূরশ্রুত বন্যার বারি-কল্লোলের ন্যায় আজি তাহার বেপমান অন্তরের দুরু দুরু স্পন্দন হৃদয়প্লাবী প্রেমের বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছিল।

বেহালার মধুর শব্দের সহিত মৈথিল কবির "দছিন পবন বহধীরে"

মিশিয়া আরও মধুর হইল। পান্নার চক্ষু উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, সমস্ত নর নারীর অস্তিত্ব সে একবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে জাগিতে-ছিল,—শুধু সেই বিরহ-বিধুরা রাধিকার কথা।

পান্না পূর্ব্বরাগ গাহিতেছিল। দিবসান্তে রাধিকা চঞ্চলা। শতবার বিনা কারণে গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিল। সন্ধ্যাসমাগমের সহিত পায়ের উপর নূপুর ‘কসি’ দিয়া বাঁধিতেছিল। পরিধানে ‘তম-সম চীর।’

তারপর গাহিল, প্রথম অভিসার। “উজোর” রজনীতে সুন্দরী ঔৎসুক্যের সহিত কুঞ্জবনে উপস্থিত, কিন্তু হৃদয়েশের কাছে যাইতে পদে পদে লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে সমী-রান্দোলিতা লতার ন্যায় থর থর করিয়া সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতেছিল। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরে ত্রাস-কম্পিতা হরিণীর ন্যায় রাধা ভীত-চকিত-দর্শনা।

অভিসার গাহিতে গাহিতে পান্নার কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পা কাঁপিয়া মধ্যে মধ্যে নৃত্যের তালভঙ্গ হইতেছিল। হৃদয়াবেগ সংবরণার্থ কিসলয়-কোমল করতল বক্ষের উপর রক্ষিত।

হঠাৎ নদীকূলে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। পান্না মৈথিলী কবির কোমল কান্ত পদাবলী গাহিল,—

“অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোহাথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধম্মিল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ॥

অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজন যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐ ছলে মিলিল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগররাজ॥
হেরইতে মাধব পড়ল হি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গিল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥"

সঙ্গীতান্তে চারিদিক হইতে স্তুতিসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। পান্না একবার অপাঙ্গে আবেশতরল-নেত্রে গোবিন্দরামের দিকে চাহিয়া সদলে বাহির হইয়া গেল। শ্রোতৃগণও উঠিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল।

গোবিন্দরাম শিবিকারোহণে শিপাহী-পরিবৃত হইয়া কাছারিতে গমন করিলেন। আহারাদি করিলেন, কিন্তু ব্যঞ্জনের স্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইলেন না। শয়ন করিলেন, শয্যা ভাল লাগিল না। নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলেন, নিদ্রা আসিল না। সারারাত্রি জাগিয়া, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইয়া দিয়া নিশাবসান-কালে কাছারিবাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে চিত্ত-বিনোদনার্থ গমন করিলেন। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই, তখনও আকাশের গায়ে অনন্ত নক্ষত্র ম্লানজ্যোতিতে শোভা পাইতেছিল। পাখীরা তখনও কুলায় পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু পত্রান্তরাল হইতে এক একবার ডাকিয়া প্রতিবাসী-দিগকে উদ্বোধিত করিতেছিল। উষানিল মৃদু প্রবাহিত হইয়া কুসুম-গণকে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

নদীতীরের বহুদূর-বিস্তৃত জমির উপরে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ছোট ছোট ফলবৃক্ষ রোপিত,—চারিধারে অনতিউচ্চ ইষ্টকের প্রাচীর; প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি দরোজা,—ইহাই পুষ্পোদ্যান। সকাল বিকাল প্রায়ই উদ্যানের দরোজা উন্মুক্ত থাকিত। গ্রাম্য-লোকেরা

সেই উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া লইয়া গিয়া দেবপূজা করিত। তাহাতে কাহারও আপত্তি বা বাধা ছিল না।

গোবিন্দরাম পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন প্রস্ফুটসৌরভামোদিত চম্পকবৃক্ষের তলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, একটি স্ত্রীলোক মাধবীকুঞ্জের দিকে ঘুরিয়া গেল। পুষ্পচয়নার্থিনী কোন কুলযোষিতের আগমনজ্ঞানে তিনি ফিরিয়া অন্যপথে যাইতেছিলেন, কিন্তু সে রমণী ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। গোবিন্দরামের হৃদয়ের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল,—কুসুমবাসের সহিত সেই রমণীর নিশ্বাসস্পর্শে তাঁহার প্রাণ স্পন্দিত হইল। রমণী পান্না।

পান্নার সেই বেশ, সেই আভরণ এখনও অঙ্গে শোভা পাইতেছিল। তাহার প্রস্ফুটিতপদ্মবৎ জাগরণারুণ নয়ন গোবিন্দরামের মুখের উপর স্থাপিত হইল। সে চোখ, সে মুখ, সে রূপ দেখিয়া গোবিন্দরাম চমকিলেন।

পান্না বলিল,—"আপনি, এখন এখানে কেন?"

গোবিন্দরাম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—শরীরটা ভাল নহে, তাই বেড়াইতে আসিয়াছি।"

পা। রাত্রে বোধ হয় ঘুম হয় নাই?

গো। ভাল হয় নাই। তুমি জানিলে কি প্রকারে?

পা। আমারও যে হয় নাই।

গো। তোমার ঘুম হয় নাই বলিয়া, আমার হইবে না কেন?

পা। ইহাই মদনরাজার বিধি। তিনি বড় দয়ালু দেবতা। একজনকে মারেন না।

গো। আমি বিবাহিত।

পা। অবিবাহিত হইলেও আমার সে আশা ছিল না। আমি দুঃখিনী কান্যের মেয়ে। রাজপুত্রের—ব্রাহ্মণপুত্রের গলে বরমাল্য দিবার ক্ষমতা

কোথায়? একটু কৃপাকর, একটু ভালবাস,—ইহাই চাই। জীবনে ভাল-বাসা কাহাকে বলে, জানি নাই। এই প্রথম ভালবাসা—আমায় পায়ে ঠেলিও না।

উষাসমাগমে আপাণ্ডুর মলিনচন্দ্রের ছায়া পুষ্পোদ্যানপ্রান্ত-বাহিনী নদীবক্ষে দুলিতেছিল। দূরে নদীসৈকতে চক্রবাকমিথুনের রব শ্রুত হইতেছিল। একদল ক্রৌঞ্চ সুদূর জলাশয়-উদ্দেশে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। গোবিন্দরাম পান্নার চন্দ্রালোক-বিভাসিত অধর সস্পৃহ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু সেই তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত কোমল রক্তোষ্ঠ স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছিল কি! পান্না হাসিয়া বাহুযুগল-দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মদনমোহনবিগ্রহের গাত্র হইতে মূল্যবান্ অলঙ্কার সমুদয় এক রাত্রে অপহৃত হইল। প্রভাত হইতেই রাজকর্ম্মচারিগণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া কতকগুলি গাঁজাখোর দরিদ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল, এবং তাহাদের কথিতমতে জানিতে পারিল, পান্নার ভ্রাতা রসিকদাস গোয়েন্দা হইয়া তাহাদিগকে মন্দিরে লইয়া গিয়াছিল। সংবাদ শ্রুত হইবামাত্র কয়েকজন সিপাহী লইয়া কোটাল পান্নার বাড়ী গিয়া রসিকচন্দ্রকে বন্ধন করিল।

রসিকদাস দোষী, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত-করুণ-নয়নে ভগিনীর দিকে চাহিল। তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত কাতরতা মাতৃ-ক্রোড়স্থ মুমূর্ষু শিশুর দৃষ্টির ন্যায় পান্নার মর্ম্ম-স্পর্শ করিল। পান্না একবার অভয়প্রদ-কটাক্ষে ভ্রাতার দিকে চাহিল। কোটাল তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

পান্না সারাদিন আহার করিতে পারিল না, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া দিল। তাহার ভ্রাতৃজায়ার মুখখানা দেখিয়া সে আরও প্রাণ বাঁধিতে পারিতেছিল না।

পান্না সন্ধ্যার পরে অভিসারবেশ পরিধান করিল। প্রতিবাসিনী বৃদ্ধা রামার মাকে একটু আগে পাঠাইয়া দিয়া, শেষে সে প্রস্থান করিল।

পুষ্পোদ্যানের শেষ-প্রান্তে, কপোতাক্ষীর তীরে এক ক্ষুদ্র গৃহ নব-নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে। সে গৃহ গোবিন্দরামের আদেশে ও নৈশ-বিহারের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে,—কিন্তু পান্না যে সেখানকার আনন্দ-দায়িনী, তাহা কেহ জানিত না।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মেঘশূন্য বর্ষার আকাশে নির্ম্মল চন্দ্র সমুদিত। গোবিন্দরামের হস্তধারণ করিয়া পান্না কপোতাক্ষীর তীরে পুষ্পোদ্যানস্থ ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান। তাহার আয়ত নয়ন জলভারে টলটলায়িত ও স্ফীত।

তখন শ্রাবণ মাস। কপোতাক্ষীর কূল দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীর খরস্রোতে তীরস্থ বেতস-লতা অবনতমুখী। প্রস্ফুটিত কেতকী-কুসুম বারিপ্রবাহে সাগরাভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। দূরে কোন জলপ্লাবিত তড়াগ হইতে উৎপল কুমুদ প্রভৃতি জলজপুষ্প নদীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

পান্না তাহার কোমল-করধৃত গোবিন্দরামের হাত দুইখানি আরও একটু জোরে চাপিয়া সকাতরে বলিল,—"আমার ভাইকে রক্ষা কর। আমি চার বৎসর বয়স হইতে মাতৃ-পিতৃহীন, এবং বিবাহের পরেই স্বামি-দর্শনে বঞ্চিতা। রসিকের বয়স তখন সাত কি আট। সেই দিন হইতে আর আজ পর্য্যন্ত তাহাকে মানুষ করিতেছি। পৃথিবীতে রসিক আমার একমাত্র স্নেহের জিনিষ। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে বাঁচাইতে পার, এবং মারিতেও পার।"

গোবিন্দরাম গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"আমি সব শুনিয়াছি। মদনমোহন-দেবের অলঙ্কার চুরির প্রধান দোষী তোমার ভ্রাতা।"

পা। কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।

গো। আমার অসাধ্য।

পা। তোমার অসাধ্য! মিছে কথা। তুমি রাজা—নামের

তোমার কর্ম্মচারী—আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এদেশ তোমার—তুমি এদেশের লোকের উপর যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

গো। আমি তাহা পারিব না।

পা। কেন?

গো। আমি তাহা করিতে গেলে, আমার দুর্নাম হইবে।

পা। কিসে?

গো। লোকে এমনই তোমার ও আমার নাম একত্রে লইয়া কাণা-ঘুসা আরম্ভ করিয়াছে। আবার তোমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিলে সেই কথার প্রমাণ হইবে।

পা। আমার ভ্রাতার কি দণ্ড হইবে?

গো। বেত্র-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। প্রত্যেক আসামীকে ত্রিশ বেতের আদেশ হইয়াছে।

পা। তাহা হইলে সে বাঁচিবে না।

কথা বলিতে বলিতে পান্নার চোথ ফাটিয়া জল আসিল। কিন্তু রমণীর মহাস্ত্রও ব্যর্থ হইল। নয়নজলে গোবিন্দরামের মন টলিল না। তিনি অতি শুষ্কভাবে বলিলেন—"আমার ইহাতে কোন হাত নাই। নায়েবের আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলিলে আমার ঘোর দুর্নাম হইবে।"

পান্না গোবিন্দরামের পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল,—"আমার যথা সর্ব্বস্ব লইয়া আমার ভাইকে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতর একটা ঝটিকা বহিয়া যাইতেছিল। পান্নার অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ দেখিয়া এক একবার রসিককে খালাস করিয়া দিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই কলঙ্ক রটিবার আশঙ্কায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া অতিরুক্ষস্বরে গোবিন্দরাম বলিলেন,—"কেন আমাকে জ্বালাতন করিতেছ, আমি সে সকল কাজের মধ্যে নহি।"

পান্না অশ্রুজলসিক্ত বিস্ফারিতলোচনে গোবিন্দরামের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার ভালবাসারও কি কোন শক্তি নাই?"

গৃহস্থিত আলোক-কিরণোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় মেঝেয় পাতিতা সুমসৃণ হরিৎশয্যার উপরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। গোবিন্দরাম হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ্যার ভালবাসা!"

পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় পান্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে ও রোষে তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। প্রবল অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিতেছিল। হঠাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে আসামীগণের বেত্রদণ্ড হইল। রসিকদাস বেত্রাঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া শয্যাগ্রহণ করিল। পান্না ও পান্নার ভ্রাতৃজায়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া,রাত্রিজাগিয়া রসিকদাসের শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু গঞ্জিকাসেবন-ভগ্নদেহ সে দণ্ড সহ্য করিতে পারিল না। পনর দিনের দিন ভয়ানক জ্বর হইল,—জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে টঙ্কার হইয়া সতর দিনের দিন সন্ধ্যার সময় রসিকদাস ইহলোক হইতে বিদায় হইল।

পান্না উন্মাদিনীর বেশে তাহার আনিতম্ব-বিলম্বিত কেশরাশি উর্দ্ধে তুলিয়া বাঁধিল। তাহার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিল, সে আগুনে গোবিন্দরামকে দগ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। সে বুঝিয়াছিল, গোবিন্দরাম প্রতারক! গোবিন্দরামের একবিন্দু দয়া হইলে, সে তাহার স্নেহাধার ভ্রাতাকে হারাইত না। তাহার হৃদয়ের প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল, সে গোবিন্দরামকে সে আগুনে পোড়াইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দরাম জানিতেন, চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকেরা সব করিতে পারে। তাহারা ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার অযতনে বাঞ্ছিতকে বিনষ্ট করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। তাই তিনি, সেই দিবস হইতে পান্নার সংস্রব

সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নতুবা পান্না নিজহস্তেই প্রতিশোধ লইবার কল্পনা করিয়াছিল।

পান্না ভুলিতে পারিল না। হৃদয়ের জ্বালা উপশমিত হইল না। সে রামশরণের শরণাপন্ন হইল। রামশরণের চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিল,—"আমার মোহ ভাঙ্গিয়াছে। তুমি আমায় ভালবাস, কিন্তু আমি তোমায় ভাল বাসিতাম না। সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম—যদি না করিতাম, তোমার সহায়তায় ভাইটিকে বাঁচাইতে পারিতাম। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

রামশরণ পান্নাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং জানিত, পান্না তাহাকে তেমন ভালবাসে না। তারপরে রাজপুত্রের সহিত প্রণয় হওয়ায় সে ব্যর্থ প্রণয়ের অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু প্রতিশোধ লইবার কোন সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন রাগ হইত, পান্নার উপরে; এখন প্রণয়িনী কাঁদিয়া ফিরিয়া আসায় বুঝিল, রাজপুত্রই ইহাকে কুপরামর্শে নিজ কবলে লইয়াছিলেন। রামশরণ বলিল,—"বড় দেখিয়া ছুটিয়াছিলে, প্রতিফল পাইয়াছ, বেশ হইয়াছে। এখন কি বল?"

আবেশক্রুদ্ধ রক্ত আঁখি রামশরণের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া পান্না বলিল,—"যদি গোবিন্দরামকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পার, তবে আমি তোমার সেবা করিয়া চিরদিন বাঁচিয়া থাকিব—নতুবা, তোমারই চরণতলে এ জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

রামশরণ বলিল,—"গোবিন্দরামকে শিক্ষা দিব! সে কি সম্ভবে? গোবিন্দরাম রাজপুত্র—দেশের একছত্রা অধিপতি। বহু সৈন্য তাহার আজ্ঞাবহ—তাহার ইঙ্গিতে বিনোদপুর ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়া কপোতাক্ষীর জলে মিশিয়া যায়,—আমি তাহাকে কি শিক্ষা দিব, পান্না?

পান্না ভ্রুকুটি করিয়া বলিল,—"দিও না। বুঝিয়াছি আমার অনুরোধ

রাখিতে—আমার কথা শুনিতে জগতে কেহ নাই। সকলেই চায় সুখ, সকলেই চায় আমার রূপ। আমার প্রাণ কেহ চায় না।"

রা। আমিও প্রাণের ভিখারী, কিন্তু দাও নাই।

পা। আজি দিবার জন্য তোমার চরণতলে উপস্থিত।

রা। তবে তাই হউক, আমি তোমাকে রাজরাণীর মত সুখে রাখিব।

পা। রাজরাণী হইয়া দেখিয়াছি—তাহাতে সুখ নাই। যদি প্রাণ চাও—প্রাণের বেদনা বোঝ। আমার প্রাণ যদি ভালবাস, প্রাণের আগুন নিবাইয়া দাও।

রামশরণ অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। শেষে বলিল,—"ইহার উত্তর কা'ল দিব।"

পান্না বলিল,—"আমায় বল, তুমি গোবিন্দরামকে যথোচিতরূপে শাস্তি দিবে, তবে আমি তোমার চরণ ছাড়িব।"

রামশরণ প্রতিজ্ঞা করিল। বলিল,—"পান্না, তোমার আদেশ প্রতিপালন করিতে, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে যদি আমার প্রাণও যায়, আমি তাহা করিব।"

পান্না বলিল,—"যদি তাহা কর, এ জীবন তোমারই সেবার্থে নিয়োজিত থাকিবে।"

তারপরে পান্না চলিয়া গেল। রামশরণ নয়ন ভরিয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় পান্নার ক্রোধরক্তোক্ষণ নয়নজ্যোতি এবং চলনভঙ্গি দেখিয়া মুগ্ধ হইল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সুন্দরী রমণীর এই উপরোধ রক্ষা করিব।

তারপর, যথাসময়ে সে তাহার তিন চারিজন অতিঘনিষ্ঠ বান্ধবের সহিত ঐ বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য এক নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিল।

রামশরণ বলিল,—"কিসে আমি রাজপুত্র গোবিন্দরামকে অপদস্থ ও

অপমানিত করিতে পারি, তাহাই আমার চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছে। ঐ কার্য্যের পরামর্শ ও সহায়তার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কার্য্য বিবেচনা করিয়া, তোমরা আমার কার্য্যে পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা কর।"

সকলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিল, তাহা এইরূপ ;— রামশরণ এবং তাহার বান্ধবেরা সকলেই ধনী। তাহারা কৃষক প্রজা-দিগের ও ব্যবসায়িগণের মহাজন,—তাহারা টাকা দিলে তবে প্রজাগণ খাজনা প্রদান করিবে। গোবিন্দরামের পিতা রাজস্বের জন্য মুর্শিদাবাদে বন্দী,—এই সময় খাজনা বন্ধ করিয়া দিলে তাহাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

রামশরণ ও তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রজাবর্গকে ক্রমে ক্রমে গোপনে জানাইল যে, গোবিন্দরাম রাজপুত্র হইয়া গৃহস্থের মেয়ের উপরে অত্যাচার করিয়াছে—অতএব তাহার শাসন করা কর্ত্তব্য—তাহাকে এক পয়সাও খাজনা দেওয়া হইবে না। প্রথম প্রথম অনেকে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সকলেই একমত হইল, খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল।

প্রজাগণ খাজনা প্রদান করিতেছিল, হঠাৎ কেহ আর একটি পয়সাও প্রদান করে না, কাছারিতে ডাকিলেও বড় আসে না। কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া নায়েব জানিতে পারিলেন, প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়াছে, আর তাহারা খাজনা দিবে না। নায়েব তাহা যথাসময়ে গোবিন্দরামের গোচরে আনিলেন।

গোবিন্দরামের হৃদয় দমিয়া পড়িল। আর সাত আট দিনের মধ্যে প্রায় লক্ষ টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা ও কড়ার ছিল। সবে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে মাত্র। গোবিন্দরাম কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না,—

ঠিক এই সময়ে গোষ্ঠবিহার হইতে লোক আসিয়া যে পত্র কল্যাণী মুর্শিদাবাদ হইতে গোবিন্দরামকে লিখিয়াছিল, তাহা প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি সত্বর টাকা না পাঠাইলে, মুসলমানের নির্দ্দয়-প্রহারে তাঁহার পিতার জীবনান্ত হইবে।

গোবিন্দরাম উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। প্রধান প্রধান প্রজাকে ডাকিয়া কাতরে—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের সহিত বলিলেন,—"তোমাদের নিকট ভিক্ষাস্বরূপ চাহিতেছি, যে টাকার কড়ার ছিল, আমাকে সেই টাকাগুলি প্রদান কর। যাহাতে টাকাগুলি পাইতে পারি, তাহা কর। চিরদিন তোমাদের এ অনুগ্রহ স্মরণ রাখিব। আমার পিতার বড় বিপদ্!

প্রজাগণ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা দল বাঁধিয়াছে, তাহারা খাজনা দিবে না, সে কথা স্পষ্টরূপে বলিল।

গোবিন্দরাম বলিলেন,—"দল বাঁধ, পাছে বাঁধিও। আমাদের এ দায়ে রক্ষা কর। খাজনা বলিয়া না দাও—কর্জ্জস্বরূপে আমাকে দেড় লক্ষ টাকা প্রদান কর।"

প্রজাগণ হাসিল। ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া উঠিয়া যাইতেছিল,—গোবিন্দরামের আর সহ্য হইল না। উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভিক্ষা চাহিলাম, ঋণ চাহিলাম—খাজনা চাহিলাম, দিলে না। অধিকন্তু হাসির ব্যর্থ-ব্যঙ্গে অবজ্ঞা করিলে, আদেশ অবহেলা করিয়া উঠিয়া চলিলে, কিন্তু এখনও গোষ্ঠবিহার-রাজের গৃহ শূন্য হয় নাই, সৈন্য-বল হ্রাস হয় নাই—দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিব, প্রতি গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল তুলিব—প্রতি প্রজার হৃদয়ে হাহাকারের ধ্বনি উঠাইব। এত কাতরতা, এত নম্রতা, কেবল প্রজার হৃদয়ে করুণা আনিয়া টাকা আদায়ের জন্য। তোমরা বুঝিলে না—ইহার প্রতিফল দিব। কপোতাক্ষীর নীলজল রক্তরঞ্জিত করিব—আমার পিতা রাজস্বের দায়ে বন্দী; আমি কাহারও মুখ চাহিব না, কাহারও কথা শুনিব না।"

কিন্তু প্রজাগণও তাঁহার কথা শুনিল না, তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল। ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় গোবিন্দরাম গর্জ্জিয়া উঠিলেন। নায়েবকে অনুজ্ঞা করিলেন, "এক একজন করিয়া প্রজা ধরিয়া আনাও—কড়ারের টাকা চাহ। না দিলে পৈশাচিক দণ্ডে তাহাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দাও,—প্রজার গৃহে গৃহে আগুন লাগাও, প্রজার সম্মান-বিনাশার্থে তাহাদের স্ত্রী ভগিনীগণকে কাছারিতে ধরিয়া আনাও—তরফ বিনোদপুর শ্মশানে পরিণত কর। কাহারও অনুরোধ শুনিব না, কাহারও চক্ষুর জল দেখিব না—ধর্ম্মের দোহাই মানিব না। যাহারা বিনয়ে বশে আসিল না, করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না, ধর্ম্মের কাহিনী মানিল না,—. তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কি? তাহাদের সহিত পৈশাচিক ব্যবহারে পিশাচের আচরণ করাই কর্ত্তব্য।"

নায়েব আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত হইলেন। কর্ম্মচারিগণ রাক্ষসের মূর্ত্তি ধারণ করিল। সৈন্যগণ আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় রণোন্মুখ হইয়া রহিল।

রাজকর্ম্মচারিগণের ভীষণ অত্যাচারে প্রজাগণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল—চারিদিকে অশান্তির আগুন ধূ ধূ জ্বালিয়া উঠিল। কিন্তু রামশরণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণও নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহারাও বাছা বাছা যোয়ান সংগ্রহ করিয়া প্রজাগণের রক্ষণার্থ নিযুক্ত করিলেন, মধ্যে মধ্যে জমিদারের লোকের সহিত প্রজাগণের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল, কিন্তু গৃহস্থের বৌঝির গৃহের বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। হাট ঘাট আনন্দ উৎসব নিবৃত্ত

রামশরণ বান্ধবগণের ও প্রজাগণের সহিত জোট পাকাইয়া এক প্রবল দলের সৃষ্টি করিল। তার পরে এক যশোহরের ফৌজদার সাহেবকে বহুল টাকা গণিয়া দিয়া গোপনে একদল ফৌজ সংগ্রহ করিয়া আনিল।

একদিন নিশীথরাত্রে গোবিন্দরাম কাছারিগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। প্রজা বিদ্রোহী বলিয়া পাহারার বন্দোবস্ত রীতিমতই ছিল,

কিন্তু সহসা অসংখ্য বন্দুকের আওয়াজের সহিত মানবের কণ্ঠোচ্চারিত হুহুঙ্কার-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। কাছারিবাড়ীর সকলেই জাগরিত হইল। গোবিন্দরামও উঠিয়া বন্দুক ধরিলেন,—সৈন্যগণ আজ্ঞা পাইয়া অস্ত্র চালাইতে এবং গোলন্দাজগণ কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু বাঁধভাঙ্গা জলপ্রপাতের ন্যায় বিপক্ষগণ কাছারিবাড়ীতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কাছারিতে দুই সহস্রের অধিক শিক্ষিত সৈন্য ছিল না। তদ্ভিন্ন সিপাহী, বরকন্দাজ, দরোয়ান প্রভৃতিও চারি পাঁচশত ছিল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তরফ বিনোদপুরের বয়স্থ পুরুষ মাত্রেই অস্ত্রগ্রহণ করিয়া আসিয়াছে,—আর শিক্ষিত ফৌজের সংখ্যাও দুই সহস্রের উপর হইবে। ইহাতে বিপক্ষসংখ্যা অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র হইয়াছিল।

তথাপিও রাজসৈন্যগণ অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিল। প্রায় একপ্রহর যুঝিয়া যুঝিয়া তাহারা শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে বিপক্ষের অস্ত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিল, অনেকে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

তখন পিপিলিকাশ্রেণীর ন্যায় বিপক্ষগণ কাছারিবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজসৈন্যগণকে পদদলিত করিয়া প্রতি গৃহে গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দিল, এবং যত্ন সঞ্চিত আদায়ী টাকাগুলি অপহরণ করিয়া লইল।

গোবিন্দরাম অশ্বারোহণ করিয়া এতক্ষণ সৈন্যপরিচালনা করিতেছিলেন, এখন সৈন্যগণ মৃত ও পলায়িত হওয়ায় এবং অর্থগুলি লুণ্ঠিত ও প্রতিগৃহ অগ্নিময় হইয়া উঠায়, অগত্যা নিরুপায় হইয়া পলায়নের জন্য অশ্বচালনা করিলেন। রণশ্রান্ত অশ্ব পুনঃ পুনঃ কষাঘাতে উন্মত্ত হইয়া কপোতাক্ষীর তীরাভিমুখে ধাবিত হইল।

তখন রাত্রি শেষ হইয়া উঠিয়াছিল। উষার বাতাস জগতে প্রবা-

হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। হৃতঅর্থে অপমানিত, দলিত, সংক্ষুব্ধ গোবিন্দরামের মুখচ্ছায়া পাণ্ডুর—উপরে ঊষার চন্দ্র পাণ্ডুর, সর্ব্বত্র নিশার অন্ধকার পাণ্ডুর—শ্রান্ত ক্লান্ত অশ্ব উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতেছিল। সহসা নদীতীরের বকুল বৃক্ষের কাণ্ডসংলগ্ন এক রমণীমূর্ত্তি সেই ঊষানিলসংস্পর্শে আপাণ্ডুর চন্দ্রকিরণে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দরাম চাহিয়া দেখিলেন, রমণীর মূর্ত্তি—উন্মাদিনীর ন্যায়। মস্তকের কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে দুল্যমান, চক্ষুতারা প্রসারিত। মুখভাবে দানবী-দীপ্তির পূর্ণোচ্ছাস। রমণী চীৎকার করিয়া বলিল, "যাও গোবিন্দরাম, বিনোদপুর হইতে দূর হও। এমনই একদিন ঊষাকালে তোমাকে বুকে তুলিয়াছিলাম। আবার আজি আমিই তোমাকে পদদলিত করিয়া বিনোদপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিলাম।"

গোবিন্দরাম চকিত চাহনিতে সে মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন,—সে পান্না। কোন কথা কহিলেন না,—একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, ভীমরবে বিপক্ষের বিজয়ী সৈন্যগণ কোলাহল করিতেছে, এবং তাঁহাদের কাছারিবাড়ী পুড়িয়া পুড়িয়া অগ্নির ভীষণ শিখা তুলিয়া দিতেছিল। তিনি অশ্বকে পুনঃপুনঃ কষাঘাত করিয়া নক্ষত্রবেগে দিগন্তের কোলে মিশাইয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেলেন।

পান্না আলুলিত কুন্তল বাঁধিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়া গেল। উঠানের মাঝখানে এক তুলসীমঞ্চ ছিল, তাহার নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার বিধবা ভাতৃজায়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সারারাত্রি কোথায় ছিলে, তোমার চেহারা এমন কেন?"

পান্না বলিল,—"ঠাকুরবাড়ী শ্মশান করিতে গিয়াছিলাম। গোবিন্দরাম গিয়াছে, আর আসিবে না!"

পান্নার হিংসার আগুনপূর্ণ নয়ন ফাটিয়া জল আসিল। [illegible] বলিল, "তুমি কি কাঁদচো ঠাকুরঝি?"

পা। কেন না জয়া ; আমি কাঁদবো কেন ? যে দিন রসিক মরেছে সেই দিন কেঁদেছি।

জ। আজিও যে চোখে জল ! গোবিন্দরামও কি মরেছেন ?

পা। মরেনি, তবে আমার নিকটে মরার সমান—সে পলাইয়াছে, আর আসিবে না।

জ। তাহার সর্ব্বনাশত তুমিই করিয়াছ।

পা। কিন্তু এতদূর হবে বিশ্বাস ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, সে একটু জব্দ হবে। সে আমায় চিনিবে,—আমার অনুরোধ উপেক্ষার ফল পাইবে। হয়ত আবার আমায় সাধিবে। কিন্তু আমার গেল,—ভাই গেল, গোবিন্‌ও গেল।

দুশ্চরিত্রা রমণীর ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই বুঝি তপনদেব লোহিতবরণ পূর্ব্বদিক্‌চক্রবালে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিলেন,—পাখীরা তাঁহার আগমনী গাথা গাহিবার জন্য স্বর বিস্তার করিল, এবং প্রভাত-সমীর-সংস্পর্শে কাছারিবাড়ীর আগুন আরও ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহু-দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহগুলিকে ভস্মরাশিতে পরিণত করিতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারী বা রাজপক্ষীয় একটি লোকও আর সে প্রভাতে কাছারিতে কেহ ছিল না। যে, যেদিকে পাইয়াছে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে,—আর যাহারা মরিয়াছে, তাহারা পলায়নের যন্ত্রণায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

ঐ ঘটনার পনরদিন পরে, একদিন বেলা অবসান সময়ে গোবিন্দরাম গোষ্ঠবিহারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া সকলেই মহাদুঃখিত হইলেন।

কল্যাণীর প্রেরিত মিশ্রঠাকুর, রমানাথঠাকুর প্রভৃতি গোবিন্দরামের অপেক্ষায় বাড়ী আসিয়া বসিয়াছিল,—তাহারা সমুদয় শুনিয়া কপালে আঘাত করিল। বাড়ী আসিয়া দুই দিন পরে, গোবিন্দরাম বৃদ্ধ শিরোমণি-

ঠাকুরকে একপত্রে সমুদয় বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিয়া দিলেন, এবং তাহার নিম্নে লিখিলেন,—"ভগবান্ আমাদের উপর বিরূপ হইয়াছেন, নতুবা এমন ঘটনা হইবে কেন! বাবার উদ্ধারের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। কোন উপায়ই নাই। বর্ত্তমানে আমি অপমানের প্রতিশোধ লইতে, বিদ্রোহী প্রজাগণকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে সৈন্যসজ্জা করিতেছি। এই যুদ্ধে যদি বাঁচিয়াথাকি—পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা—এই পত্রের দ্বারাই শেষ প্রণাম! স্নেহের কল্যাণকে সকল কথা বলিবেন এবং আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আমার জীবন এক দিকে, এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়া অন্য দিকে!

কেবলমাত্র প্রজাগণকে শাসিত করিতে হইলে গোবিন্দরামকে তাদৃশ আয়োজনে ব্যস্ত হইতে হইত না। তিনি দেখিয়াছিলেন, মুসলমানসৈন্য, প্রজাগণের সহিত যোগ প্রদান করিয়াছিল। মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যশোহরের ফৌজদার, প্রজার অর্থ খাইয়া তাহাদিগকে সৈন্য সাহায্য করিয়াছেন। এবারেও যদি তাহা করেন, তবে যাহাতে সে আক্রমণ হইতেও জয় লাভ করিতে পারা যায়, তৎপক্ষে বিশিষ্ট আয়োজন করিয়া যাইতে হইবে।

পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পান্না বলিয়াছিল, সেই এ আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে—সেই গোবিন্দরামের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছে, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও গোবিন্দরাম বুঝিতে পারিলেন না যে, কি উপায়ে পান্না এতদূর ঘটাইতে পারিয়াছে।

যাহা হউক গোবিন্দরাম অতি ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব হইয়াছিল, প্রথমতঃ যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু তাহা সহজে মিলিল না। যদিও দুই একজন দিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু তিনি রাজা নহেন,—তাঁহার পিতাই রাজা, তাঁহাকে টাকা ধার দিলে আদায়

হইবে না বলিয়া, কেহ টাকা দিল না। গোবিন্দরাম তথাপি নিবৃত্ত হইলেন না,—অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। এক এক বন্দরে—এক এক গ্রামে সসৈন্যে পড়িয়া অর্থ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, এবং তাহা আনিয়া যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এখন যেখানে কালুপোল নামক গ্রাম অবস্থিত, ঠিক তাহারই পার্শ্বে যেখানে পুলিষষ্টেসন ছিল, সেইস্থানে গোবিন্দরামের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি, বারুদ এবং তরবারি, বল্লম, শড়কী প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা হইয়াছিল, এবং ভাল ভাল শিল্পিগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ঐ সকলের প্রস্তুত কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল।

নালডুগারি নামক একজন মগবীর গোষ্ঠবিহারের রাজার সেনাপতি ছিল। তাহার দীর্ঘ দেহ বিশাল বলশালী, এবং সে যুদ্ধবিদ্যায় সমধিক সাহসী ও সুনিপুণ ছিল।

গোবিন্দরামের অনুজ্ঞায় নালডুগারি যুদ্ধের আয়োজনে মনঃসংযোগ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। তখন বর্ষাকাল, নদীবহুল বঙ্গদেশে সৈন্য লইয়া স্থলপথে গমনাগমন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধনৌকা প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং বক্রগতিশালিনী মাহিসরনদী ঘুরিয়া ভৈরবীনদী বাহিয়া কপোতাক্ষীনদীতে পঁহুছিতে বহু বিলম্ব হইবে বলিয়া, নালডুগারি রাজবাড়ীর নিকট হইতে মাহিসরনদীর এক প্রকাণ্ড খাল কাটাইয়া ঐ খাল ভৈরবীনদীর সহিত যোগ করাইয়া দিলেন, এবং সেই পথে যুদ্ধ নৌকা সকল বাহির করিয়া ভৈরবীনদীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন,—এই খাল অদ্যাপিও অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া পড়িয়া আছে, ইহাকে এখনও লোকে "নালডুগারির" খাল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। রাজবাড়ীর সন্নিকটে মাহিসরের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া এখনও নালডুগারির খাল ক্ষীণাঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। অন্যত্র কোথাও বিলরূপে কোথাও জোলরূপে এবং কোথাও সমতল ভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে।

যুদ্ধের আয়োজনে গোবিন্দরাম অনেক পাতক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অনেক গ্রাম, অনেক বন্দর, অনেক ধনীর গৃহ লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া সৈন্যবল ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শনৈঃ শনৈঃ কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় এক মাসের মধ্যেই তাঁহাদের আয়োজন সমাপ্ত হইয়া গেল। নালডুগারির কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রায় দশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্য ও যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধোপকরণাদি বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় বোঝাই করিয়া লইয়া গোবিন্দরাম বিনোদপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

যাইবার সময় চঞ্চলকুমারী অনেক কাঁদিয়াছিল, অনেক প্রকারে বাধা দিয়াছিল,—কিন্তু গোবিন্দরাম সে কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের প্রতিহিংসানল তখন সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলিকে বিধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদ রেজাখাঁর অন্দরমহলে সন্ধ্যার পর হইতেই সমুজ্জ্বল আলোক-মালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া চাঁদের শুভ্র কিরণের সহিত মিশিয়া পড়িতে-ছিল। সুন্দরীগণের কনককিঙ্কিনী-নিক্কণের সহিত মধুর সান্ধ্য সঙ্গীতের তানটুকু বাতাসের বক্ষে মিশিয়া দিক্ হইতে দিগন্তরে যাইতেছিল। কোথাও নৃত্যোৎসবের সহিত সিরাজিসেবন চলিতেছিল, কোথাও বিরহগাথার সহিত হাহুতাশের পুরাতন কাহিনী এবং কোথাও বা নাগরমিলনে নাগরীর অনুরাগ-কাহিনীর আলোচনা হইতেছিল। কোথাও নাগরী নৈশ ফুল্ল কুসুমের মালা নাগরের গলায় পরাইয়া ফুলের কদর বাড়াইয়া দিতে ছিল।

ক্রমে ত্রিযামার প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়া গেল। ক্রমে গানের সুর নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল, সিরাজিপানোচ্ছ্বাসিত হৃদয়গুলি ক্রমে ক্রমে অবসাদিত হইয়া পড়িল। নিশি জাগরণে আনন্দাপ্লুত-হৃদয় প্রেমিক প্রেমিকা আবেশে অবশে ঢলিয়া পড়িল।

নেকিসাবেগম জাগরণারুণ-নয়নে সুরভিত কুসুমশয্যার উপরে প্রণয়াবিষ্ট দেহভার সংরক্ষণপূর্ব্বক কাহার আগমন-পথ চাহিয়াছিল। যাহার আসিবার কথা আছে, সে এখনও আসে নাই। প্রতি মুহূর্ত্ত

সুদীর্ঘ সময়ের ন্যায় অতিবাহিত হইতেছিল ; বাহিরের প্রতি পত্রমর্ম্মরে নেফিসা তাহার আসার আশায় চমকিয়া উঠিতেছিল।

কতক্ষণপরে যে আসিবে, সে আসিল। আগন্তুক কল্যাণসিংহ। কল্যাণসিংহ আসিয়া সুন্দরীর পুষ্পশয্যার পার্শ্বে পুষ্প সিংহাসনে উপবেশন করিল। নেফিসা কথা কহিতে পারিল না,—সে আরও একটু হেলিয়া পুষ্পশয্যার সঙ্গে মিশিল। সুগন্ধিতৈলম্রক্ষিত বর্ত্তিকালোকোজ্জ্বল প্রতি-ভাসিত নেফিসার মৃণাল-শুভ্র ললাট, তাহার উপর কুঞ্চিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ, কৃষ্ণতার খঞ্জননেত্র, আর আরক্ত বিম্ববৎ অধরোষ্ঠ দেখিয়া মনে মনে হাসিল। মনে মনে ভাবিল, এমন রূপ দেখিয়া মানুষ-পতঙ্গ মরিয়া থাকে! কিন্তু রূপের মত গুণ থাকে না কেন? রূপে-গুণে একত্র হইলে মণি কাঞ্চনের যোগ হয়।

কল্যাণসিংহ প্রথমেই কথা কহিল। মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আজি কি আর অধীনের প্রতি কৃপা নাই ; কিন্তু বিনা সংবাদে আসি নাই। তোমারই প্রেরিতা মালিনী আমাকে সংবাদ দিয়া আনিয়াছে। প্রণয়ের মূক-অবহেলা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। আজি কি আর অনুগত জনে কৃপা হইবে না? আজি কেন কথা কহিতেছ না? সে দিন আসিবামাত্র সিরাজি দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলে, আজি আর তাহারও খোঁজ নাই। সে দিন নর্ত্তকীরা দুইটা গান শুনাইয়াও তৃপ্ত করিয়াছিল, আজি তাহাও বন্ধ। আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?"

নেফিসা অলস দেহ একটু উত্তোলন করিয়া আবেশ-তরল নেত্রে কল্যাণসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি অপরাধ করিয়াছ? করিয়াছ,—আমার ইন্দ্রিয়াদির সহিত প্রাণ চুরি করিয়া লইয়াছ। আমার বলিতে আর কিছু রাখ নাই—আমার সব তুমি লইয়া গিয়াছ। কে কাহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিবে নাথ? সিরাজি? সে ত তোমার অপ্রিয়—তোমার অপ্রিয় পদার্থে আমারও প্রীতি নাই। সিরাজি আমি

পরিত্যাগ করিয়াছি—কেন করিয়াছি জান ? তুমি ভালবাস না বলিয়া। তুমি আর আমি—পৃথক্ নহি। গান বাজনা আর ভাল লাগে না,—তোমাকে কেবল দেখিব, গান বাজনা সেখানকার অন্তরায়।"

কল্যাণসিংহ মৃদু হাসিল। নেফিসাবেগম দেখিল, সে হাসি দিয়া শত চাঁদ নিঙড়ান সুধা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। নেফিসা বলিল, "আর দূরে কেন? আরও কি জ্বালাইতে—আরও কি কাঁদাইতে ইচ্ছা আছে ?"

ক। তুমি কি আমায় ভালবাস ?

নে। কেন সে কথা জিজ্ঞাসা ? যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত দেখাইতাম।

ক। ভালবাসা কি হৃদয়ের মধ্যে না বাহিরের কথায়?

নে। সে কথা কেন ? আমায় পরীক্ষা করিতেছ ?

ক। পরীক্ষা করিতেছি না—শুধাইতেছি।

নে। আমি বলিব না।

ক। কেন ?

নে। হৃদয়ের ব্যথা কথায় জানাইয়া কি করিব ? বুঝি কথায় ব্যক্ত করিলে হাল্‌কা হইয়া যায়।

ক। ভালবাসা বোধ হয় হৃদয়ের না হইয়া চোখের হইবে।

নে। চোখে কি ভালবাসা হয় ? চোখে মানুষ অনেক দেখে, অনেককেই কি ভালবাসে—যে যাহার মনের মত সে তাহার ভালবাসা।

ক। এই মনের মত হয় কেমন করিয়া জান ?

নে। না।

ক। তোমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তর নাই, আমাদের শাস্ত্রে তাহা আছে। জন্ম জন্ম হইতে যে, যেরূপ রূপের ভাবনা ও ধারণা করিয়া আসিয়াছে, তাহার তেমনই একটা রূপের ধ্যানজ প্রতিমা হৃদয়মধ্যে জন্ম জন্ম জাগিয়া

আসিতেছে। সে, সেইরূপ রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়া থাকে। পাইলে আত্মহারা হয়।

নে। লোকে কি রূপ ভাবিয়া থাকে? রূপ দেখিলেই পাগল হয়।

ক। রূপ ভাবেনা, গুণ ভাবে। গুণের সমষ্টিই রূপ হইয়া দাঁড়ায়। তুমি হয়ত কোন গুণ ভালবাস,—সেই গুণই রূপ হয়। গুণের বিকাশ বাহ্যিকরূপে।

নে। কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তোমাকে দেখিয়া আমি মরিয়াছি, কিন্তু সে তোমার রূপ দেখিয়া, গুণ বুঝিয়া নহে।

ক। রূপ দেখিয়া গুণের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে মনে উদয় হয়। আকাশে নবজলধর দেখিলেই তাহার জলবর্ষণ-গুণের কথা মনে হয়। তবে কোথাও বা বর্ষণ ব্যর্থও হইয়া থাকে। ভালবাসাও রূপ দেখিয়া মনের মত গুণের সংস্কার মনে জাগিয়া পড়ে,—তাই মানুষ, মানুষকে ভালবাসে। যেখানে সেরূপ গুণ না পায়—সেখানে প্রতারিত হয়।

নে। তোমার রূপ দেখিয়া, তোমার কি গুণ বুঝিতে পারিয়াছি।

ক। তুমি হয়ত বাহিরে বিচার কর নাই। কিন্তু তোমার ইন্দ্রিয়-পথে তোমাতে যে তুমি আছ, সে সূক্ষ্মভাবে তাহার একটা বিচার করিয়া লইয়াছে। আমিও তোমার রূপ দেখিয়াছি—ইন্দ্রিয়-পথে আমার আমিও সে গুণের বিচার আমার অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে সূক্ষ্মভাবে করিয়াছে। তোমার ঐ ঢল ঢল নয়ন দেখিয়া বুঝিয়াছি—অমন চোখে সুধা আছে। ঐ বক্ষঃ—ওখানে বুঝি প্রাণের আবেগ মিটিয়া থাকে।

নে। এমন হয়ত সকলেই ভাবে।

ক। ভাবে, কিন্তু হয়ত আমি যেমন ভাবি, অন্যে তেমন ভাবে না। অন্যে বাহিরে ভাবে—আমি অন্তরে ভাবি। তাই তাহারা রূপভোগে ইচ্ছুক, আর আমি চাই অন্তর। তারা ভাসে, আমি ডুবি।

নে। তবে হয়ত আমি তোমাকে ভালবাসিয়াও সুখ না পাইতে পারি?

ক। নিশ্চয়। হয়ত উপরের রূপ--তোমার ত্বক্ স্পর্শ নাও করিতে পারে!

নে। তবে ভালবাসা না বাসা মানুষের ইচ্ছাধীন নহে? যদি তাহা না হয়, তবে তোমাদের হিন্দুদের মহাভুল।

ক। কি ভুল?

নে। হিন্দুদের একটির উপর আর বিবাহ করিতে নাই। প্রথমে যাহার সহিত বিবাহ হইল, তাহাকে যদি সে ভালবাসিতে না পারে, তবে যখন তাহার দোষ নাই—তখন কেন অন্যকে—তাহার মনের মত লোককে বিবাহ করিতে দেয় না?

ক। উহা হিন্দুদের ভুল নহে। উহাই হিন্দুদের মহত্ব।

নে। কেন?

ক। বলিতেছি শোন। মানুষ ইচ্ছা করিলে, ইচ্ছাশক্তির বলে সমস্ত প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। কেবল মানুষ নহে—সমস্ত জীব-জগতেই ঐ নিয়ম। কাচপোকায় তেলাপোকা ধরে জান? তেলাপোকা কাচপোকাকে ভাবে—আর কাচপোকা তেলাপোকাকে নিজের মত করিবে বলিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করে,—তাই তেলাপোকা কাচপোকা হইয়া যায়। হিন্দুস্ত্রীর একই গতি। হিন্দুশাস্ত্র বলে স্বামী দেবতা—স্বামিভিন্ন অন্য পুরুষের ছায়াদর্শনেও মহাপাতক; অন্যের কথা শ্রবণেও অনন্ত নরক। তাই হিন্দু রমণী প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভাবে। সে যে যে গুণ ভালবাসে, তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাবলে তাহার স্বামীর সেই সেই গুণ জন্মিয়া থাকে—তাহার স্বামীও তাহার ভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। কাজেই হিন্দুর স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন দেহী হইয়াও একাত্মা হইয়া যায়। পুরুষান্তরের ভাবনায় আর তাহার প্রয়োজন হয় না। যাহাকে সে পাইয়াছে, তাহাতে যাহা ছিল না, ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাবলে হিন্দুনারী তাহা করিয়া লয়। পরের বাগানে গোলাপের গন্ধ লইতে না গিয়া নিজের উদ্যানে গোলাপ ফুটাইয়া লয়।

নে। মুসলমান রমণীগণ কি তাহা পারে না?

ক। কেন পারিবে না? মানুষ সবই সমান। উপদেশ পাইলে সকলেই সমান হয়। তুমি যদি তোমার স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভাবিতে পার, আর তোমার মনের মত করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা কর—তবে দেখিবে তোমার স্বামী তোমার হৃদয়হারী হইবে। কিন্তু আমাকে একটি কাষ্ঠখণ্ড ভাবিবে—কদাচ মানুষ বলিয়া মনে করিবে না।

নে। স্বামীকে ভুলিলে কি হয়?

ক। আমাদের শাস্ত্রমতে অনন্ত নরক হয়।

নে। কেন হয়?

ক। কেন হয়, শোন। প্রাণ, প্রাণ খোঁজে। প্রাণ বায়ুরূপ, ধন-রত্নাদি কিছুই লইয়া তৃপ্তি লাভ করে না। প্রাণ পাইতে হইলে আত্মপ্রাণের সংযম আবশ্যক। তাই একটি প্রাণের চরণতলে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাবলে সেই একটি প্রাণকে আপন প্রাণের রক্ষক কলাইয়া, দু'টিতে এক করিতে হয়। সংযম ব্যাপারটা বড় কঠিন,—ইহাকে আমাদের ভাষায় প্রেম বলা হয়। প্রেমে আর ধ্যানে কোন প্রভেদ নাই। অতএব, ধ্যান না করিলে প্রাণ মিলে না।

নে। কেবল স্বামীকে ধ্যান না করিয়া মানুষ যদি অন্যকে ধ্যান করে, তবে কি তাহাকে অর্থাৎ তাহার প্রাণকে প্রাপ্ত হয় না? স্বামীতেত আর কোন দৈবীশক্তি বাঁধা থাকে না? গোটাকতক শাস্ত্রের বা কোরা-ণের বন্দেদে আর এমন কি আছে?

ক। আছে বৈ কি। প্রথমতঃ যাহার সহিত বিবাহ হয়, প্রাণের সংস্কারবলে পরজন্মেও তাহারই সহিত বিবাহ হয়। ইহাই ধ্যানের মাহাত্ম্য। যদি প্রেম না হয়, তবে তাহা হয় না বটে, কিন্তু প্রতি জন্মে স্বজনের জন্য প্রাণ বিকলিত হইয়া পড়ে—প্রাণ দিশেহারা হইয়া পড়ে।

প্রেমের টানে, সংস্কারের বলে, মানুষের জন্ম হইতে জন্মান্তরে একই স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়।

নে। এমনও ত হইতে পারে যে, বিবাহের সময় পিতা মাতায় সে শুভমিলন করিয়া দিতে পারে নাই,—তারপরে, প্রাণে প্রাণ খুঁজিয়া লইল ?

ক। সে খোঁজ আপনিই পায়। জগতে কয়টা কাজ মানুষের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় ? ছাঁদলাতলা হইতে বর ফিরিয়া গিয়াছে, এমন কি শোন নাই ?

নে। তা শুনিয়াছি, কিন্তু স্বামী যদি মনের মত না হয়, তবে রমণী আপনার মনের মত মানুষ খুঁজিয়া লইয়া তাহার চরণে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রেমের সাধনা করিলেও ত পারে ?

ক। মনের মত মানুষ সকলেই। বহিরাচরণটাত মানুষ নহে ;—মানুষ ভিতরে। তাহাকে যেরূপে সাধনা করিবে, সেইরূপেই পাইবে। এই আমাকে কি তুমি মনের মত পুরুষ বলিয়া ভাবিয়াছ ?

নে। নিশ্চয়ই। তোমার জন্য আমি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারি।

ক। আর তোমার স্বামীর জন্য ?

নে। কিছু না।

ক। তাহাতে আমাতে প্রভেদ কি ?

নে। তা জানি না,—তবু তোমাকে ভালবাসি। আমার বোধহয়, তোমার ওষ্ঠে যে সুধা আছে, তাহা আমার স্বামীতে নাই।

ক। সরিয়া আইস,—সে সুধা তোমার ওষ্ঠে ঢালিয়া দেই।

নেফিসার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল,—তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যের খনি মুখখানি অগ্রসর করিল। কল্যাণসিংহ তাহার পক্কবিম্ব-অধর-যুগল নেফিসাবেগমের পক্কবিম্ব-অধর-যুগলে সংস্থাপন করিল।

প্রেমের আবেশে নেফিসার অবসাদ ঘটিল,—আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নযুগল মুদিত হইল. শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল।

কল্যাণসিংহ মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কি বোধ হইল?"

নেফিসা বেগম প্রেমাকুলিত নয়নে কল্যাণসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি বোধ হইল? কোন বোধই হইল না। তোমার চুম্বনে আমি আত্মহারা হই।"

ক। তোমার স্বামীর চেয়ে আমায় ভালবাস?

নে। বলিয়া কি জানাইব?

ক। আমার সহিত চলিয়া যাইবে?

নে। কোথায়?

ক। আমি যেখানে যাইব।

নে। আমিত আগেই সে কথা বলিয়া ছিলাম,—আমি যাইতে এখনই স্বীকৃত আছি।

ক! কেন যাইবে?

নে। তোমায় ভালবাসি বলিয়া।

ক। কেন ভালবাস?

নে। জানি না, কেন ভালবাসি।

ক। ভালবাসার মোহে। সকল জিনিষেরই দুই পিঠ আছে। ভালবাসারও তা আছে। এক পিঠ মোহ,—আর এক পিঠ জ্ঞান। আমার তোমার ভালবাসা সেই মোহ। তুমি কোন বিচার করিয়া দেখ নাই। ভালবাসিয়াছ, কিন্তু মেয়ে মরদ দেখ নাই। কেবল তুমি নহ,— অনেকেই এইরূপে প্রতারিত হয়।

নে। তোমায় ভালবাসিয়া কি আমি প্রতারিত হইয়াছি?

ক। হাঁ।

নে। কেন?

ক। আমি মেয়েমানুষ।

নেফিসা হাসিল। কল্যাণসিংহ বলিল,—"যথার্থ ই।"

নেফিসা তথাপি বিশ্বাস করিল না। এবার কল্যাণসিংহ কল্যাণী হইল। তাহার মস্তকের প্রকাণ্ড পাকড়ী খুলিয়া দীর্ঘ চুলের রাশি ঝুলাইয়া দিল। গায়ের অঙ্গরাখা পরিত্যাগ করিল,—সমুন্নত ঘন পীন বক্ষঃ বাহির হইল,—মালকোচ্চা দেওয়া রেশমবিনির্ম্মিত উপরের বস্ত্র পরিত্যাগ করিল, নিম্নের চিকণশাড়ী দেখা দিল। নেফিসাবেগম সে রূপ দেখিয়া অবাক্ হইল। কল্যাণী ফুল্লাধরে মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেগমসাহেবা; সরিয়া আইস, তোমার রক্তওষ্ঠে আর একটি চুম্বন করি।"

নেফিসা সরিয়া আসিল না। সে নির্ব্বাক্। কল্যাণী পুনরপি বলিল, "নেফিসাবেগম; আশ্চার্য্য হইও না। জগৎটা এমনই বাহিরের সাজে মুগ্ধ; ভিতরে কি আছে, দেখিয়া কেহ মজে না। উপরের সাজ দেখিয়া, উপরের চাকচিক্য দেখিয়া মজে—তারপরে মরে। বাহির দেখিয়া মাগী মিন্‌সে যখন চেনা যায় না, তখন সদসৎ চিনিবে কি প্রকারে? আরও কথা এই যে, ভিতরে সকলেই এক। প্রাণ, প্রাণ চায়—একে আর এক হইতে চায়। তাহার সাধনা প্রেম। প্রেমত ধ্যান। ধ্যান যোগ-লব্ধ ফল। যোগের অর্থ চিত্ত একমুখী করা। যারে তারে মন সঁপিলে,—যারে তারে ভাল বাসিলে চিত্তের একাগ্রতা বিনষ্ট করিলে, কখনই সে সাধনা হয় না। চিত্ত একমুখী না হইলে ধ্যান আসে না; ধ্যান ভিন্নও প্রেম মিলে না।

নেফিসা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় উদাসতরল নেত্রে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অদূররক্ষিত বীণাটি টানিয়া লইয়া, তাহার তারে আঘাত করিয়া কল্যাণী গাহিল,—

প্রাণে প্রাণ মিলাইলে সই তাহাকে প্রেম বলে,
প্রাণের সাধন প্রাণের বাঁধন প্রাণ সমর্পণ পদমূলে।
প্রেম যদি করিতে চাও
প্রেম খানি সই কুড়িয়ে নাও
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বাহ্য বিকার যাও ভুলে।
জীবন যৌবন দেহ
পরাণ পরাণ-গেহ
সুখ দুঃখ আশা-বাসা স'পিবে একই মূলে।
তারি ধ্যান তাহারি জ্ঞান,
সে রাগিণী প্রাণের তান
তাহারি মাঝাতে বাস, বিলীন তাহারি তলে।
তারি দরশ পরশ তরে
দীর্ঘ মাস বরষ ধরে
চাহিয়া থাকিবে কাতরে সারাটি জগত ভুলে।
প্রাণ দিলে না নিতে চেলে
ভাবতে নাই তায় ক্ষতি ব'লে,
লহ লহ লহ ব'লে শুধু দিয়ে সুখী হবে সে চরণ তলে।

গানের সুরের মূর্চ্ছনাগুলি একে একে নেকিসা বেগমের প্রাণের কাণে গিয়া মিশ্রিত হইতে লাগিল। গানের অবসান হইল,—নেফিসা বেগম বলিল,—"তুমি মানুষ না বেহেস্তার পয়গম্বর? আমি তোমাকে বুঝিতে পারিতেছি না!"

কল্যাণী হাসিয়া বলিল,—"আমি মানুষ। আমি রমণী; কিন্তু তুমি কি আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ? তোমার কি রূপের মোহ ভাঙ্গিয়াছে?"

নে। মোহ ভাঙ্গিয়াছে,—কিন্তু বুঝিতে পারি নাই—তুমি যাহা

বলিয়াছ,হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার খসম—আমার পীর বা পয়গম্বর। আমি তাঁহাকেই কি ভাবিব?

ক। তাঁহাকেই ভাবিবে। তিনিই তোমার প্রেমের আধার। তিনি ভাল না বাসুন,—তুমি ভালবাসিও। ভালবাসা পাইলে সুখ নাই, ভালবাসিয়াই সুখ। ভালবাস—সুখী হইবে।

নে। তোমার নিকট দীক্ষিত হইলাম—জীবনে মরণে স্বামী দেবতা। তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইব। কিন্তু যে মহাপাতক করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

ক। কি পাতক?

নে। তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম।

ক। (হাসিয়া) আন্বিত রমণী। কিন্তু স্মরণ থাকে—আমার মত সাজ দেখিয়া আর মুগ্ধ হইও না। সকলেই আমার মত সাজে সাজিয়া আছে।

নে। তুমি আবার কবে আসিবে?

ক। আর কেন আসিব?

নে। আমাকে শিক্ষা দিবে। আমি তোমার শিষ্যা।

ক। তবে আসিব। সময় পাইলে আসিব। কিন্তু আসিব কি প্রকারে? এত লুকোচুরীতে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

নে। আমার পাঞ্জা তোমার কাছে থাক। তুমি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের বেশে দিবসে আসিও। তবে রূপটা একটু ঢাকিয়া আসিও।

ক। তাই হবে। আজ তবে বিদায়।

নেকিসা আর কোন কথা কহিল না। কল্যাণী আবার কল্যাণ সিংহ হইয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নের আকাশে সূর্য্যদেব বসিয়া একান্ত মনে কর বর্ষণ করিতে-ছিলেন। শারদীয় আকাশের এককোণ হইতে একখানা মেঘ গড়াইতে গড়াইতে সূর্য্যদেবের দিকে সরিয়া আসিতেছিল। শরদ্রৌদ্র বর্ষাসিক্ত ধরণীর বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক বেদনাতপ্ত উষ্ণশ্বাস তুলিয়া দিতেছিল।

রেজাখাঁর কারাগারে আবদ্ধ সমস্ত নৃপতিবৃন্দই বাকিরাজস্ব সম্পূর্ণ-ভাবে পরিশোধ করিয়া দিতে অপারগ হইয়াছেন। কড়ারের উপর কড়ার—উৎকোচের উপর উৎকোচ,—কিন্তু দিল্লিতে রাজস্ব পাঠাইবার সময় উপস্থিত; নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রেজাখাঁর উপরে রাজস্ব আদায়ের জন্য আরও কড়া তাগাদা করিলেন। প্রজ্জলিত বহ্নিতে আজ্যাহুতি পড়িল,—অত্যাচারী রেজা খাঁ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইল। "বৈকুণ্ঠ" নামক পুতিগন্ধপূর্ণ পঙ্কিল হ্রদে বহুল শিঙ্গী মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল,—উদ্দেশ্য শিঙ্গী মৎস্যগণ তাহাদের বিষাক্ত কাঁটায় হতভাগ্য জমিদারগণের দেহ দংশন করিয়া ভীষণ যন্ত্রণা উৎপাদন করিবে। তার পরে জমিদারগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ-অবস্থায় সেই সকল হ্রদ মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইতে লাগিল। দংশনজ্বালায় অস্থির হইয়া সুখপালিত রাজন্যবর্গ মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পুতিগন্ধময় হ্রদ

মধ্যে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন,—তখন আঘাতপ্রাপ্ত মৎস্যেরা সজোরে মুখে চোখে নাকে—সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ দংশন করিতে লাগিল।

কাহাকেও বা দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে উলঙ্গ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান করাইয়া বেত্রদণ্ডে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও সম্পূর্ণরূপে হতচৈতন্য করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে জগৎ যখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সেই সময় কল্যাণসিংহ ও নদিয়াধিপতির পুত্র রঘুরাম রায় রেজাখাঁর প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠের প্রাচীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুই জনমাত্র সিপাহী ছিল।

উভয়ে সে স্থানে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে সে খানে তাঁহাদিগের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। তখন গোষ্ঠবিহারাধিপতি দুর্গন্ধময়-পঙ্কলেপিত অঙ্গে বৈকুণ্ঠের তীরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন,—নাক মুখ দিয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। আর নদিয়াধিপতি রাজা রামজীবনের পদ-দ্বয় উর্দ্ধ দিকে বন্ধন ও হেটমুণ্ডে প্রলম্বিত করিয়া বেত্রাঘাতে সে কোমলদেহ ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। বেতের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্ম ও মাংস বাধিয়া আসিতেছিল,—রক্তধারা দরদরিত স্রোতে বহিতেছিল। বোধ হইল, তিনি সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। আরও তাহাদের অপরিচিত বহুল জমিদার ঐরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছিলেন। সেই সময় চারি পাঁচজন জমিদার কারাগার হইতে নূতন আনীত হইল। তাঁহাদের চক্ষুদিয়া প্রবলবেগে যাতনার অশ্রু বিগলিত হইতেছিল,—কাতর-চীৎকারে বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই নবাব সাহেবের, আমরা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, রত্ন কিছুই চাহি না। আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও —আমরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিব। তোমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নাও। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।"

কিন্তু কেহ তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। কেহ তাহাদিগের

চক্ষুর জল দেখিল না, কেহ তাহাদিগের যাতনার বিভীষিকা বুঝিল না। সিপাহীগণ তাহাদিগকে ধরিয়া কৈকুণ্ঠে নামাইয়া দিল। হতভাগ্যগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং সিপাহীগণ হা হা করিয়া উচ্চহাস্য পূর্ব্বক সমবেদনা জানাইল।

কল্যাণসিংহ রঘুরামের মুখেরদিকে যাতনার অনলচাহনীতে চাহিয়া বলিল,—"পিতৃহত্যা দেখিয়া আর কি করিব, চল বাহিরে যাই।"

রঘুরামও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোঁচার কাপড়ে চক্ষুরজল মুছিয়া বলিলেন,—"হাঁ। চল যাই।"

ক। এমন যন্ত্রণা বোধহয় কোন দেশের কোন মানুষ মানুষের উপর দেয় না? এখন কি করিব?

র। করিবার আর কি আছে?

ক। আছে আত্মবলিদান।

র। তাহাতে লাভ?

ক। এ যাতনা দেখিতে হয় না।

র। অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

ক। কেন?

র। বিনা কারণে দণ্ডিত হইতে হইবে।

ক। এত অত্যাচারেও মুখ ফুটিবার যো নাই—ধন্য রাজা, ধন্য দেশ! রাজপুত্র; আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।

র। চল বাহিরে যাই।

তখন উভয়ে তোরণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে কল্যাণসিংহ রঘুরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার কি কোন উপায় নাই?"

র। তুমি বড় অর্ব্বাচীন।

ক। তোমরা সমাচীন হইয়াই বা কি করিতেছ? এত করিয়া

মুসলমানের পদলেহন করিতেছ, এত করিয়া অত্যাচারীর স্তবস্তুতি করিতেছ, এত করিয়া অবিচারীর চরণযুগলে অশ্রুরাশি ঢালিয়া দিতেছ, কিন্তু তাহার একটু করুণাও কি প্রাপ্ত হইতেছ?

রাঘুরাম সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। বোধ হইল, তিনি তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলেন।

তারপরে যে যাহার বাসায় চলিয়া গেলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে নদিয়াধিপতির বাসা বাড়িতে সমগ্র বন্দীরাজগণের মোক্তার ও কর্ম্মচারিবর্গ একত্রীভূত হইয়া কিপ্রকারে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেহ বলিলেন,—"সকলে মিলিয়া এই সকল পাশবীয় অত্যাচারের কাহিনী লিখিয়া এক দরখাস্ত দিল্লির বাদসাহের নিকট প্রেরণ করা হউক।"

কেহ বলিলেন,—"দরখাস্তে কোন ফল হইবে না। ইহার পূর্ব্বেও পুনঃপুনঃ দরখাস্ত করিয়া দেখা হইয়াছে,—কোন ফল হয় নাই। প্রত্যেক ভূস্বামীর পক্ষ হইতে এক একজন করিয়া লোক একত্র হইয়া দিল্লির দরবারে গমন করুন। তাঁহারা বাদসাহের নিকট সমস্ত অত্যাচারের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া বলুন;—প্রতীকারের সম্ভাবনা হইতে পারে।"

কল্যাণসিংহ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্বলিতকণ্ঠের জ্বলন্ত ভাষায় গদ্গদকণ্ঠে বলিল,—"মুসলমানেরা সেই সুদূর প্রদেশ হইতে এদেশে নিষ্কাম ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আইসে নাই। আসিয়াছে, অর্থশোষণ করিতে। যে অত্যাচারী, সে বলিতেছে বঙ্গদেশের জমিদারগণ আপনার প্রাপ্য অর্থ দেয় না,—ইচ্ছা করিয়াই দেয় না; তাই আমি একটু কড়াভাবে আদায়ের চেষ্টা করিতেছি—নিষেধ করেন, আর সে চেষ্টা করিব না। কিন্তু তাহা হইলে আপনার প্রাপ্য রাজস্ব আদায় হইবে না। আর আমরা বলিব, টাকা আমরা দিব—কিন্তু রাহিয়া সহিয়া টাকা দিব, এককালে কখনই দিতে পারিব না। যাহারা বিদেশী—অর্থ

গ্রহণই যাহাদের রাজত্বের উদ্দেশ্য, তাহারা কাহার কথা শুনিবে? যারা টাকা চায়, তারা যাতে টাকা আদায় হয়, তাহারই চেষ্টা করিবে। বড় জোর না হয়, মুখে একবার বলিয়া দিবে,—তোমরা টাকা মিটাইয়া দাও গে, আর অত্যাচার হইবে না। বিশেষতঃ দিল্লী লোক যাতায়াত করিতে করিতে আমাদের পিতা—আমাদের প্রভুগণ জীবিত থাকিবেন না। এতদবস্থায় আপনাদের যুক্তি ও পরামর্শ কোন কার্য্যকরই হইবে না।"

সকলেরই বিস্মিত চাহনীর আকুল-কটাক্ষ কল্যাণসিংহের মুখের উপর পতিত হইল। একজন বলিলেন,—"তবে কি উপায় নাই?"

ক্ষীণকণ্ঠের গম্ভীরস্বরে কল্যাণসিংহ বলিল,—"আছে, উপায় আছে। ছেলে যদি বসিয়া বসিয়া কেবলই কাঁদে, মাতা তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া ক্রন্দন নিবারণের চেষ্টা করেন, আর সে যদি একটু উগ্রমূর্ত্তি ধরে, কতক জিনিষ ভাঙ্গে—কতক জিনিষ ফেলে, তবে 'দুরন্ত ছেলেকে পারা যায় না, বলিয়া তাহার প্রার্থিত বস্তু দান করিয়া একটা রফা করিয়া ফেলেন। কেবল চোখের জলে কাজ হইবে না।"

যিনি কথা কহিয়াছিলেন, তিনি নলদী পরগণার জমিদারের নায়েব। নায়েবমহাশয় বলিলেন,—"সে পথ রুদ্ধ।"

ক। কেন?

না। বঙ্গদেশের প্রায় জমিদারগণই রাজস্বের দায়ে কারাগারে আবদ্ধ। এখন আমরা যদি বিদ্রোহী হই, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

ক। সে উপায় আমি করিব।

না। আপনি করিবেন! কি উপায় করিবেন?

ক। আপনাদের সম্মতি পাইলে আমি এই রাত্রেই সমস্ত ভূস্বামিগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া লইতে পারি। কিন্তু শেষ রক্ষার উপায় করিতে হয় আপনাদিগকে।

বিস্ময়-চকিত নয়নে সকলেই কল্যাণসিংহের মুখেরদিকে পুনঃপুনঃ

চাহিতে লাগিলেন। নায়েবমহাশয় বলিলেন,—"আপনি কি প্রকারে সকলকে মুক্ত করিতে পারেন ?"

ক। সে কথা জানিবার আপনাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, তাহা করিবার জন্য যদি সকলে ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারেন, আমি মুক্তকরিয়া আনিতে পারি।

না। সে কার্য্য কি ?

ক। আমরা এদেশী—সৈন্যবল, প্রজাবল, খাদ্যদ্রব্যবল, সবই আমাদের হাতে। যদি সমগ্র বঙ্গের ভূস্বামিগণ একত্রে অস্ত্রধারণ করেন, মুষ্টিমেয় মুসলমানে আমাদের কি করিতে পারে ?

সমবেত লোকমণ্ডলী বলিয়া উঠিলেন,—"যুবক ; চুপকর চুপকর। যদি একথা নবাবের কাণে উঠে, কাহারও প্রাণ থাকিবে না।"

কল্যাণসিংহ বলিল,—"প্রাণ থাকিয়া কি হইবে ? যাহাদের পিতা পাপের অত্যাচারের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত, যাদের ধন, মান, প্রাণ সবই অত্যাচারের আগুণে দগ্ধ—তাদের প্রাণে কি কাজ ?

তখন যতগুলি লোক সেখানে বসিয়াছিলেন, পরস্পর পরস্পরের সহিত ব্যস্তভাবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তারপর, একে একে উঠিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রঘুরাম কল্যাণসিংহের মুখেরদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ্লে ভায়া, তোমার মত পাগল, আর একটি খুঁজিয়া মিলিল না।"

ছলছল নেত্রে কল্যাণসিংহ বলিল,—বাঙ্গলা দেশ এমন না হইলে এক ক্রীতদাস এতদূর করিতে পারে !"

নদিয়াধিপতির দেওয়ান বলিলেন,—"যখন বঙ্গদেশে জন্মিয়াছ, তখন অত্যাচার সহ্য করিতে শিক্ষা কর। বর্ত্তমান বঙ্গবাসীর জন্য বুঝি বিধিলিপিই ইহাই।"

কল্যাণসিংহ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণসিংহ বাসাবাড়ীতে আগমন করিয়া শিরোমণিঠাকুরকে ডাকিয়া লইয়া একটা নিভৃত প্রকোষ্ঠে গমন করিল। সেখানে গিয়া বলিল,—"ঠাকুরদা; আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, ঠাকুরুণদিদি তোমার বিরহে শাপান্তগমিত মহিম-শিশির-মথিতা পদ্মিনীর ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন, অতএব তুমি গোষ্ঠবিহারে ফিরিয়া যাও।"

স্বর কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়ায় শিরোমণিঠাকুর তাহা শুনিয়া মৃদু হাসিলেন। অথচ সেই হাসিতে বিস্ময়ের একটা বিদ্যুচ্ছটার বিকাশ হইল। তিনি বলিলেন,—"হঠাৎ ঠাকুরুণদিদির ভাবনায় এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলে কেন?"

ক। আমি এক কাজ করিব।

শি। কি?

ক। বাবাকে উদ্ধার করিব। সন্তান হইয়া পিতার যন্ত্রণা আর দেখিতে পারি না।

শি। তদর্থে কি করিবে?

ক। নেফিসাবেগমের মাতামহদত্ত পাঞ্জা আমার নিকটে আছে, তদ্দ্বারাই পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পারিব।

শি। তারপরে?

ক। তারপরে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।

শি। অদৃষ্ট বড় অধিক দূর যাইতে দিবে না। পথেই নবাবের ফৌজ গিয়া দর্শন দিবে, এবং উভয়কে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবে। না হয়, বড় জোর গোষ্ঠবিহার পর্য্যন্ত পঁহুছিবে—তারপরে নবাবের ফৌজ গিয়া রাজবাড়ী সমেত মাহিসরনদীতে ভাসাইয়া দিবে।

ক। আমি বাবাকে লইয়া আপাততঃ সে দিকে যাইব না।

শি। কোথায় যাইবে?

ক। সে বিবেচনা আমি করিব,—এক্ষণে তোমরা বাসা ছাড়িয়া এই রাত্রেই পলায়ন কর। কারণ, আগামী কল্য সকালেই বাসাবাড়ীতে নবাবের ফৌজ আসিয়া পড়িবে,—তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

শি। শোন ভাই; স্ত্রীলোক বড় বুদ্ধিমতী হইলেও—সে বুদ্ধির গাড়তা কম। শাস্ত্রে সেই জন্যই বলিয়াছে—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। একটু ভেবে-চিন্তে কাজ কর।

ক। আমি ভেবে-চিন্তে অনেক দেখেছি,—এখন বুঝি প্রলয়েরই প্রয়োজন। আর কিছু ভাবিব না,—আর কিছু চিন্তাকরিব না। তুমি, বামা, রমানাথঠাকুর ও অন্যান্য লোকজন লইয়া পলায়ন কর। মোক্তারকেও সরিয়া পড়িতে বল,—আমি বাবাকে উদ্ধার করিতে এখনই যাইব।

শিরোমণিঠাকুর কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"আমরা পলায়ন করিলেই নিস্তার পাইব, বোধ হয় না। কিন্তু সে জন্য ভাবি না,—ভাবি এই জন্য যে, চারিদিক দিয়া বিপদ ঘনাইয়া আসিল!"

দর্পিতা সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া কল্যাণী বলিল,—"বাবা আমরা প্রহারের জ্বালায় অজ্ঞান,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গদিয়া রুধিরধারা বাহির হইতেছে—স্বচক্ষে সেই পিতৃরক্ত দেখিয়াও বিপদ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব! এই চলিলাম,—মা কালী, যাহা করিবেন তাহাই ঘটিবে।"

কল্যাণী সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। যে গৃহে সে প্রবেশ করিল, উহাই তাহার নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তরে একখানি খুব বড় আয়না গৃহ-দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। কল্যাণী পালঙ্কের নিম্ন হইতে একটা কাপড়ের পুঁটুলী টানিয়া দর্পনের নিকটে আগমন করিল। নিজের পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই পুঁটুলী খুলিয়া পুঁটুলীর মধ্যস্থ বস্ত্রাদি বাহির করিয়া একে একে সে সমুদয় পরিধান করিল। তারপরে দর্পণের নিকটে দাঁড়াইয়া নিজ প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। মনে মনে বলিল,—"বা, দিব্যি মুসলমান পদাতিক সাজিয়াছি।"

তদনন্তর উর্দ্ধনত যুক্তকরে আকাসেরদিকে চাহিয়া ডাকিল,—"মা কালী! হে হরি! পিতৃ-রক্ত দর্শন করিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছি। কোন বিষয় ভাবিবার, চিন্তিবার ক্ষমতা নাই, ভাল মন্দ জ্ঞান নাই। যে কাজে ঝাপ দিতেছি, সে বড ভয়ানক—তোমরাই বিপদের বন্ধু—অত্যাচারিতের সহায়। আমার পিতার সহায় হও,—আমার কার্য্যের সহায় হও।

কল্যাণীর নীলপদ্মের মত চক্ষুদিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। তারপরে সে একখানা কাগজ ও পাঞ্জা হাতে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল।

তখন গভীর রাত্রি,—সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ; কেবল নিশাবিহারী দুই একজন মনুষ্য আর পাহারাওয়ালাদিগের হুহুঙ্কারধ্বনি ব্যতীত রাজপথে কিছুই ছিল না।

কল্যাণী নির্ভীক হৃদয়ে রেজাখাঁর কারাগার-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন একজন ভীমকায় কাফ্রী প্রহরী মস্ত একটা সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া ভীম দুর্গ-দ্বারের সম্মুখে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল।

কল্যাণসিংহ তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল,—"জেল দারোগার সঙ্গে

সাক্ষাতের প্রয়োজন, তাঁহাকে সংবাদ দাও। জরুরি সরকারি কাজ আছে।"

মুসলমান পদাতিকের পোষাক পরিহিত দেখিয়া প্রহরী গম্ভীরস্বরে বলিল,—"এত রাত্রে ?"

ক। বিশেষ জরুরি কাজ।

প্র। কি কাজ, শুনিতে পাই না ?

ক। তুমি কি শুনিবে ? তাঁহাকে ডাকাও।

দরোজার ভিতর পার্শ্বে একটা দড়ি টাঙ্গান ছিল, প্রহরী তাহা ধরিয়া পুনঃপুনঃ টানিতে লাগিল, এবং ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই একজন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"খবর কি ?"

প্রহরী কল্যাণীকে দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"কি বলে শোন।"

কল্যাণী বলিল,—"আমি মহম্মদ রেজাখাঁর ভৃত্য। জেলদারোগার নিকটে প্রয়োজন আছে, এখনই সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

যে আসিয়াছিল, সে কারাধ্যক্ষের ভৃত্য। ভৃত্য বলিল,—"তুমি যে খাঁসাহেবের নিকট হইতে আসিতেছ, তাহার প্রমাণ ?"

কল্যাণী পাঞ্জা বাহির করিয়া দেখাইল। দুর্গদ্বার-বিলম্বিত উজ্জ্বলালোকে সে পাঞ্জা দেখিয়া ভৃত্য কুর্ণিস্ করিয়া ফিরিয়া গেল, এবং অচিরেই কারাধ্যক্ষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কল্যাণী বলিল,—"আমি রেজাখাঁর নিকট হইতে আসিয়াছি।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"তা শুনিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া যে পাঞ্জা আমার ভৃত্যকে দেখাইয়াছিলেন, আমাকে একবার দেখান।"

কল্যাণী পাঞ্জা দেখাইল। পাঞ্জা দেখিয়া কারাধ্যক্ষ কুর্ণিস্ করিয়া বলিল,—"গোলামের উপর কি আদেশ ?"

কল্যাণী একখানা পার্সীতে লেখা কাগজ কারাধ্যক্ষের হাতে দিল। কারাধ্যক্ষ তাহা পাঠ করিয়া বলিল,—"এই রাত্রেই ?"

ক। এখনই—এই মুহূর্ত্তেই।

কারাধ্যক্ষ কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং গোষ্ঠবিহারের রাজাকে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া বাহিরে আনয়ন করিলেন।

কথা কহিতে গিয়া কল্যাণীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল,—চক্ষুতে জল পূর্ণ হইল। অতি কষ্টে চক্ষুর জল চক্ষুতে মারিয়া, গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"মহাশয়; আপনি হাঁটিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন কি ?"

রাজা কম্পিত কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"না, আমার দাঁড়াইবার ক্ষমতাও নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—শরীরে শক্তিমাত্র নাই। আ'জ যে প্রহার খাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইয়াছি—তাহাতে বুঝি মৃত্যু আমার সন্নিকট। কেন, আমাকে আবার গঙ্গাতীরে লওয়া হইবে কেন ?"

ধরা গলায় ভরা আওয়াজে কল্যাণী বলিল,—"খাঁ সাহেবের হুকুম।"

রা। তা ভাল। গঙ্গাজলে বোধ হয় ডুবাইয়া মারা হইবে। খাঁ সাহেবের জয় হউক,—নরকে ডুবাইয়া না মারিয়া গঙ্গাজলে ডুবাইয়া মারিবার সংকল্প করিয়াছেন, তিনি সুখে থাকুন।

কল্যাণী কারাধ্যক্ষের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"পত্রে বোধ হয় আদেশ আছে যে, আমি যে কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করিব, তাহা আপনি পূর্ণ করিবেন।"

দা। হাঁ, সাধ্যমত করিব।

ক। ইহাঁকে গঙ্গা পর্য্যন্ত পঁহুছিবার উপায় করিয়া দিন।

দা। এত রাত্রে সে সম্বন্ধে কি করিব।

ক। কারাগারের একা আছে।

দা। কিন্তু সহিস ও চালক নিদ্রিত।

ক। নিদ্রাভঙ্গে দোষ হইবে কি ?

জেলদারোগা অপ্রতিভ হইয়া গাড়ীচালককে ডাকিয়া দিবার জন্ত

আদেশ করিলেন। চালক গাড়ী লইয়া আসিয়া দারোজার নিকট দাঁড়াইল। কল্যাণী রাজাকে উঠাইয়া লইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিয়া গেল।

জেল-দারোগা উহাদিগের কার্য্য পরিদর্শন জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন, উহাদিগের কার্য্যে বাধা দিও না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া দেখিয়া আসিবে—কোথায় যায় এবং কি করে।

এদিকে গাড়ী গিয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। সেখানে একখানি ছিপ অপেক্ষা করিতেছিল। রাজাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া কল্যাণী গিয়া সেই ছিপে উঠিয়া বসিল,—পাখীরমত বেগে ছিপ ছুটিয়া বাহির হইল।

জেলদারোগার প্রেরিত বরকন্দাজ খাঁও একখানা রাজকীয় পান্‌সী সাজাইয়া ছিপের অনুসরণ করিল। কিন্তু ছিপখানি অগ্র হইতেই প্রস্তুত ছিল, কাজেই সে অনেক আগেই বাহির হইয়াছিল, আর বরকন্দাজ খাঁকে পান্‌সী প্রস্তুত করাইয়া লইয়া বাহির হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি বরকন্দাজ খাঁ বড় অধিক দূর পশ্চাতে পড়ে নাই,—সেদিন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি—কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে চন্দ্রদেব আকাশের গায়ে উঠিয়া পড়িয়া সমস্ত দিক্ আলোকময় করিয়া দিয়াছেন। গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রকর পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া খেলা করিতেছিল।

কল্যাণী কিয়দ্দূর গিয়া ছিপের উপর দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে কি না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইল, একখানা পান্‌সী সুদূর আকাশ প্রান্তের উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় অতি দ্রুত তাহাদেরই দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। কল্যাণী মাঝিদিগকে ডাকিয়া আরও দ্রুত ছিপ চালাইতে অনুমতি করিল এবং আরও পুরস্কারের লোভ দেখাইল। কিন্তু কল্যাণী দেখিল,—যে পান্‌সী অতিদূর হইতে দূরতর স্থানে ছিল,

তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক নিকটে আসিয়াছে,—একজন সর্দ্দার, মাঝিকে বলিল,—"ঐ পান্‌সীখানা আসিতেছে, ওখানা কাদের বলিতে পার ?"

মাঝি উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল,—"পান্‌সীখানা নবাব সরকারের।"

কল্যাণী বলিল,—"এই স্থানের গঙ্গাতীরে আমাদিগকে নামাইয়া দাও। আমরা জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়ি। কিন্তু তোমরা যেমন ছিপ দ্রুত বাহিতেছ, তেমনিই দ্রুত বাহিয়া লইয়া যাও—পাছের পান্‌সীর আরোহীরা ভাবিবে, ছিপে আমরা আছি, প্রাণপণে তোমাদেরই অনুসরণ করিবে, এবং ধরিবে। তখন তোমরা দেখাইতে পারিবে তোমাদের নৌকায় কেহ নাই। এরূপ করিলে আমরা ও তোমরা সবাই নিরাপদ হইতে পারিব।"

মাঝি বলিল,—"ভাড়া আর বখ্‌সিসের টাকা ?"

কল্যাণী তাহার হাতে দশটা মোহর দিল। মাঝি তদ্দণ্ডে তীরে ছিপ্ ভিড়াইল, কল্যাণী তাহার পিতাকে লইয়া মুহূর্ত্তে নামিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তে ছিপ আবার ভাসিয়া যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল।

কল্যাণী পিতাকে লইয়া তীরে উঠিয়া একটা ঘনবিন্যস্ত আম্র-বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পিতা বড় কাতর, তাই—দূরে যাইতে পারিল না। সে, সেখান হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল,—পশ্চাতের পান্‌সীখানাও তাহাদের নিকট দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল, এবং তাহার উপরকার লোহিত পতাকা দেখিয়া মাঝির অনুমান সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে আম্রবাগানের মধ্যে পিতাকে লইয়া কল্যাণী গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার নিম্ন দিয়া ভাগীরথী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছিলেন। দূরে তারকা-মণ্ডিত ম্লান নীল আকাশের কোলে একখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম দেখা যাইতেছিল। গ্রামের প্রাসাদ, গৃহ এবং বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত তুষার-শুভ্র কৌমুদীতে চিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল।

রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় আতঙ্ককম্পিত কণ্ঠে মুসলমান পদাতিকবেশী কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাপু তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? ভাবিয়াছিলাম, গঙ্গাজলে ডুবাইয়া আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিবে,—সে আশা নিরাশায় পরিণত হইল। এখন স্পষ্ট করিয়া বল, অত্যাচারের আর কি কঠোর যন্ত্রণা দিতে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? হায়! কেন বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—যদি করিয়াছিলাম, তবে কেন জমিদার হইয়াছিলাম। এ দেশের জমিদারের চেয়ে ভিখারীও সুখী।"

কল্যাণী এবার কাঁদিয়া ফেলিল। পিতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"বাবা, আমি তোমার মেয়ে হতভাগিনী কল্যাণী।"

নিদ্রাতুর প্রহরী তাহার অজ্ঞাতে অদূরে আগত শত্রুসেনার তূর্য্য-

ধ্বনিতে জাগিয়া যেমন মুহূর্ত্তে তন্দ্রাশূন্য, শঙ্কিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে, কল্যাণীর নাম শুনিয়া গোপীকৃষ্ণ রায় তেমনই সজাগ, বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন।

কল্যাণী মাথার টুপী, মুখের কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ ও গায়ের চাপকান খুলিয়া ফেলিয়া পিতার সম্মুখে উপবেশন করিল। রাজাও তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার দুর্ব্বল হস্তে কন্যার শিরস্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি এখনও কি স্বধর্ম্মে আছ ?"

কল্যাণীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল। পিতার মনের ভাব বুঝিল। বলিল,— "বাবা ; সতীর ধর্ম্ম জগতে নষ্ট করিতে কেহ পারে না। আমি স্বইচ্ছায় তোমার জন্য মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলাম।"

তারপরে অতি সংক্ষেপে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পিতার নিকটে বলিল। তাহার পিতা সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। বলিলেন,—"মা, যাহা করিয়াছ, মেয়ের মতই করিয়াছ,—ছেলে হইলে এতটা পারিতে না।"

ক। কেন বাবা ?

গো। পরিণাম বিবেচনা হইত।

ক। যে ছেলে পিতার মরণ-যন্ত্রণা দেখিয়াও পরিণাম চিন্তা করিতে পারে, বঙ্গদেশে তাহাকে পুত্র বলিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দেশে তাহাকে শত্রু বলে।

গো। কিন্তু এখন কোথায় যাইবে ? দেশে গেলে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইবে।

ক। অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে কোন পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়া পিতা পুত্রী বসবাস করিব।

গো। গবিন্দরামের অনিষ্ট হইতে পারে। হয়ত এইজন্য তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিতে পারে। রাজ্যচ্যুত করিতে পারে।

ক। তাহা ভাবিয়া তোমাকে মুসলমানের অত্যাচারের আগুনের মধ্যে রাখিতে পারি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই ঘটিবে।

রাজা গোপীকৃষ্ণ একটা তপ্ত শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আম্রমূলে দেহ ঢালিয়া দিলেন।

কল্যাণী বলিল,—"বাবা; আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য কি তুমি দুঃখিত হইয়াছ?"

রাজা ম্লানমুখে বলিলেন,—"দুঃখিত হই নাই। চিন্তিত হইয়াছি,—আমার উত্থান শক্তি নাই বলিলেই হয়,—তুমি মেয়ে। আমরা কোথায় যাইব! ওদিকে গোবিন্দরই বা কি হইবে! আমার শরীর যেরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বাঁচিব, সে আশাও নাই,—চারিদিকেই বিপদ।"

কল্যাণী বলিল,—"সে সকল বিষয় পরে চিন্তা করা যাইবে। এক্ষণে আমার স্কন্ধে ভর করিয়া সম্মুখের ঐ জঙ্গলের দিকে যাইতে হইবে। এক দল সিপাহী আমাদের ছিপের অনুসরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এইস্থানে আমাদের ছিপ্ একটু দাঁড়াইয়াছিল,—এই সন্দেহে যদি ফিরিবার সময় এস্থানে খুঁজিয়া যায়, বিপদ ঘটিতে পারে।"

রাজা বলিলেন,—"বিপদের এই সূত্রপাত!"

তারপরে কল্যাণী আবার মাথায় টুপী পরিয়া, গোঁফ দাড়ী আঁটিয়া চাপ্‌কান পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পিতার দেহভার স্কন্ধের উপরে রাখিয়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া লইয়া সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলাভিমুখে চলিয়া গেল।

যে জঙ্গল মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল, সেখানে কোন্ অতীত দীর্ঘ দিনের এক পুরাতন ভগ্ন মন্দির উদ্গীর্ণদর্ত্ত কবলেরমত পড়িয়া ছিল। মন্দিরের মধ্যে কোন্ মহাত্মা কবে কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব-স্থানে চলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহও স্থানান্তরিত হইয়াছেন,—এখন কেবল সেই পুরাতন স্মৃতির অতীত কাহিনী বুকে

করিয়া ভগ্ন মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের চারিদিকে বট অশ্বথ গজাইয়া উঠিয়াছে,—যেন পতনোম্মুখ মন্দিরের দেহপঞ্জর তাহারা তাহাদের স্নেহবাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

জঙ্গলমধ্যে এই ভগ্নমন্দির দর্শন করিয়া কল্যাণী একটু আশ্বস্তা হইল। ভাবিল, এখানে—এই নিভৃত ভগ্ন মন্দিরে হয়ত দুই এক দিনের জন্য লুকাইয়া থাকা যাইতে পারিবে। এখানে রাখিয়া পিতাকে একটু সবল ও সুস্থ করিয়া লইয়া স্থানান্তরে যাওয়ার সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া—সে, তাহার পিতাকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়া নিজে মন্দিরের অবস্থা দেখিবার জন্য তদভিমুখে গমন করিল।

জ্যোৎস্না কিরণে মন্দিরের ভগ্নচূড়া উজ্জ্বলীকৃত ছিল এবং বহু বৃক্ষের বহু শাখা আসিয়া মন্দিরের গাত্র আবৃত করিয়া রাখায় সেখানে অন্ধকার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। তবে জ্যোৎস্না আর ছায়া—আলোক আর আঁধার উভয়ের সম্মীলনীতে সে জঙ্গলভূমি একেবারে অন্ধকার হয় নাই।

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই কল্যাণী আগুনের গন্ধ প্রাপ্ত হইল। তখন সেখানে মনুষ্যগমনাগমন সম্ভব বিবেচনায় হতাশ্বাস হইল। ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় মন্দির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কে তুমি?"

শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে কল্যাণী বলিল,—"আমি ওমার খাঁ।"

যিনি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি বাহিরে আসিলেন,—হস্তে একখানি প্রস্তর ছিল, সেখানি বাহির করিয়া ধরিলেন, অনেক খানি স্থান লইয়া আলো হইল,—এক দৃষ্টে ওমারখাঁ-বেশধারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"তুমি এখানে কেন?"

কল্যাণীও তাঁহাকে আলোক সাহায্যে উত্তমরূপে দেখিল, দেখিল, তিনি একজন যোগী, বয়স স্থির করিবার সম্ভাবনা নাই,—মুখজ্যোতি ভাস্বর, নয়ন জ্যোতিঃপূর্ণ—দেহ পুষ্ট; মস্তকে জটাভার লম্বিত।

কল্যাণী ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। যোগী ভাবিলেন, ওমার খাঁ সেলাম না করিয়া প্রণাম করে কেন!

সজল নেত্রে কল্যাণী বলিল,—"দেব; আমি বড় বিপন্ন।"

যো। কি বিপদ?

ক। অভয় পাইলে বলিতে পারি।

যো। আমি রাজা নহি, রাজকর্ম্মচারী নহি,—বনবাসী যোগী। আমার নিকটে ভয়াভয় কি বাপু?

ক। যাঁহারা দৈববলে বলীয়ান্, তাঁহারা রাজারও রাজা।

যো। তুমি মুসলমান নহ,—ছদ্মবেশী।

ক। আপনি দেবতা, প্রাণ গেলেও আপনার নিকটে মিথ্যা বলিব না।

যো। ভাল, এখন অধিক কিছু বলিবারও প্রয়োজন নাই। তোমার কি বিপদ, তাই মাত্র আমাকে বল।

ক। আমার পিতা পীড়িত,—আমরা উভয়ে পলায়িত। যদি এখানে একটু আশ্রয় দেন।

যো। ইহা অবশ্যই সুরক্ষিত আশ্রম নহে,—ইচ্ছা করিলে মন্দিরে আসিয়া থাকিতে পার, আমার আপত্তি নাই।

ক। এখানে কি সর্ব্বদা লোকজন যাতায়াত করে?

যো। আমি প্রায় এক সপ্তাহ এই মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করিতেছি,—কৈ, ইহার মধ্যে একজন লোককেও এখানে আসিতে দেখি নাই।

ক। তবে অন্ততঃ দুই এক দিবসের জন্য এখানে থাকিতে পারিব।

যো। তোমার পিতা কোথায়?

ক। ঐ যে বড় বৃক্ষটা দেখা যাইতেছে, উহার তলে রাখিয়া আসিয়াছি।

যো। শীঘ্র এখানে লইয়া আইস। এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে।

কল্যাণী ত্বরিতপদে চলিয়া গেল, যোগীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

গমন করিলেন। কল্যাণী পিতাকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ স্কন্ধের উপর তাঁহার দেহভার সংরক্ষণ করিয়া মন্দিরে লইয়া গেল। যোগী পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়া মন্দিরে একটু স্থান করিয়া দিলেন।

তারপরে যোগীর সঙ্গে কল্যাণীর কথা আরম্ভ হইল। যোগী বলিলেন,—"তুমি মুসলমান নহ হিন্দু; পুরুষ নহ রমণী। কিন্তু কেন এবং কি অবস্থায় কোথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ? তোমার এবং তোমার পিতার দেহচিহ্ন দর্শনে বুঝিতেছি, তোমরা উভয়েই অনন্য সাধারণ ব্যক্তি। আমার নিকটে মিথ্যা বলিও না। কোন ভয় নাই।"

কল্যাণী বিস্ময়-চকিত-স্বরে বলিল,—"আমাকে রমণী বলিয়া কিসে স্থির করিলেন?"

যোগী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কেবল সাজেই কি সমস্ত লুকায়? স্ত্রী ও পুরুষে প্রতি শিরা কৈশিরার পার্থক্য আছে।"

ক। বহুদিন অনেক লোকের মধ্যে বাস করিয়া আসিলাম, কেহ চিনিতে পারে নাই?

যো। তা না পারুক,—কিন্তু সর্ব্বত্র লুকান যায় না। এখন তোমাদের পরিচয় বল, এবং কেন ও কোথা হইতে এই দুরবস্থায় পলাইয়া আসিয়াছ, তাহাও বল।

তখন কল্যাণী সমস্ত কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যোগী অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অবশেষে বলিলেন,—"মুসলমানের অত্যাচার সারা বঙ্গে হইয়াছে। পলাইয়া ভাল কর নাই,—কে তোমাদিগকে আশ্রয় দিবে? নিজেদের সেরূপ সৈন্য বল নাই, যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

কল্যাণী সজলনয়নে বলিল,—"বঙ্গে এমন কি কেহ নাই, যে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইতে পারে?"

যো। মুসলমানের শক্তি প্রবলা,—এ শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,

এমন বল, বঙ্গে কোন ভূস্বামীরই নাই। তবে সমবেত শক্তি লাভ করিতে পারিলে বঙ্গের অনেক বীরই মুসলমান জয় করিতে পারে, কিন্তু সে আশাও নাই।

ক। কেন?

যো। সে মন্ত্রে বাঙ্গালী কখনও দীক্ষিত হয় নাই,—সে শিক্ষা বঙ্গবাসী কখনও পায় নাই।

ক। তবে আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লউন,—আজীবন চরণ-সেবা করিয়া যোগধর্ম্মাবলম্বন করিব।

যো। আমি নিঃশঙ্গ যোগী, সঙ্গপ্রার্থী নহি। উহাতে যোগের বিঘ্ন হয়। তুমি এক কাজ করিতে পার?

ক। আজ্ঞা করুন।

যো। গঙ্গাতীর হইতে একখানি গ্রামের ছায়া দেখিয়াছিলে কি?

ক। হাঁ দেখিয়া ছিলাম।

যো। ঐ গ্রামের নাম বিনোদ। বিনোদে রাজা উদয়নারায়ণের জন্মভূমি; আগামী কল্য তাঁহার জন্মতিথি পূজা। সেই উপলক্ষে তিনি, কল্য প্রত্যূষে বড় নগর হইতে বিনোদে আসিবেন। তিনি ধনে মানে বীর্য্যবত্তায় শ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্মেও বিশেষ আস্থাবান্,—যদি তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পার, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। আমি জানি, মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসেন, উদয়নারায়ণ যদি তোমাদের জন্য অনুরোধ করেন,—নবাব তোমাদিগকে ক্ষমাও করিতে পারেন।

ক। আমি কি প্রকারে রাজার সহিত আলাপ করিব?

যো। তিনি পরম ধার্ম্মিক,—সুবিধা ও সুযোগ পাইলে, সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে দ্বিধা বোধ করিও না।

ক। কিন্তু সে সুবিধা লাভের উপায় কি?

যো। উদয়নারায়ণ আমাকে যথেষ্ট খাতির করে, আমি একখানি

লিপি দিব,—তাহা তাঁহাকে পঁহুছাইয়া দিতে পারিলে, তিনি তোমার কথা শুনিবেন।

ক। বোধ হয়, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই এই মন্দিরে নররূপে অবস্থিত হইয়াছেন।

যোগী সেই উজ্জ্বল প্রস্তরের আলোকে একখানি প্রস্তর-ফলকে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া কল্যাণী ওরফে ওমার খাঁর হস্তে প্রদান করিলেন।

রাজা গোপীকৃষ্ণ সমস্ত শুনিয়া এক দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কল্যাণী, মা; আর কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দিস্ না। চল্, তোরে বুকে ক'রে গঙ্গাগর্ভে ডুবে মরিগে! রাজার মেয়ে নিরাশ্রয়া ও ভিখারিণীর বেশে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ানর চেয়ে মরা ভাল।"

রাজার চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা নির্গত হইল। যোগী বলিলেন, —"আপনি প্রাচীন। আপনি বিজ্ঞ,—কেন বিচলিত হয়েন? মানুষ জগতে কাজ করিতে জন্মিয়াছে,—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রীত্যর্থে কাজ করিতে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অধিকার আছে।"

কল্যাণী বলিল,—"কাজের সুবিধা ও সুযোগ করিতে হয়ত আমার একাধিক দিবস বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু দেব, আমার পীড়িত পিতার কি হইবে?"

যো। সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই। পীড়িতের শুশ্রূষা করা, আশ্রিতের সেবা করা, মানুষের সনাতন ধর্ম্ম। আমি প্রাণ পণে তাহা সম্পাদন করিব।

কল্যাণী ইতস্ততঃ করিতেছিল। যোগী বলিলেন,—"মা, তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না। কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন তোমার অন্য উপায় নাই। অতএব আমার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আশ্রয়ের জন্য রাজা উদয়নারায়ণের নিকট গমন কর। জন্ম-

তিথি পূজোপলক্ষে তিনি জন্মভিটায় আসিয়াছেন,—আজি রাজকার্য্য হইতে অবসর—এই সুযোগে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

ক। এখনই যাইব কি ?

যো। না,—প্রভাত হউক। তবে প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বন হইতে বাহির হইও। কেন না, বাহিরের লোক না দেখিতে পায়,—এ বনে মানুষের গতাগতি আছে।

ক। এখন রাত্রি কত ?

যো। প্রায় শেষ হইয়া উঠিয়াছে।

ক। রাজা উদয়নারায়ণ কি জাতি ?

যো। ব্রাহ্মণ।

ক। আপনি বলিলেন, তাঁহার জন্মভূমি ঐ বিনোদগ্রামে, এবং তিনি জন্মতিথি পূজোপলক্ষে বিনোদে আসিয়াছেন, তবে কি তাঁহার রাজধানী বিনোদে নহে ?

যো। বিনোদ আর বড় নগর অতি নিকটবর্ত্তী স্থান, বড় নগরে—নূতন রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন,—সপরিবারে এখন সেই স্থানেই থাকেন। তদ্ভিন্ন সুলতানবাদের অন্তর্গত বীরকিটি নামক স্থানে এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেবীনগরে তাঁহার আরও দুইটি সুরক্ষিত বাস ভবন আছে। সে সকল স্থানেও গড় পরিখা দুর্গ সৈন্য রাজকর্ম্মচারি-বর্গ যেমন থাকিতে হয়, তেমনই আছে।

ক। তিনি বড়—তিনি ক্ষমতাশালী; নবাব তাঁহার অনুরোধ শোনে,—না শুনিলেও শুনাইতে বাধ্য করিতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের কথা শুনিবেন কি ? আমাদের আশ্রয় দাতা হইবেন কি ? আমাদের জন্য ততটা করিবেন কি ?

যো। চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যখন অকূলে ভাসিয়াছ, তখন তৃণ গাছটিও ধরিয়া দেখিতে হয়।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইতেই বিনোদ বিবিধ বাদ্য কোলাহলে ও জনতায় মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজবাড়ীর স্তম্ভে স্তম্ভে ফুলমালা, ধ্বজ, পতাকা ও বিচিত্র চিত্র সকল প্রলম্বিত হইল। হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যশ্রেণী সুসজ্জিত হইল,—নহবৎ খানায় নহবৎ বাজিতে লাগিল, স্তাবকগণ রাজকীর্ত্তিগাথা গাহিতে লাগিল। দীন দুঃখী অন্ধ আতুর ভিক্ষা পাইয়া রাজাকে দীর্ঘ-জীবী হইবার জন্য প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বহু দূর-দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রাজবাড়ীতে পূর্ণ হইতে লাগিল। পুরো-হিতগণ জন্মতিথি পূজা ও হোম যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

রাজা পূজাগারে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় একভৃত্য করযোড়ে জানাইল, "একজন মুসলমান—সম্ভবতঃ নবাবের কর্ম্মচারী হইবে,—মহা-রাজের সাক্ষাতের জন্য বিশেষ আগ্রহ জানাইতেছে।"

রাজা তখন পূজাগারে প্রবেশ না করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ওমার খাঁ সেলাম করিয়া প্রস্ত-রফলক খানি রাজা উদয় নারায়ণের হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইল। রাজা তখন স্নানাদি করিয়া পূজাগারে যাইতেছিলেন, সুতরাং যবনস্পর্শ-ভয়ে একজন ব্রাহ্মণকে উহা লইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ওমার খাঁর হস্ত হইতে প্রস্তর-ফলক লইয়া রাজার হস্তে প্রদান করিল।

রাজা তাহা পাঠ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। বলিলেন,—"এখন তুমি এই লোকের সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম কর গে। সন্ধ্যার পরে আমি তোমাকে ডাকাইয়া সাক্ষাৎ করিব।"

তারপরে পার্শ্বস্থ একটি লোককে ওমার খাঁর জন্য একটি নিভৃত বাসাও খাদ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া পূজাগার অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

প্রস্তর ফলকে লেখাছিল,—"প্রস্তর-ফলক বাহক রমণী, গোপনে মহারাজের সহিত উহার যে কথা আছে,—আমার অনুরোধে কথাটা শুনিবেন। কথা শুনিয়া কার্য্য করা না করা, মহারাজের ইচ্ছা, সে বিষয়ে আমার কোন অনুরোধ বা বক্তব্য নাই।"—যোগানন্দ স্বামী।

রাজা উদয়নারায়ণের জন্মতিথি পূজোপলক্ষে সে দিবস বিনোদে লোক-সমুদ্রের সমাগম হইয়াছিল,—নাচ গান পান ভোজন পূজা অর্চ্চনা হোম যজ্ঞ দান ধ্যান প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল। তার পরে সন্ধ্যা সমাগমে সমস্ত গ্রামখানি উৎসব-আলোকে আলোকিত ও নৃত্য-গীতে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বত্রই আনন্দ, সর্ব্বত্রই উৎসাহ, সর্ব্বত্রই প্রীতির হাস্য-কোলাহল। বিষাদ, অশ্রু, যাতনা, দুর্ভাবনা যেন সে দিবারাত্রির মধ্যে সে গ্রামে একবার চাহিয়া দেখিতে অবকাশ পায় নাই।

উৎসব-শ্রান্ত রাজা উদয়নারায়ণ প্রাসাদ-পশ্চাতস্থ উদ্যানে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া একদাসীকে বলিলেন,—"এখনই এই উদ্যানের দেউড়িতে একজন মুসলমান আসিবে, তাহাকে আমার আদেশ জানাইয়া বলিবে,—স্ববেশে এখানে আসিয়া সাক্ষাৎ করে, এবং তাহার যদি প্রয়োজন হয়, বস্ত্রাদি দিবে।" দাসী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না,—কিন্তু সমস্ত বাগান আলোকমালায় উদ্ভাসিত ছিল। আকাশে আঁধার, ধরায়

আলোক ;—দক্ষিণে বাতাস, রজনীগন্ধ ফুলের পরিমল, আর কয়েকটা পাপিয়া একত্র হইয়া যেন কি একটা ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

উদ্যানের মধ্যে শ্বেতমর্ম্মর-মণ্ডিত বেদী ছিল। সেই বেদীর উপরে অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় রাজা অবস্থিত হইলেন। দুইজন পরিচারিকা পদ-সেবায় নিযুক্ত হইল। এমন সময় দাসী বলিল,—"আপনি যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই রমণী ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিকটে আসিবার জন্য বিশ্রাম গৃহের দাবায় অপেক্ষা করিতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"হাঁ, তাহাকে এখানে লইয়া আইস।" দাসী চলিয়া গেল। অতি অল্পক্ষণ পরেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় কল্যাণী ধীরে ধীরে—অতিধীরে অগ্রসর হইয়া রাজা উদয়নারায়ণের চরণপ্রান্তে জানুপাতিয়া উপবেশন করিল। রাজা দেখিলেন, নীল আকাশের মাঝে তারার ন্যায় ঘনকৃষ্ণ কেশদামে বেষ্টিত একখানি অতিসুন্দর ব্রীড়াবনত মুখ। কল্যাণীর বিকাশোন্মুখ গোলাপের ন্যায় আরক্তিম গণ্ডস্থল, স্থির প্রশান্ত নয়ন, ও কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম রাজার চক্ষে অপার্থিব বলিয়া বোধ হইল। সাদরে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—'মা,তুমি সাধারণ মেয়ে নহ। তোমার পরিচয় দাও।'

প্রবহমান চক্ষুর জল রুদ্ধ করিয়া কল্যাণী বলিল,—"মহারাজ ; আমি রাজার মেয়ে,—আমার পিতাও রাজা, কিন্তু আমি বিধির বিধানে আজি পথের ভিখারিণী। আপনি ভিন্ন আমাদের আশ্রয়দাতা বঙ্গ-দেশে আর কেহ নাই। আমাকে চরণে রাখিতে হইবে। আমি আপ-নার আশ্রিতা, প্রতিপালিতা ও কন্যা।"

উদয়নারায়ণ বয়সে পৌঢ়, সন্তানের পিতা ও দয়ালু। সে সুন্দর মুখের কাতর প্রার্থনা, সুন্দর চক্ষুর অশ্রু, সুন্দর কণ্ঠের করুণ স্বর শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—তোমাকে আশ্রয় দেওয়া কি কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে কর মা ?

কল্যাণী দৃঢ় স্বরে বলিল,—হাঁ, কঠিন। কঠিন না হইলে আপনার চরণে শরণ লইতাম না।

রা। কি কঠিন বল?

ক। তৎপূর্ব্বে আপনি আমায় আশ্রয় প্রদান করিবেন বলুন।

রা। তোমার অবস্থা আগে বল।

ক। গোষ্ঠ বিহারের রাজা গোপীকৃষ্ণরায়ের আমি একমাত্র কন্যা।

রা। তোমার চেহারা দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি—তুমি অনন্য সাধারণ। তারপরে?

ক। তারপর, আমার পিতাকে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রদান জন্য তলব দিয়া আনাইয়া মহম্মদ রেজা খাঁ বন্দী করে।

রা। উঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য হিন্দু রাজগণের উপরে মুসলমানদিগের পাশবিক অত্যাচার শুনিতে শুনিতে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। তার পর? তাঁহাকে উদ্ধার করিতে বল?

ক। উদ্ধার করিতে হইবে না, আমিই উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি—আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন সমস্ত বঙ্গে সে ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

বিস্মিত নয়নে রাজা উদয়নারায়ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কল্যাণীর মুখের দিকে নিস্তব্ধে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া রহিয়া মনে মনে কত কি ভাবিলেন। তারপরে বলিলেন, "তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছ?"

তখন কল্যাণী সমস্ত কথা, সমস্ত অত্যাচার, সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত রাজার নিকট সংক্ষেপে অথচ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিল। রাজা শুনিয়া মনে মনে কল্যাণীর বুদ্ধি, সাহস ও পিতৃভক্তির প্রশংসা করিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কল্যাণী বলিল,—আপনি না রাখিলে, আমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। অতএব, দয়া করিয়া আশ্রয় প্রদান করিতে হইবে।

রাজা আরও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"বিষয় অত্যন্ত গুরু-তর। নবাবের প্রবলশক্তির বিরুদ্ধে কার্য্যকরা সকলেরই ক্ষমতার অতীত।"

ক। আপনি অনুরোধ করিলে মুর্শিদকুলী খাঁ আমাদিগকে ক্ষমা করিতেও পারেন। আমরা বিদ্রোহী নহি—অত্যাচারী নহি। পীড়নের দায়ে, অত্যাচারের দায়ে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছি।

রা। মুর্শিদকুলী খাঁর সেরূপ শাসন নহে। ইহার জন্য হয়ত প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে।

ক। আপনি কি রক্ষা করিতে পারিবেন না?

রা। তুমি আ'জ যাও,—আগামী পরশ্বঃ সন্ধ্যার পরে আমার বড় নগরের প্রাসাদে গিয়া সাক্ষাৎ করিও।

ক। কি করিয়া যাইব?

রাজা অঙ্গুলী হইতে একটি অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—ইহা দেখাইলে তোমাকে অন্তঃপুরে যাইতে দিবে।

ক। এ কয় দিন আমরা কোথায় থাকিব?

রা। আমার অনাশ্রিত-ভাবে, সাধারণ প্রজার ন্যায় আমার এই বিনোদের প্রাসাদে অবস্থান কর। এখানে তোমার স্ববেশেই থাক,—উৎসব উপলক্ষে অনেক লোকজনের সমাগম হইয়াছে—কেহ তোমাদের সন্ধান পাইবে না। তারপরে যদি আমি ভাল বুঝি, আশ্রয় দিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিব নতুবা যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইও।

কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন প্রতিভা ফুটিয়া পড়িতেছিল। সে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল,—"মহারাজ; স্মরণ রাখিবেন—আমি প্রাণের দায়ে, পিতার প্রাণের দায়ে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমার পিতা ব্রাহ্মণ—আমি ব্রাহ্মণ কন্যা। মহারাজ; স্মরণ রাখিবেন, আপনারই দেশের, আপনারই মত এক হিন্দু রাজা আশ্রিত

এক পক্ষীর জন্য নিজ দেহের মাংস কাটিয়া দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। কেবল এক দৃষ্টে—অনিমেষ নয়নে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তখন যেন দৈবী প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। চোখ মুখ দিয়া জ্যোতির ধারা বহিয়া চলিতেছিল।

তারপরে কল্যাণী রাজার দাসীর সহিত উদ্যান হইতে বাহির হইল। উদ্যান বাটিকায় গিয়া তাহার ওমারখাঁর পোষাক লইয়া পরিধান করতঃ জঙ্গলাভিমুখে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে জঙ্গলাভ্যন্তরে ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পিতা ও যোগীর চরণে প্রণাম করিল।

যোগী কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, কল্যাণী তাঁহাদের সম্মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল। যোগী শুনিয়া বলিলেন,—তোমার কার্য্য সফল হইবে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।"

গোপীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে?„

যো। বোধ হয়, রাজা উদয়নারায়ণ তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন।

গো। তাহা হইলে কি হইবে? পরের আশ্রয়ে দীনের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে ত?

যো। মুসলমানের বেত্রাঘাতে, পঙ্কিল পূতিগন্ধময় হ্রদে সিঙ্গী মৎস্যের দংশনে জ্বলিয়া মরারচেয়ে হিন্দু রাজার অধীনে দিনাতিপাত মন্দ নহে। আর উদয়নারায়ণের অনুরোধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তোমাদিগের দোষ মার্জ্জনা করিতেও পারেন।

গো। ভগবানের মনে কি আছে, তাহা তিনিই জানেন।

যো। তুমি প্রাচীন ব্রাহ্মণ হইয়াও ভগবানের উপরে এ দোষ অর্পণ করিতেছ কেন? ভগবান্ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন

না। তিনি সুখ-দুঃখের অতীত, বিশুমানানন্দে লইতে ইচ্ছুক, আমরা জড়ের রাজত্বে—কৃত কর্ম্মের ফলে, সুখ-দুঃখের বাজার বসাইয়া এতটা করিয়া তুলি।

গো। সে কথা সত্য;—কিন্তু কর্ম্ম করানও তিনি। তিনি যেদিকে আমাদিগকে লওয়ান, আমরা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ি।

যো। সে কথাও ভুল। তিনি কার্য্য কারণের অতীত;—এ সকল প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য সাধনা-ভজনা। সাংসারিক লোক প্রকৃতির অধীন হইয়া যাহা করিয়া বসে,—তাহারই ফল জন্মে জন্মে ভুগিয়াও কুল পায় না।

সে দিন রাত্রে সেই ভগ্নমন্দিরে অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস প্রত্যুষ হইবার অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া কল্যাণী যোগীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বলিল,—"দেব; দাসীর কথা মনে রাখিবেন। কূল হারা হইয়া চরণের নিকট বিদায় হইলাম।"

যোগী বলিলেন,—"ভগবান্ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। আমি আর একদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

কল্যাণী পিতার দেহভার স্কন্ধের উপর লইয়া ধীরে ধীরে জঙ্গল হইতে বাহির হইল। তৎপরে ধীরে ধীরে বিনোদ-গ্রামাভিমুখে চলিয়াগেল। যখন তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিল, তখনও সূর্য্যদেব উদিত হয়েন নাই—তখনও পাখীরা প্রভাতী গাহে নাই, তখনও ঊষার বিদায়ী বাতাস বহে নাই।

ভগ্নমন্দির হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে ওমার খাঁর বেশ পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণী হইয়াই বাহির হইয়াছিল। গ্রামের মধ্যে যখন তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল, তখন গৃহস্থগণ প্রায়ই উঠে নাই,—কেবল একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের স্কন্ধে ভর করিয়া একজন

দিব্যকায় প্রাচীন পুরুষকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁগা; তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

ক। আমাদের বাড়ী অনেক দূর। রাজা উদয়নারায়ণের আমরা কুটুম্ব। কুটুম্বিতা করিতে আসিতেছিলাম, পথে নৌকাডুবি হইয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম। আর দুই একজন মরিয়া গিয়াছে,—আমরা কোন প্রকারে বাঁচিয়া আসিয়াছি।

সহানুভূতিসূচক অনেকগুলি কথা বলিয়া রমণী আপনকার্য্যে চলিয়া গেল; কল্যাণী তাহার পিতাকে লইয়া রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা উদয়নারায়ণ পূর্ব্বরাত্রেই তাঁহাদিগের বাসস্থানাদির বন্দোবস্তের জন্য একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,—সেই কর্ম্মচারী বিশেষ যত্ন ও তত্বাবধানের সহিত তাহাদিগের বাসাদি প্রদান করিল।

সেই দিন প্রভাতকালেই রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে বড় নগরের প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদকুলী খাঁ সমুদায় বঙ্গদেশ ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের পথ সুগম করিয়া লয়েন। এই ত্রয়োদশ চাকলার মধ্যে রাজসাহী চাকলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহু জনপদবিশিষ্ট। যাঁহারা মেজর রেনেলের কৃত কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পদ্মানদীর উভয় পারেই রাজসাহী চাকলা বিস্তৃত ছিল,—এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান তখনকার রাজসাহী চাকলার অধীন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বীরভূম জেলায় রাজসাহী পরগণা বলিয়া যে একটি পরগণা দৃষ্ট হয়, তাহাও রাজসাহী চাকলার অধীনছিল,—শাঁওতাল পরগণাও রাজসাহী চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশাল—বিস্তৃত চাকলার অধিস্বামী ছিলেন, রাজা উদয়নারায়ণ রায়।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় রাঢ়ীয়শ্রেণীর শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের লালা উপাধিছিল, এজন্য কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি গণকরের ঘনশ্যাম রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার শ্বশুরের ভরদ্বাজ গোত্র। স্ত্রীর নাম শ্রীমতী দেবী। *

* বঙ্কিম বাবু সীতারাম উপন্যাসে সীতারাম রায়ের স্ত্রীর নাম শ্রী রাখিয়াছেন, এবং

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন উদয়নারায়ণের বয়স চল্লিশ বৎসর হইবে। তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইয়াছিল। পুত্রটি বড়, বয়স দ্বাবিংশতিবর্ষ নাম সাহেবরাম।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বড়নগরে প্রভূতক্ষমতাশালী রাজা উদয়নারায়ণের প্রধান রাজধানী অবস্থিত ছিল। বড়নগরের বক্ষ বিধৌত করিয়া কলনাদিনী পুণ্য-শালিনী ভাগীরথী প্রবাহিতা। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে সৌধকিরীটী বড়নগর উন্নত গর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। বড়নগরে নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসার বাণিজ্যস্থান ছিল।—বহুদূর দূরান্তর হইতে ব্যবসায়িগণ আসিয়া বড়নগরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। জনবহুল, বাণিজ্যবহুল সুবিস্তৃত বড় নগরে রাজসাহীচাকলার অধীশ্বর রাজা উদয়নারায়ণের সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। গড়, দুর্গ, তোরণ, প্রাকার, সৈন্য, সামন্ত, হয়, হস্তী, সাদী, নিষাদী প্রভৃতি বহুল ও শ্রেণীবদ্ধরূপে ছিল।

রাজা উদয়নারায়ণ নিষ্ঠাবান্ ও ভক্তিমান্ হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপ্রতিপালন, তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল-বিগ্রহ রাজোচিত আড়ম্বরে নিত্য পূজিত হইতেন।

খিনোদ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াই রাজা উদয়নারায়ণ প্রথমে মদনগোপালের মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেবচরণে প্রণত হইয়া মহাসমারোহে পুরী প্রবেশ করিলেন।

মধ্যাহ্নিক উপাসনাও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উদয়নারায়ণ রায় সুকোমল-শয্যাস্তৃত দ্বিরদরদনির্ম্মিত পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া অনন্য-

বলিয়াছেন—শ্রী কি শ্রীমতী হইবে। বস্তুতঃ সীতারামের স্ত্রীর নাম যে শ্রী ছিল, তাহা কোন ইতিহাস বা জনপ্রবাদে শ্রুত হওয়া যায় না ;—উহা তাঁহার কল্পনারই অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হয়ত সম সাময়িক রাজা উদয়নারায়ণের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী পাঠ করিয়া সীতারামের স্ত্রীর নাম শ্রী রাখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।

মনে চিন্তা করিতেছিলেন। পার্শ্বে রৌপ্য-পরীর মস্তকের উপর স্বর্ণ আলবোলায় মৃগনাভি-সিঞ্চিত বহু সুগন্ধদ্রব্যে সুগন্ধীকৃত তাম্রকূট অভিমানে পুড়িয়া পুড়িয়া সুবাস ছাড়িতেছিল।

এই সময় সেইগৃহে রাণী শ্রীমতী ঠাকুরাণী গজেন্দ্রগমনে প্রবেশ করিলেন। উদয়নারায়ণ রায় তখনও চিন্তাবিষ্ট। শ্রীমতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"এত ভাবনা কিসের? এতবড় একটা লম্বাচৌড়া মানুষ ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, একবার দৃষ্টিপাতও হইল না। আলবোলার মাথায় অভিমানে তামাক পুড়িয়া মরিতেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাতও নাই,—ডিবায় পানের রাশি আদরের অপেক্ষা করিতেছে, তাহাতে নজর নাই। কেন, এত চিন্তা কিসের?"

উদয়নারায়ণ বক্র-কটাক্ষে শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া, উপাধানের উপরেই একটু সরিয়া উঠিলেন। চিন্তাক্রান্ত অধরে হাসির ক্ষীণরেখা অঙ্কিত হইল। বলিলেন,—"হাঁ, একটা বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, বটে।"

শ্রীমতী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মৃদুহাস্য-স্বরে বলিলেন,—"কথাটা বোধহয় রাজনীতির গূঢ়তত্ত্বে জটিল ও কুঞ্চিত? মেয়েমানুষের সুখের স্নিগ্ধ অল্পমস্তিষ্কে প্রবেশস-ম্ভাবনা কম!"

উদয়নারায়ণ আরও একটু উঠিয়া বালিসে ঠেসান দিয়া পার্শ্বপতিত আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে ক্রমাগত কয়েকটা টান দিলেন এবং নিঃশেষপীত ধূমপটলে শয্যাতপ আচ্ছন্ন করিয়া শ্রীমতীকে বলিলেন,—"হাঁ, বিষয়টা রাজনৈতিকই বটে।"

শ্রী। আমার বিবেচনায় ও শুষ্ক জটিলতত্ত্বের আলোচনার উপযুক্ত স্থান অস্ত্র-ঝনঝনাময় বহিঃপ্রকোষ্ঠেই ভাল। সেখানে পরামর্শ দিবার লোকও দুই একজন পাওয়া যায়।

উ। আর অন্তঃপুরে?

শ্রী। এখানে যা পাওয়া যায়, তারই চিন্তা করা ভাল,—বাঁশবনে

রসালের তল্লাস পণ্ডশ্রম মাত্র। এমহলে প্রেম, স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি। এখানে তোমাদের শুষ্ক-কঠোর রাজনীতির চর্চ্চাটা তত প্রীতিপ্রদ নয়।

উ। আমার চিন্তনীয় বিষয় রাজনৈতিক বটে,—কিন্তু ব্যাপারটা কিছু ভিন্ন রকমের।

শ্রী। শুনিতে পাই না কি?

উ। রাজনীতির উপর যার জাতক্রোধ, সে, সেবিষয় শুনিবে কেন?

শ্রী। একটু ভিন্ন রকমের বলিয়া শুনিতে ইচ্ছা,—রকম ফেরতা হইলেই লোকের নূতন বলিয়া সব বিষয়ই ভাল লাগে।

উ। কথাটা তোমার চিত্তাকর্ষণ করিবে বলিয়া বোধ হয়।

শ্রী। তবে বল।

উ। কা'ল সন্ধ্যার সময় বিনোদের উদ্যানে আমি যখন শ্রান্তি অপনোদন জন্য গমন করি, তখন সেখানে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে আসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

শ্রী। তার বাড়ী কোথায়?

উ। সে গোষ্ঠবিহারের রাজার মেয়ে।

শ্রী। তারপর?

উ। তার বাবাকে বাকি রাজস্বের দায়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বন্দী করিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সে অনেক কৌশলে তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া লইয়া পলায়ন করে। এখন ভয় হইয়াছে, ধরিতে পারিলে নবাব তাহাদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবে,—তাই আমার শরণাপন্ন হইয়াছে।

শ্রী। রাজাও আসিয়াছেন?

উ। হাঁ।

শ্রী। কোথায় আছেন?

উ। বিনোদের বাড়ীতে। রাজার কি রাজশ্রী আছে,—ভিখারীর মত কন্যা লইয়া অবস্থিত। শুনিয়াছি, তিনি অত্যন্ত পীড়িত।

শ্রী। তা সে বিষয়ে আর চিন্তা কি? দিনকত থাকুন,—একটু যত্ন করিবার বন্দোবস্ত করিও। শরণাগত, পীড়িত, ব্রাহ্মণ ও রাজ-অতিথি।

গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণ বলিলেন,—"তত সহজ নহে। তোমার মত মন্ত্রী যত সহজ বলিয়া এবিষয় বিবেচনা করিতে পারে, কাজটা তত সরল ও সহজ নহে।"

শ্রী। সহজ বা কঠিন বুঝি না। মেয়েমানুষ অত যদি বুঝিবে, তবে ইষ্টকস্তূপের মধ্যে কেবল হাসি-কান্না লইয়াই দিন কাটাইবে কেন? তা যাক্,—আমি যা বুঝি তা বলিব?

উ। বল?

শ্রী। যাতে শরণাগতের রক্ষা হয়, তা করিও।

উদয়নারায়ণও বলিলেন,—"শরণাগতের রক্ষাই হিন্দুর একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু মুসলমান তাহা বুঝিবে কি? রাজা তাহা শুনিবেন কি?"

তারপর অন্যান্য নানাকথার পরে শ্রীমতী উঠিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন, এবং উদয়নারায়ণ নিদ্রিত হইলেন।

যখন বৈকালের রৌদ্র ধরাতল হইতে বিদায় লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিল, তখন উদয়নারায়ণ রায়, সেনাপতি গোলামমহম্মদ, সহকারী সেনাপতি কালিয়া বা কালুজমাদার, ভাগিনেয় বিনোদলাল, কুলপুরোহিত পূর্ণানন্দ তর্করত্ন ও পুত্র সাহেবরামকে লইয়া এক নিভৃত কক্ষে মন্ত্রণা করিতেছিলেন।

গোষ্ঠবিহারের রাজা ও তৎকন্যা কল্যাণীর বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের নিকটে আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া উদয়নারায়ণ রায় বলিলেন,—"এসম্বন্ধে আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহারই পরামর্শ চাহিতেছি। যাহার যেরূপ বিবেচনা হয়, আমাকে বল।"

তর্করত্নঠাকুর বলিলেন,—“মহারাজ; শরণাগতের রক্ষাই মানবের সনাতন ধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্ম সাধ্যানুসারে প্রতিপাল্য। মনে কর, অন্ত্যজ-জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিতে নাই, কিন্তু পীড়িতের পক্ষে তাহা পানে বিশেষ দোষ নাই;—অতএব সাধ্যপক্ষে ধর্ম্মরক্ষা করিবে।”

সাহেবরাম বলিল,—“একথার অর্থ কি ঠাকুর?”

তর্ক। অর্থ এই যে, সাধ্যমতে তাহাদিগকে রক্ষার চেষ্টা কর। অসাধ্য হইলে আর কি করিবে।

সা। তাহারা আপনার আশ্রম-কুটীরে সাহায্যার্থে গমন করে নাই। সাধ্যাসাধ্য বিচার করিয়াই লোকে সাহায্যপ্রার্থী হয়। এক বিশাল প্রাসাদের অধিস্বামী, বহু ধনরত্ন হয় হস্তী সৈন্য-সামন্তের অধীশ্বর, মহারাজ উদয়নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছে।

উদয়নারায়ণের নয়নকোণে আনন্দাশ্রু দেখা দিল! তর্করত্নঠাকুর বলিলেন,—“যুবরাজ; স্বকীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বকীয় শক্তি-সামর্থ্যের তত্ত্ব বুঝিয়া তবে কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য।”

সা। আপনার কথার অর্থ কি।

ত। আমি বলিতেছি, পলায়িত এবং আশ্রিত রাজাকে ও তাঁহার কন্যাকে গোপনে আশ্রয়দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা হউক যে, নবাব-পক্ষ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা হইতেছে,—তার-পরে পরোক্ষভাবে মুক্তির উপায় দেখা হউক।

সা। যদি ঐরূপভাবে তাঁহাকে আশ্রয় দিবার সুবিধা না হয়।

ত। তখন তাঁহাদিগকে এখান হইতে বিদায় করিতে হইবে।

সা। শাস্ত্রপাঠ-নিরত হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কথা ইহাই,—কিন্তু মহারাজ উদয়নারায়ণ তাহা পারেন না।

ত। না পারা অন্যায়।

সা। ঠাকুর! রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, হয়, হস্তী, সৈন্য, সামন্ত, দুর্গ, প্রাকার,

গড় এ সকল কি কেবল শোভার জন্য? অত্যাচারিত এক বৃদ্ধ ও অত্যাচারিতা এক রমণীর সাহায্য করিবার—আশ্রয় দিবার শক্তি সামর্থ্যও যাহাদের নাই,—তাহাদের এসকল আড়ম্বর কেন?

ত। কিন্তু মুসলমান-শক্তির নিকট এসকল সমুদ্র-প্রবাহের নিকট ক্ষুদ্র তৃণ।

উদয়নারায়ণ পুত্রকে তর্কে নিবৃত্ত করিয়া, সেনাপতি গোলাম মহম্মদের মুখেরদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনার গুণে ও সাহায্যে আমি বিশেষ ঋণী। আপনার বাহুবলে আমার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। আপনার বন্ধুত্বে আমি অত্যন্ত প্রীত,—এস্থলে আমার কি করা কর্ত্তব্য?"

গোলামমহম্মদ জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"মহারাজ,—আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু; সে কথা ভুলিয়াগিয়াছি। আপনার দয়া ও বন্ধুত্বে আমি আজীবন আপনারই কার্য্য করিব—আপনারই হিত করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। মহারাজ; আমার স্বজাতি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার সাহার্য্যার্থে দুইশত সৈন্য ও সহকারী কালিয়াজমাদারকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দেন। আপনি কৃপা করিয়া এখন আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি করিয়াছেন,—বন্ধু-শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। আমি যাহা বলিব,—প্রাণের সহিতই বলিব, ভরসা করি, বিধর্ম্মী বলিয়া অবিশ্বাসী হইবেন না।"

উদয়নারায়ণ দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি; তোমার প্রতি অবিশ্বাস! ভগবান্ যেন সেদিন কখনও না করেন।"

গো। তবে আমার কথা শুনুন; আপনি শরণাগত স্বজাতি রাজাকে পরিত্যাগ করিবেন না। মনে করুন মহারাজ! আপনার স্বজাতি জমিদারগণ কিরূপ অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ হইতেছে,—পশুতে যে অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না,—আমার স্বজাতিগণ উচ্চপদ-গৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গীয় ভূস্বামিগণের প্রতি সেই অত্যাচার করিতেছেন। আপনার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে,—আপনি কি স্বদেশীয়গণের চক্ষুর

জল মুছাইতে চেষ্টা করিবেন না? শক্তি থাকিতে যে অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ না করে, তাহার আত্মা কখনই উৰ্দ্ধলোকে গমন করিতে সক্ষম হয় না।

ত। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের সংঘর্ষে দুর্ব্বলেরই পতন। প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করা, দুর্ব্বলের অসাধ্য। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ রাজাকে যথোচিত ভক্তি ও খাতির করেন, উঁহাকে এই বিশাল রাজত্বের অধীশ্বর করিয়াছেন, এতদবস্থায় তাঁহার সহিত লড়াই বাধান কর্ত্তব্য নহে।

সাহেবরাম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল,—"ঠাকুর; এখনও বলিতেছেন, বিনা কারণে? তবে কারণ কাহাকে বলে? সমস্ত বঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে, সমস্ত বঙ্গের ভূস্বামিগণ অত্যাচারের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে,—ইহা নিবারণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে?

তর্করত্ন মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—অত্যাচার বাহিরে ছিল, ঘরে টানিয়া আনিবে। শাস্ত্রে বলে, প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে হইলে ধৈর্য্য চাই।

সা। রেখে দাও ঠাকুর শাস্ত্র,—সকল সময় শাস্ত্র-কথা মানা যায় না,—অস্ত্র ব্যবহারও মধ্যে মধ্যে চাই।

ত। কিন্তু সমশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য।

উদয়নারায়ণ রায় বলিলেন,—"ঠাকুর; আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি! আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিলে নরকে যাইতে হইবে। এদিকে প্রবল মুসলমান-শক্তি;—কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তর্করত্ন বলিলেন,—"আমি যে উপায় বলিলাম, সেই পথই অবলম্বন করুন। অবশ্য তাঁহারা আসিয়াছেন,—তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করুন, তাতে কিছু অর্থ ব্যয় হয়, তাও করুন;—তাতে না হয় যুদ্ধ-হাঙ্গামের মধ্যে যাওয়া হবে না।"

সা। আবার বলিতেছি, তাহা হইবে না। প্রাণ থাকিতে আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা যাইবে না। যে আসিয়া শরণাগত হইয়াছে, তাহাকে কখনও বলা যাইতে পারিবে না যে, আমাদের আশ্রয় হইতে তোমরা দূর হও—আমরা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার আয়োজন করি। এত দিন ধরিয়া যে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, সে কি দরিদ্র প্রজার কর আদায় করিবার জন্য, না মুসলমানের আদেশ বহিবার জন্য! যায় রাজসাহী রাজত্ব গঙ্গারজলে ভাসিয়া যাইবে,—যায় সাহেবরামের প্রাণ নবাবের ফাঁসিকাষ্ঠে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুকের গুলিতে যাইবে,—যে প্রাণভয়ে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে ছাড়িতে পারিব না, জীবন থাকিতে তাহাকে বলিতে পারিব না,—তোমরা মরণের পথে অগ্রসর হও; আর আমরা রাজভোগের আয়োজন করিয়া লই।

উদয়নারায়ণ পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। গোলামমহম্মদ, কালিয়া জমাদার, বিনোদলাল প্রভৃতি সকলেই বলিলেন,—"আশ্রিতকে রক্ষা করিতে হইবে। তবে লড়াই-হাঙ্গামের দিকে না গিয়া যদি অন্য প্রকারে সে কার্য্য সমাধিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।"

তর্করত্ন ঠাকুর বলিলেন,—"স্তব স্তুতিতে পার, তাহাদিগকে রক্ষা কর, অর্থে বশীভূত করিয়া পার, অর্দ্ধেক রাজত্বের আয় প্রদান কর, —কিন্তু লড়াই হাঙ্গামের মধ্যে কদাচ যাইও না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের উচিত। রত্নাকরে রত্ন আছে বলিয়া যদি কোন দরিদ্র কলসী লইয়া জল সেচিতে বসে, তবে কি তাহার দরিদ্রতা বিদূরিত হয়? তাহা হয় না,—অধিকন্তু দারিদ্র্য আরও ঘনাইয়া আসে। তবে কোন অগস্ত্য উপস্থিত হইলে এক চুমুকে সমুদ্র শোষন করিয়া সমস্তরত্ন বিতরণ করিতে পারেন।"

তারপরে পরামর্শ স্থির এই হইল যে,—"গোষ্ঠবিহারের রাজাকে

অনুগ্রহ করিবার জন্য—তাহাকে দয়া করিবার জন্য বিনোদলাল আগামী কল্য প্রত্যুষেই মুর্শিদাবাদ গিয়া নবাব মুর্শিদকুলীকে অনুরোধ করিবে। তদর্থে কিছু অর্থদণ্ডের সহিত তাঁহার বাকি রাজস্ব রাজা উদয়নারায়ণ মিটাইয়া দিবেন।”

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। তারপরে ঘটনাচক্রে যেরূপ ঘটিয়া উঠে, সেইরূপ ব্যবস্থাই হইবে।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতকালে প্রায় দুইশত অস্ত্রধারী সৈন্য, কয়েকজন সিপাহী ও সহকারী সেনাপতি কালিয়াজমাদারকে এবং বিবিধ মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি সঙ্গে লইয়া রাজা উদয়নারায়ণের ভাগিনেয় মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিলেন।

সেখানে গিয়া প্রথমে নিজেদের বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জনৈক বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ দূতকে পলায়িত গোষ্ঠবিহারের রাজার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে ;—তাহা গোপনে ও বিশেষভাবে জানিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন।

মধ্যাহ্ন-আহারাদির পূর্ব্বেই সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সংবাদ কি ?"

কর্ম্মচারী বলিল,—"গোষ্ঠ বিহারের রাজার পলায়নে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। কারাধ্যক্ষকে নবাব সাহেবের প্রদত্ত পাঞ্জা ও মহম্মদ রেজাখাঁর আদেশ পত্র দেখাইয়া রাত্রে রাজাকে খালাস করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে রেজা খাঁ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন,—সে পাঞ্জা না কি নেফিসা বেগমের।"

বিনোদলাল হাসিয়া বলিলেন,—তার পর।

ক। রাজাকে যখন লইয়া যায়, তখন কারাধ্যক্ষ একজন গুপ্তচর

পশ্চাতে দিয়াছিল,—সে নাকি দেখিয়া আসিয়াছে, এক খানা ছিপে করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। গুপ্তচর ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ পান্সী ভাসায়। কিন্তু যে খানে গিয়া ছিপের সন্ধান পায়, সেখানে গিয়া দেখে—ছিপ্ শূন্য। তাহারা সন্দেহ করে, বিনোদের কাছে ছিপ্ একবার লাগিয়াছিল। বোধ হয় রাজা ও রাজার উদ্ধারকারী সেই স্থানে নামিয়া গিয়াছিল। তাহারা অনুমান করে, রাজা বিনোদের পথেই গিয়াছে।

বি। রাজাকে ধরিবার জন্য কোন ব্যবস্থা হইতেছ নাকি?

ক। হঁা। বিনোদের দিকে দুইজন গোয়েন্দা গিয়াছে। আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

বি। কি?

ক। গোষ্ঠবিহারের রাজার বাসাবাড়ীতে একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, একজন দাসী ও অন্যান্য কয়েকজন লোকছিল, যে রাত্রে রাজা পলায়ন করেন,তাহারাও সেইরাত্রে নৌকাযোগে গোষ্ঠবিহারাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল। কারাধক্ষ্যের নিকট প্রভাত না হইতেই রাজার পলায়নের কথা সংবাদপাইয়া গোষ্ঠবিহারের দিকে ছিপে করিয়া কয়েকজন সিপাহী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, দাসী এবং অন্যান্য লোকদিগকে নৌকা শুদ্ধ ধরিয়া আনে।

বি। এখন বোধহয় তাহাদিগকে কারাগারে রাখিয়াছে?

ক। কারাগারে রাখিলেত রক্ষা ছিল। প্রথমে রাজা কোথায় গেল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়,—তাহারা সে বিষয়ের কিছুই না বলিতে পারায়, তাহাদিগকে একে একে তরবারির দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়।

বি। সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও?

ক। হাঁ।

বি। কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মহত্যা-সংবাদ প্রথমেই শ্রবণ করিলাম! ভগবান্!—বাঙ্গালী আর কত অত্যাচার অবিচার সহ্য করিবে!

তারপর সন্ধ্যারপরে বিনোদলাল সমানীত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া নবাব দরবারে উপস্থিত হইলেন।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ অতিসূক্ষ্মদর্শী ও কর্ম্মকুশল নবাব ছিলেন। বিনোদলাল তাঁহার সম্মুখে উপঢৌকনাদি লইয়া উপস্থিত হইলে, যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজা উদয়নারায়ণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদলাল অভিবাদনাদি করিয়া রাজা ও রাজবাটীর কুশল জ্ঞাপন করিয়া নবাবসাহেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। এ সকল কথোপকথনের পর, নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাকে উদয়নারায়ণ কি জন্য পাঠাইয়াছেন ?"

বি। অনেকদিন জাঁহাপনার কুশলাদি অজ্ঞাত আছেন, সেই জন্য একবার আমাকে পাঠাইলেন।

মু। সেত বটেই,—তথাপিও একটু কোন কাজ অবশ্যই আছে।

বি। গোষ্ঠবিহারের রাজা না কি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন ?

মু। হাঁ।

বি। তিনি মহারাজ উদয়নারায়ণের কুটুম্ব।

মু। ঐ কার্য্যের জন্যই বোধহয় আসিয়াছ ?

বি। সে বিষয়েও কিছু বলিবার আছে।

মু। কি বলিবার আছে ?

বি। তাহার যে দেয় রাজস্ব বাকি আছে, তাহা রাজা উদয়নারায়ণ মিটাইয়া দিতেছেন। তাঁহার পলায়নজন্য যে অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য সম্ভবমত দণ্ডস্বরূপ অর্থদানেও স্বীকৃত আছেন,—অতএব রাজা উদয়নারায়ণের প্রতি কৃপা করিয়া গোষ্ঠবিহারের রাজাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

মু। সম্ভবতঃ গোষ্ঠবিহারের রাজা তোমাদের আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকিবে। গুপ্তচর জানিয়া আসিয়াছিল, তাহারা বিনোদের নিকটেই রাখিয়া ছিল।

বি। আমি তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু যখন কুটুম্ব, তখন ধরিয়া লউন আশ্রিত। জাঁহাপনা; এরূপা করিতেই হইবে।

মু। বিনোদলাল; এ কথার উত্তর আমি এখন প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মহম্মদরেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের নায়েবদেওয়ান। গোষ্ঠবিহারের রাজা তাঁহারই আসামী, আমার নহে। সুতরাং তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কখনই ইহার উত্তর দিতে পারি না।

বি। জাঁহাপনা; আপনি বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার অধীশ্বর,—আপনি যাহা করিবেন, তাহার উপর কথা কহিবার কেহ নাই। রাজা উদয়-নারায়ণ আপনার আজ্ঞাবহ গোলাম,—গোলামের প্রতি দয়া করিয়া গোষ্ঠবিহারের রাজাকে অব্যাহতি দান করিতেই হইবে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাঁহার মুখমণ্ডলে চিন্তার প্রতিভা কখনও ফুটে, কখনও নিভে। বিনোদলাল একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার-পরে নবাব বলিলেন,—"গোষ্ঠবিহারের রাজা যদি জেল ভাঙ্গিয়া বা অন্য কোন উপায়ে পলায়ন করিত, সে সম্বন্ধে সহজেই একটা কিছু করা যাইত। তাহার লোকে যে পাঞ্জা দেখাইয়া গিয়াছে—সে পাঞ্জা লইয়া একটু বিশেষ কথা আছে। অতএব তাহাকে চাই।"

বিনোদলাল নতজানু ও যোড়কর হইয়া বসিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা; রাজা উদয়নারায়ণের একান্ত অনুরোধ,গোষ্ঠবিহারের রাজাকে মুক্তিপ্রদান করিতে হইবে।"

মুর্শিদকুলী খাঁ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সে বিবেচনা পরে করা যাইবে। আপাততঃ আসামী হাজির চাই। আসামী থাকিল এক দেশে, আর এক দেশে বসিয়া ক্ষমা হইতে পারে না। এরূপ করিলে সমস্ত জমিদারগণ অশাসিত হইবে। অতএব, উদয়নারায়ণকে বলিবে, আসামী হাজির করিয়া দিয়া যে প্রার্থনা থাকে, তাহা যেন করেন।"

বিনোদলাল আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ম্লানমুখে যথারীতি কুর্ণিস্ করিয়া চলিয়া গেল।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"উদয়নারায়ণ; তোমাকে একটু জব্দ করিবার চেষ্টা অনেকদিন হইতে করিয়া আসিতেছি। অনেকদিন হইতে তোমার প্রতাপ ও শক্তিদমনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি,—এইবার তাহার সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।"

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে উদয়নারায়ণকে ভাল বাসিতেন, তাঁহার কর্য্যদক্ষতা ও প্রতিভা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। বিশাল জমিদারীর ভার উদয়নারায়ণের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন,—উদয়নারায়ণও তাহা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে ছিলেন। উদয়নারায়ণের জমিদারী মধ্যে এক সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় নবাব উদয়নারায়ণের সাহায্য করিবার জন্য জমাদার গোলামমহম্মদ ও কালিয়া বা কালুজমাদারকে অনেকগুলি সৈন্যসহ প্রেরণ করেন, এবং আদেশ করেন যে, তাহারা রাজার সম্পূর্ণ অধীন ও আজ্ঞাবহ থাকিয়া কার্য্য করিবে। আদিষ্টকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, গোলামমহম্মদ ও কালিয়াজমাদার রাজার বেতনভোগী সেনাপতি হইয়া তাঁহার অধীনেই কার্য্য করিতেছিল। উদয়নারায়ণের সুশাসনে এবং গোলামমহম্মদের কার্য্যনিপুণতায় রাজসাহী সকল জমিদারীর আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা উদয়নারায়ণ সুবে বাঙ্গলার সমুদায় ভূস্বামিগণের শীর্ষস্থানে অবস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতিপত্তি ও শক্তি দূরব্যাপিনী হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদর্শী ও কুটিলবুদ্ধি নবাব ভাবিলেন, উদয়নারায়ণের ও গোলামহম্মদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে,—উদয়নারায়ণ যেরূপ উপযুক্ত রাজা ও গোলামমহম্মদ যেরূপ উপবুক্ত এবং কার্য্যকুশল যোদ্ধা—উভয়ের সংযোগে কালে তাহারা অনেকপ্রকার বিপ্লব ঘটাইয়া তুলিতে পারিবে। এজন্য তিনি গোলামমহম্মদকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,

কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এই হেতু তিনি মনে মনে উদয়-নারায়ণকে একটু দমন করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। বর্ত্তমানে এই ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় তিনি ভাবিলেন,—রাজা উদয়নারায়ণ যেরূপ ধার্ম্মিক ও ক্ষমতাশালী, তাহাতে কখনই সে আশ্রিত কুটুম্বকে আমার নিকট হাজির করিবে না,—আমিও এই সূত্র লইয়া তাহাকে একটু দমন করিয়া ছাড়িয়া দিব।

বিনোদলাল বাসাবাড়ীতে আগমন করিয়া সেই রাত্রেই বড় নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎপর দিবস যথাসময়ে বিনোদলাল রাজা উদয়নারায়ণের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন।

এদিকে তৎপূর্ব্ব দিবসেই কথিতমতে কল্যাণী আসিয়া বড়নগরের রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে বিনোদলাল ফিরিয়া না আসায় রাজা তাহাকে কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। কাজেই সে, শেষকথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পিতা বিনোদের রাজপ্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।

রাজা স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া যখন বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত মুখখানা চিন্তাক্লিষ্ট।

শ্রীমতী ঠাকুরাণী আহারীয়ের নিকটে একখানি বহুমূল্য ব্যজনী হস্তে করিয়া বসিয়া ছিলেন,—রাজা গিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

শ্রীমতী ঠাকুরাণী কোমল-করধৃত ব্যজনী সঞ্চালন করিতে করিতে নানাবিধ গল্পের অবতারণা, সমালোচনা ও উপসংহার করিতে লাগিলেন, উদয়নারায়ণ আহার করিতে করিতে এক একবার হুঁ হাঁ করিয়া গল্পের সার্থকতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আহার সমাপ্ত হইল। দাসী সুগন্ধি আচমনীয় জল আনয়ন করিলে আচমন ক্রিয়া সমাধানান্তে পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। রাণী

শ্রীমতী স্বর্ণ-ডিবা হইতে তাম্বূল বাহির করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলে, রাজা বলিলেন,—"তবে যাও।"

শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াইলে অসুখ করে না কি?"

উদয়নারায়ণও হাসিলেন। বলিলেন,—"তুমি সুখী হইলেত আমি সুখী হইব। তোমারত খাওয়া হয় নাই?"

শ্রী। ভোগের আগে প্রসাদ পাব নাকি?

উ। তাইত বলিতেছি।

শ্রী। যাইতেছি।

উ। কোন কথা আছে নাকি?

শ্রী। না, এমন কিছু না।

উ। তবু তেমন কিছু যা থাকে, তা বল।

শ্রী। সেই মেয়েটার কথা বলিতেছিলাম।

উ। কোন্ মেয়েটা?

শ্রী। গোষ্ঠবিহারের রাজকন্যার কথা।

উ। হাঁ হাঁ;—সেইত সর্ব্বনাশের কথা।

শ্রী। কেন তার কি হ'ল? বিনোদলালত ফিরে এসেছে।

উ। ফিরেত এসেছে,—কিন্তু কোন ফল হয় নাই, বরং বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রী। কি হইয়াছে?

উ। রাজার পক্ষ হইতে অনুরোধ করায়, নবাব বুঝিয়াছে, আমাদের আশ্রয়েই রাজা অবস্থিতি করিতেছেন,—এক্ষণে তাঁহাকে হাজির করিয়া-দিবার জন্য আদেশ করিয়াছে।

শ্রী। তোমরা কি করিবে?

উ। কি করিব,—এখন কেমন করিয়া বলিব কি করিব! ব্যাপার যেরূপ গুরুতর—তাহাতে সহজে বলা যায় না কি করিব।

শ্রী। টাকা দিতে চাও নাই কেন? শুনিয়াছি,—নবাবেরা টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট।

উ। তাতে কোন ফল হয় নাই।

শ্রী। আমি একটা কথা বলিব?

উ। নিষেধ কি?

শ্রী। মেয়েটার বাপ যাতে রক্ষা পায়, তা করিও। তার ছল ছল চোখ দুটি যেন আমার প্রাণের মধ্যে খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে।

উ। সহজে পারা যাইবে না।

শ্রী। তত সহজ তারাও বোঝে নি। তাহা হইলে তোমার শরণাগত হইত না।

উদয়নারায়ণ বলিলেন,—"এখন তুমি আহার করগে, পরামর্শ করিয়া যাহা হয়, আমরা করিব।

রাণী আরও কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন রাজা শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পরে যথাসময়ে রাজা সকলকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—"শরণাগতকে কখনই পরিত্যাগ করা হইবে না। শরণাগতের রক্ষার্থে যথা-সর্ব্বস্ব পণ।"

গোলামমহম্মদ সম্পূর্ণভাবে এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, তিনি উৎসাহবাক্যে বলিলেন,—"নবাব যদি এত অশান্তই হয়েন; এত অত্যাচার করিতেই যদি প্রবৃত্ত হয়েন; আমি কোরাণ ও তরবারি স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, দেহে রক্তবিন্দুর অবস্থানকাল পর্য্যন্ত আপনার সহায়তাজন্য প্রাণপণ করিব।"

তখন এই স্থির হইল যে, গোষ্ঠবিহারের রাজা ও তাহার কন্যাকে ও রাজান্তঃপুরচারিণীগণকে বীরকিটির রাজভবনে প্রেরণ করা হউক। এবং সেখানকার দুর্গ, প্রাকার প্রভৃতির সংস্কার, অস্ত্রশস্ত্র ও বন্দুক কামানের

নির্ম্মাণ, বারুদ গোলা-গুলি প্রভৃতি প্রস্তুতকরিবার বন্দোবস্ত করা হউক। সৈন্যবল বৃদ্ধিরও বিশেষ চেষ্টা করা হউক।

এই কার্য্যভার গোলামমহম্মদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কথা হইল, যদি সহজে ও নির্ব্বিবাদে রাজাকে বাঁচান যায়, তবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হইবে না।

কল্যাণী সে কথা শুনিয়া রাজা উদয়নারায়ণের মঙ্গল প্রার্থনা ভগবানের নিকটে প্রাণ ভরিয়া করিল।

তারপরে যথাসময়ে তাহার পিতাকে বিনোদের বাসভবন হইতে আনাইয়া রাজান্তঃপুরচারিনীগণের সহিত বীরকিটির রাজভবনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সেনাপতি নালডুগারির অধীনে বহু সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া গোবিন্দরাম যথাসময়ে বিনোদপুরে পঁহুছিয়াছিলেন। সেখানকার বিদ্রোহিগণও নিশ্চিন্ত ছিল না,—তাহারা যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া যুদ্ধ-প্রতীক্ষা করিতেছিল। যশোহর হইতে ফৌজদার সাহেবের অনেক ফৌজ আনিয়াও রাখিয়াছিল। উভয়দলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল,— প্রায় পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। কত জীবন অস্ত হইল, কতজন ভূমি চুম্বন করিল,—কত গৃহ শূন্য হইল,—কত রক্তে বসুমতী রঞ্জিত হইল, কিন্তু অবশেষে বীর নালডুগারির শক্তিই জয়লাভ করিল। বিদ্রোহিগণ লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করিল। ফৌজদার সাহেবের ফৌজগণ কতক পলাইয়া গেল, কতক মরিয়া বাঁচিল। প্রধান বিদ্রোহী রামশরণ পলায়ন করিল।

তখন সসৈন্যে গোবিন্দরাম বিনোদপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রাম তখন প্রায় জনশূন্য—কেবল যাহারা দুর্ব্বল, দুঃস্থ, নিরন্ন ও পীড়িত তাহারাই গ্রামে ছিল।

গোবিন্দরামের নিষ্ঠুর আদেশে পলায়মান বিদ্রোহী প্রজাগণের গৃহে গৃহে আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। গৃহ হইতে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লুঠিয়া আনা হইতে লাগিল,—অপরাধীর সহিত নিরপরাধী

দরিদ্রগণও গৃহ শূন্য হইয়া পথে বসিতে লাগিল। কেবল বিনোদপুর নহে, বিনোদপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়া সমগ্র দেশে হাহাকার তুলিয়া দিয়া গোবিন্দরাম অনেক অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ভাবিলেন, এই অত্যাচারের অর্থে অত্যাচারিত পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন। তারপর যুদ্ধের মূল কারণ সেই 'কানের' মেয়েকে একবার অনুসন্ধান করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সন্ধান মিলে নাই।

বিনোদপুর দিগর শ্মশানে পরিণত করিয়া গোবিন্দরাম গোষ্ঠবিহারে পঁহুছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের সংবাদ শ্রবণে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

রমানাথঠাকুর জলে সাঁতার কাটিতে বড় মজবুদ। ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া সে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিত। যখন নবাবের সিপাহী নৌকা পাকড়া করে, তখন রমানাথ সকলের অলক্ষ্যে জলে নামিয়া পলায়ন করিয়া গোষ্ঠবিহারে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বাড়ীর দেওয়ান শেষ সংবাদ জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে লোকও ফিরিয়া আসিয়াছে,—রাজা ও কল্যাণীর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই।

গোবিন্দরাম সংবাদ শুনিয়া শোকের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় ব্যথিত-কাতর হইলেন। তারপর, মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায়, আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতির যুক্তিতে গোবিন্দরাম রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। গোপীকৃষ্ণ প্রাচীন হইয়াছেন,—বিশেষতঃ যেরূপ ঘটনা, তাহাতে যে আর তিনি ফিরিয়া আসিবেন, সে আশা কম। যদিই আইসেন, উপযুক্ত পুত্রের হস্তে বিষয়কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইষ্টচিন্তন, তাঁহার পক্ষে উত্তম কল্প। যন্ত্রণা সহ্য করা, বিষয়চিন্তা করা, এখন আর শোভা পাইবে না।

গোবিন্দরাম রাজা হইলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার

করিল। গোবিন্দরামকে সকলে গন্দরাজা বলিত। গোবিন্দ স্থলে বাল্য-কাল হইতেই সকলে তাঁহাকে গন্দ বলিত।

এই রাজ্যাভিষেকে ধূমধাম কিছুই হয় নাই,—তবে প্রজাগণকে জানাইবার জন্য যতটুকু আয়োজনের প্রয়োজন, তাহাই হইয়াছিল।

গোবিন্দরাম রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই নালডুগারির সহিত পরামর্শ আঁটিলেন। যশোহরের ফৌজদার সাহেবের ফৌজগণকে যেরূপে নিহত ও লাঞ্ছিত করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। প্রতিশোধার্থ একবার তাঁহার কামানের শব্দ ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনিতেই হইবে। অতএব, পূর্ব্ব হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন। তদর্থে তাঁহারা সৈন্যবল বৃদ্ধি ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগি-লেন,—অস্ত্র-শস্ত্রের গঠন ও সংস্কার কার্য্য চলিতে লাগিল।

গোপীকৃষ্ণরায়ের সময়ে প্রজাগণ যে অবস্থায় বসতি করিতেছিল, গোবিন্দরামের আমলে তাহার পরিবর্ত্তন হইল। গোপীকৃষ্ণরায় কেবল মিষ্ট কথায় প্রজাপালন করিতেন, গোবিন্দরাম এক হাতে অস্ত্র, অপর হাতে অভয় ও শান্তি লইয়া প্রজা শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকর আদায়ের পূর্ব্বে শিথিলতা ছিল, এখন বিশেষ কড়াকড় হইয়া দাঁড়াইল। আগে দস্যু-তস্করের প্রতি ক্ষমা ছিল, এখন তাঁহাদিগের মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন আর কথা নাই। যাহারা অশিষ্ট তাহারা কাঁপিয়া উঠিল,—শিষ্টেরা সুখের রাজ্য বলিয়া মনে করিল।

যশোহরের ফৌজদার সাহেবের যে সকল ফৌজ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বিধ্বস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট গোবিন্দরামের প্রতাপের কথা শুনিয়া ফৌজদার সাহেব গোবিন্দ-রামের উপরে জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, আবার রামশরণ প্রভৃতি গিয়া তাঁহার শরণাগত হইল ও প্রচুর অর্থ-দ্বারা পূজা করিল। কিন্তু তখন-কার নিয়ম ছিল, কোন রাজা বা ভূস্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য লড়াই করিতে

হইলে, ফৌজদারদিগকে নবাবের অনুমতি লইতে হইত। কাজেই ফৌজদার সাহেব একাইক কিছুই করিতে না পারিয়া, গোষ্ঠবিহারের যুবরাজের অত্যাচার-কাহিনী অতি বিস্তৃত ভাবে ও সালঙ্কারে মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে লিখিয়া পাঠাইলেন।

সেই সময় গোষ্ঠবিহার রাজার পলায়নের ব্যাপার লইয়া মুর্শিদাবাদে হুলস্থূল চলিতেছিল। সেই সময় রাজা উদয়নারায়ণ, গোষ্ঠবিহারের রাজার মুক্তির জন্য বিবিধ প্রকারে নবাবের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং গোপনে গোপনে সমরের আয়োজনও করিতেছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁও বুঝিয়াছিলেন, উদয়নারায়ণ সহজে আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে না, এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন, উদয়নারায়ণকে দমন করাও সহজ ব্যাপার নহে। তজ্জন্য তিনিও এক বিশাল সমরাভিনয়ের উদ্যোগে ছিলেন। এই জন্যই গোষ্ঠবিহার রাজপ্রাসাদ বিধ্বংস করিতে ও রাজার জমিদারী অন্যকে বন্দোবস্ত করিতে কিছু কাল বিলম্ব করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন। কেননা, দুইটি স্থানে যদি একই সময়ে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে কিছু বিপদের সম্ভাবনা। সেই জন্যই সে সময় গোষ্ঠবিহারে সৈন্য প্রেরণ করা হয় নাই।

এই সময় যশোহরের ফৌজদার সাহেবের পত্র পাইয়া নবাব সুযোগ বুঝিলেন। এবং যে লোক পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহার নিকট অবগত হইতে পারিলেন যে, সম্ভবতঃ দশসহস্র-দেশীয় প্রজা অর্থ ও সামর্থ দ্বারা গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে ফৌজদার সাহেবের সহায়তা করিবে।

তখন সুবিধা বুঝিয়া নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ ফৌজদার সাহেবকে অনুমতি পত্র পাঠাইয়া দিলেন,—গোষ্ঠবিহার আক্রমণ করিয়া গোবিন্দরামকে বাঁধিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ।

রাজা উদয়নারায়ণ স্ত্রী-পরিবার বালক বালিকা আত্মীয়-স্বজন ও ধনরত্নাদি সমস্ত, সুরক্ষিত বীরকিটির রাজভবনে পাঠাইয়া দিয়া, এবং গোলামমহম্মদকে যুদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত করিয়া, নিজের বড়নগরে থাকিয়া লোক পাঠাইয়া নবাব মুর্শিদকুলীখাঁকে বিবিধ প্রকারে স্তব বিনয় করিতেছিলেন। যাহাতে নবাব গোষ্ঠবিহারের রাজাকে ক্ষমা করেন, ইহাই মাত্র প্রার্থনা ছিল। তজ্জন্য নবাব যত টাকা চাহেন, উদয়নারায়ণ তাঁহার রাজকোষ শূন্য করিয়াও তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নবাবের সেই একই কথা,—আসামী হাজির না করিলে, সে সম্বন্ধে কি করা হইবে না হইবে, তাহা বলা যাইবে না।

যাহার জন্য এত কাণ্ড চলিতেছিল, সেই হতভাগ্য রাজা গোপীকৃষ্ণ কিন্তু উদয়নারায়ণের বীরকিটিস্থ রাজভবনে অন্তিম শয্যায় শায়িত।

তাঁহার চির সুখপালিত বৃদ্ধ দেহ অত্যাচারের পাশবিক দণ্ডে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপরে আবার এই সকল দুর্ঘটনা ঘটায় ও পরান্ন পালিত ভিখারী হওয়ায় মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তুমি আমি অমন রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে সুখী হইতে পারি,—কিন্তু রাজেশ্বর রাজা, সে যদি পরমুখাপেক্ষী হয়, তবে তাহার তাহাতে কষ্টের অবধি থাকেনা।

তোমার ভৃত্যেরা ধারাবর্ষায় ভিজিলে অসুখ বোধ হয় না,—কিন্তু গবাক্ষ প্রবিষ্ট বাদলার হাওয়ায় তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

গোপীকৃষ্ণরায়ের শরীর ও মন উভয়ই ভঙ্গ হওয়ায় তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। জ্বর দেখা দিল,—জ্বরের সঙ্গে ক্ষত স্থান সমুদয় পাকিয়া উঠিল, তাঁরপরে টঙ্কারের ভাবও হইল।

এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গোপীকৃষ্ণের রোগশয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল। কল্যাণী রাত্রি দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পিতার সেবা করিতে লাগিল। একজন সুবিজ্ঞ রাজবৈদ্য গোপীকৃষ্ণকে চিকিৎসা করিতে-ছিলেন। প্রায় একমাস ধরিয়া বৃদ্ধের চিকিৎসা করিলেন,—মূল্যবান ঔষধি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু রোগ আরোগ্যের দিকে না গিয়া ক্রমে বৃদ্ধির দিকেই গেল।

শেষে একদিন চিকিৎসক আসিলেন। রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় কল্যাণীকে বলিয়া গেলেন,—"আ'জ রাত্রে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে, হয়ত প্রভাত,"—চিকিৎসক আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি যতই অধিক হইতেছিল, ততই কল্যাণী তাহার হৃদয় মধ্যে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। স্পন্দমান অবসন্ন হৃদয় দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া এক একবার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার আসিয়া সেই মৃত্যুচ্ছায়া-পরিম্লান মুখখানির উপর নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে।

কল্যাণীকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারা যায় না। তাহার সেই আয়ত বিস্ফারিত নয়নদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট, উজ্জ্বল-লাবণ্যে ঢল-ঢল মুখকান্তি পাংশুবর্ণ, হাস্যপরিহাসচটুল অধর কালিমা-লিপ্ত, উন্নত রমণীয় দেহ অবনত। কল্যাণী আর সে কল্যাণী নাই।—এ যেন কল্যাণীর প্রেতমূর্ত্তি।

এক প্রহর, দুই প্রহর, তিন প্রহর বাজিয়া গেল। রোগীর বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। চতুর্থ প্রহরের অবসান সময়ে রোগীর ললাট ঈষৎ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। কল্যাণী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ললাট মুছাইয়া দিতেছিল;—বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিলেন। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা একবার উজ্জ্বল হইল,—অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন,—"অত্যাচার; এখনও অনেক দিন বাকি। মধুর মূর্ত্তি—সরস্বতীর তুল্য শ্বেতবরণী! মা! তুমিই কি অত্যাচার পীড়িত বঙ্গবাসীর মুখে শান্তির ক্ষীর-ধারা ঢালিয়া দিবে? ওঃ! এখনও তুমি স্বর্গে,—কবে আসিবে, মা!"

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল,—"কি বলিতেছ বাবা? আমায় কি ফাঁকি দিলে বাবা?"

অর্গলবদ্ধ শূন্য কক্ষে ধ্বনি ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন উত্তর পাইল না।—কেহ উত্তর দিল না। ত্রস্তভাবে কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত হস্তখানি পিতার নাসিকার নিকট লইয়া গেল; দেখিল, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ;—বক্ষের উপর হাত দিয়া দেখিল, বক্ষ স্পন্দন-রহিত। তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিল,—"যে দেবতার চরণ-পূজার জন্য এতদিন দেহ-পাত করিলাম, আজি তাহার বিসর্জ্জন! বাবা; তোমার অভাগিনীকে কোথায় ফেলিয়া গেলে?"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কণ্ঠস্বর কক্ষ মধ্যে ফিরিতে লাগিল। মৃতের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল কি না, কে জানে!

প্রাতে সকলেই শুনিল, গোষ্ঠবিহারের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সকলেই দুই চারিবার মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিল। রাজবাড়ী হইতে যথাযোগ্য সমারোহের সহিত মৃতের শ্মশানোর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

কল্যাণী অশৌচ গ্রহণ করিল। শোকে তাহার হৃদয় শতধা ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছে। সমস্ত দিনের মধ্যে সে এক বিন্দু জলও গ্রহণ করিল না। পুরস্ত্রীগণ তাহাকে জল খাইবার জন্য—হবিষ্য করিবার জন্য অনেক সাধাসাধি করিয়াছিল, কিন্তু সে কাহারও কথা শুনে নাই, কোন প্রবোধ মানে নাই। কক্ষতলে পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইয়াছিল।

তৎপর দিবস একটু ইক্ষু গুড় ও এক ঘটী গঙ্গা জল খাইয়াছিল, এবং তৃতীয় দিবসে কিছু ফল জল খাইয়া দিন কাটাইল। চতুর্থ দিবসে পিতার চতুর্থীক্রিয়া সম্পাদন করিয়া হবিষ্য করিল। কিন্তু লোকের সহিত আলাপ বন্ধ করিল,—কাহারও সহিত কথা কহে না, কাহারও কথার উত্তর দেয় না, কোন বিষয়ে চাহিয়া দেখে না,—একাকি রাত্রি দিন সেই পিতৃ-পরিত্যক্ত গৃহমধ্যে বসিয়া চক্ষুর জলে ভাসিতেছিল।

পঞ্চম দিনের বৈকালে কল্যাণী সংবাদ পাইল, রাজবাড়ীতে এক যোগী আগমন করিয়াছেন। যোগী সকলেরই পূজ্য ও পরিচিত,—রাজ-বাড়ীর স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছেন ও পূজা করিতেছেন।

শোক-মোহ-মুহ্যহৃদয় কল্যাণী ভাবিল, বোধ হয় পূর্ণানন্দ স্বামীও হইতে পারেন। সে, এক পরিচারিকাকে সংবাদ জানিতে পাঠাইয়া দিল। পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"যোগীর নাম পূর্ণানন্দ স্বামী; উনি সাক্ষাৎ দেবতা।"

কল্যাণী লুলিত কুন্তল টানিয়া মাথার উপরে জড়াইয়া গৃহের বাহির হইল, এবং অন্তঃপুরের যে স্থানে বসিয়া যোগী পূর্ণানন্দ স্বামী রাণী শ্রীমতীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। যোগীর মুখের দিকে চাহিয়া কল্যাণী কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

যোগী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

কল্যাণী আরও উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—"ঠাকুর; যে দেবতার চরণ-সেবা জন্য এত কষ্ট সহ্য করিলাম, এত ষড়যন্ত্র করিলাম,—কিন্তু হায়; দু'দিনের তরে সেবাধিকারিণী হইতে পারিলাম না। দেব; বাবা আমায় ফাঁকি দিয়াছেন। আ'জ পাঁচদিন হইল বাবা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।"

যোগী সহাস্য আস্যে মধুরস্বরে বলিলেন,—"কল্যাণী; পরিচয়ে জানিয়াছিলাম, তুমি বিদ্যাবতী ও শাস্ত্রজ্ঞা। তুমি মরণের বিষাদে অত সমাচ্ছন্ন কেন হইলে?"

কল্যাণী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—"ভগবান্; জানি, মানুষের মরণ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। জানি, জীবমাত্রেরই মরণের পথে যাইতে হইবে। আমার পিতা যদি গোষ্ঠবিহারের বাড়ীতে থাকিয়া, ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিতেন, তবে এত জ্বালা হইত না। আমার পিতা যে, মুসলমানের পাশবিক দণ্ডে ব্যথিত ও বিদীর্ণ হইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এ যাতনা কে বুঝিবে,—এ শোক কে নিভাইবে?"

তাহার চক্ষু ফাটিয়া আবার দরবিগলিত-ধারে জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। যোগী বলিলেন,—"সে জন্য দুঃখ করিও না। জগতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। কেহ ব্যাধিতে মরে, কেহ অস্ত্রাঘাতে মরে, কেহ গলায় দড়ি দিয়া মরে, কেহ নৌকা ডুবিতে মরে, কেহ অত্যাচারীর অত্যাচারে মরে,—মরে সকলেই, মরিতে হয় সকলেরই। যে, যে প্রকারে মরে; তাহার সেই প্রকারই কর্ম্মসূত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,—সেটাও ত কর্ম্মসূত্র। বালীকে বিনা কারণে মারিয়াছিলেন,—বালীর পুত্রের হাতে তাই বিনা অপরাধে মরিলেন। এমনই কর্ম্মসূত্র;—কর্ম্মসূত্রের ফলভোগ সকলকেই করিতে হয়। কেহ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া মুক্ত হয়,—কেহ কর্ম্মভোগ শেষ করাইয়া কর্ম্মফল সঞ্চিত করে। তার জন্যে জ্ঞানীর দুঃখ করা উচিত নহে।

কল্যাণী করযোড়ে বলিল,—“ঠাকুর; ও সকল কথা বোধ হয়, জগতের পনর আনা লোকে জানে, কিন্তু আত্মীয় বিয়োগে কেহ কি মন বুঝাইতে পারে?”

যোগী হাসিয়া বলিলেন,—“পারে না কেন জান? তার কারণও মায়া। মায়ায় অন্ধকার আনে,—তাই মানুষ মরিয়া কি হয়, মানুষকে বুঝিতে বা জানিতে দেয় না, তাই মানুষ কাঁদে। ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হয়। মানুষ মরিয়া দেবতা হয়—দেবতার দেশ দেখিয়া দেবভাবাপন্ন হইয়া আসে। তার জন্য দুঃখ কি মা?”

ক। আমার পিতা যে অত্যাচারের আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন, আমি কি তাহা ভুলিতে পারিব?

যো। একটা কথা বলি, শোন মা!

ক। কি বলুন?

যো। তোমার পিতা ঐরূপই কর্ম্মফল সংগ্রহ করিয়া জগতে আসিয়াছিলেন,—আর তুমিও এই শোক পাইবার উপযুক্ত কর্ম্মবীজ লইয়া আসিয়াছ। হয়ত ইহার শেষ তোমার এখনও অনেক আছে। কে তাহা রোধ করিবে?

ক। রোধ করিতে কেহ পারিবে না,—কিন্তু মরণই সে দুঃখ নিবারণ করিবে।

যো। তোমার ভুল। জগতে কত লোক দুঃখ পায়, সকলেই কি মরিতে পারে? মরণের পথ ত সুগম;—এক বিন্দু ঔষধে বা ক্ষুদ্র সূচীকায় সে কার্য্য সমাধা হইতে পারে। যাহার যাহাতে বিধান, সে তাহাই করিবে। যাহার আত্মহত্যা বিধান আছে, সেই তাহা করিবে,—অন্যে তাহা মনে করিলেও পারিবে না।

ক। তবে কি জীবের জ্বালা জুড়াইবার স্থান নাই,—আমিত আর সহ্য করিতে পারিব না, দেব! পিতৃ-শোকে আমার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

যো। হাঁ, যে কথা পূর্ব্বে বলিতেছিলে, যদি কেহ পুরুষকারের অতিরিক্ত সহায়তায় আত্মহত্যা করে, তথাপিও তাহার দুঃখ যাইবে না। প্রেতজীবন ধারণ করিয়া প্রেতলোকের অতি নিম্নতম স্থানে থাকিয়া দীর্ঘ দিবস কর্ম্ম-সংস্কারের বাসনা-বহ্নিতে জীবের বক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ হয়।

ক। তবে কি কর্ম্মফল রোধ করিবার শক্তি-সামর্থ জগতে কাহারও নাই? কোন দেবতাও কি এ তাপ বিদূরিত করিতে পারেন না?

যো। নিশ্চয়ই পারেন।

ক। সে কোন্ দেবতা,—প্রভু; আমায় বলিয়া দেন, কোন্ দেবতা কর্ম্ম-দানবের নির্দ্দয়তা হইতে রক্ষা করেন?

যো। দেবতার আরাধনায় তাহা সম্পন্ন হয়, কিন্তু বড়ই কঠিন।

ক। তবে সরল পথ আর কি আছে?

যো। যোগ।

ক। বুঝিতে পারিলাম না। যাহা দেবতার অসাধ্য,—বা কৃচ্ছ্রা-সাধ্য, তাহা যোগে সহজে সম্পন্ন হয়?

যো। হাঁ।

ক। কি প্রকারে তাহা হয়?

যো। আর একটা কথা এই যে, তুমি যে কষ্টভোগ করিতে আসিয়াছ, তোমার পিতার এই অত্যাচার লইয়া নিজে যে অত্যাচারিত হইতে বা পদ্মকে যে অত্যাচারের আগুনে পুড়াইতে আসিয়াছ, তাহা সম্পন্ন তোমাকে করিতেই হইবে। আবার তাহা করিতে করিতে কর্ম্মফল সংগ্রহ হইবে,—তাহা লইয়া আবার পুনর্জ্জন্মে ঘুরিতে হইবে; ঐ কার্য্যের অবশিষ্ট কাজ করিতে হইবে।

ক। আত্মহত্যা করিলে এত যন্ত্রণা,—কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু তবে কি করিয়া এ যন্ত্রণার অবসান হয়, প্রভু?

যো। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যোগ-সাধনায়।

ক। আপনিই বলিলেন, কর্ম্মের সংস্কার বিদূরিত না হইলে এ যন্ত্রণা যায় না; কর্ম্ম না করিলে সংস্কার ফুরায় না।

যো। হাঁ, তাহাই। মানুষ নানা অভিসন্ধিতে কার্য্য করে। অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হয় না। কেহ যশ চাহে,—সে যশের জন্য কার্য্য করে। কেহ অর্থ চাহে, সে অর্থের অভিসন্ধিতে কার্য্য করে। কেহ প্রভুত্ব চাহে, সে প্রভুত্ব লাভের জন্য কাজ করে। কেহ বা স্বর্গে যাইতে চাহে, সে স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য্য করে। কতকগুলি মুসলমান সম্প্রদায় সমস্ত জীবন কেবল মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি মন্দিরে সমাহিত হইবার জন্য কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে কর্ম্ম করিয়া থাকেন; যত প্রকার অসৎ কার্য্য সব করিয়া শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য, কিছু তাঁহাকে দিলেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহাতেই তাঁহাদের রাস্তা পরিষ্কার হইল; ইহাতেই তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবেন। এই সকল এবং এতদ্রূপ মানুষের আনেক কার্য্য প্রবৃত্তির নিয়ামক অভিসন্ধি আছে।

কিন্তু যাঁহারা জগতের সুসন্তান,—তাঁহারা কার্য্যের জন্যই কার্য্য করেন। এরূপ লোক সকল শ্রেণীর—সকল জাতির মধ্যেই দুই একজন পাওয়া যায়। ইহাঁরা যশের কাঙ্গালী নন, অথবা স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের উপকার হয় বলিয়া তাঁহারা কার্য্য করেন। আবার অপর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা আরও উচ্চতর অভিসন্ধি লইয়া কার্য্য করেন। যে কাজ করিলে মানুষের চোখের জল দূর হয়,—মানুষে হাসে, এমন কাজই তাঁহারা করেন। এই কার্য্য পরার্থপরতায় সম্পাদন হয় বলিয়া, ইহাতে কোন প্রকার সংস্কারের দাগ পড়ে না।

ক। আর পূর্ব্ব সংস্কার?

যো। যোগসাধনাদ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে হয়।

ক। শক্তির কখনও ধ্বংস আছে?

যো। শস্যাদির বীজগুলিকে ভাজিয়া লইলে তাহার যেমন অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তি বিদূরিত হয়। যোগের দ্বারা তদ্রূপ সংস্কার গুলিকে ভাজিয়া হইতে হয়।

ক। প্রভু; আমার সব গিয়াছে—জগতে আসিয়া পিতৃপদ পূজা করিতে শিখিয়াছিলাম, পিতৃভক্তি জানি নাই—তবু তাঁহার স্নেহ-বাহুর শীতল ছায়ায় পরিতৃপ্ত ছিলাম,—বড় অত্যাচারে—বড় নিপীড়নে পিতা আমার জর্জ্জরিত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন,—আর আমি কি লইয়া থাকিব?

যো। যোগ শিক্ষা কর,—শোক-মোহগ্রস্ত উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত হইবে।

ক। কে শিখাইবে? স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু, স্বামীই দেবতা,—সে দেবতা আমার নাই। অন্য গুরুর নিকট শিক্ষা নিষিদ্ধ।

যো। তাহাই সত্য। কিন্তু যোগ একটি আজগুবী কঠিন জিনিষ নহে। কোন বিষয়ে মন স্থির করার নামই যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শান্ত দেবতা স্বামী,—স্বামীকেই ধ্যান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে পরম যোগ। স্বামীর রূপে চিত্তবৃত্তি সংস্থিত করা যোগ,—এমন সহজ ও সরল পন্থা আর নাই।

ক। যাহার সে দেবতা নাই?

যো। সম্মুখে না থাকিলেই বা কি? মরিলেই মানুষ ফুরাইয়া যায় না। স্থূল যায়, সূক্ষ্ম থাকে;—সূক্ষ্মের ধ্যানই ধ্যান।

ক। যে কখনও সে দেবতা দেখে নাই?

যো। সে তাহার মানস-গঠন-সৌন্দর্য্য লইয়া ধ্যান করিবে। উপাসকের কার্য্য-সুগম জন্যই ত রূপের কল্পনা।

ক। দেব; অত বুঝিবার সময় নাই—হৃদয় বড় জ্বলিতেছে। যদি কখনও সময় পাই, যোগশিক্ষার চেষ্টা করিব,—দয়া করিয়া দর্শন দিবেন।

যো। নিশ্চয়ই। মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হইলেই যোগী তথায় উপস্থিত হয়েন।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বড়নগরে রাজা উদয়নারায়ণের নিকটে গোপীকৃষ্ণরায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রেরিত হইল। মহানুভব উদয়নারায়ণ সে সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। অত্যাচার-পীড়িত, দুঃখ-জ্বালা জর্জ্জরিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্রয়ে শান্তির জন্য আগমন করিয়া কয়েক দিবসও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

উদয়নারায়ণের উন্নত হৃদয়ে বড় বেদনা অনুভূত হইল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুরাশি বিগলিত হইল;—মনে হইল, বঙ্গের জমিদারগণ, সম্ভ্রান্তগণ, সুখ-লালিত ব্যক্তিগণ মুসলমানের কঠোর অত্যাচারে এইরূপেই নিপীড়িত, নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হইতেছে। মনে হইল, এ দেশে কি কেহ নাই, যাহার দ্বারা এই অত্যাচারের আগুন নির্ব্বাপিত হইতে পারে! মরণ মানুষের সাথের সাথী,—মরণে ভয় কি? মরণে ভয় করিয়া কেন তবে সকলে নীরবে এত অত্যাচার সহ্য করিতেছে?

উদয়নারায়ণের মনে হইল, মুসলমানের অত্যাচার একরূপ নহে। মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কেবল তাহারই জীবন লইয়া ছাড়িয়া দেয় না। তাহার পরিবারবর্গকে অখাদ্য সেবন করাইয়া মুসলমান করিয়া দেয়,—হিন্দু বিধবাকে মুসলমানের সহিত নেকা দেয়!

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। যে মহত্তেজ শরীরে সঞ্চারিত হইয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা অপসারিত হইয়া গেল। তিনি দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দেওয়ান আসিয়া হাজির হইলে, তাঁহাকে বলিলেন,—"এখনই একজন বিশ্বস্ত ও ভদ্র কর্ম্মচারীকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দাও। নবাব সাহেবকে লিখিয়া দাও—যাহার জন্য এত পীড়াপীড়ি—যাহার জন্যে এত আয়োজন,—সেই হতভাগ্য রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অতএব, তাঁহার বাকি রাজস্ব গ্রহণ করিয়া তদীয় পুত্রকে কায়মান দিতে আজ্ঞা হয়।"

দেওয়ান চলিয়া গেলেন, এবং তখনই যথাযৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

রাজ-কর্ম্মচারী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া যথা সময়ে নবাব সাহেবের নিকটে পত্র প্রদান করিল। পত্র পাঠে নবাব মুর্শীদকুলীখাঁ জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনই কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন,—"উদয়নারায়ণের গোস্তাকী অসহ্য। গোপীকৃষ্ণের মৃত্যু হয় নাই, আমাকে প্রতারণা করাই এই ষড়-যন্ত্রের উদ্দেশ্য। উদয়নারায়ণকে বলিবে, সাত দিনের মধ্যে যদি গোপীকৃষ্ণ রায়কে আমার দরবারে হাজির করিয়া না দেয়, নিশ্চয়ই তাহার বিপদ ঘটিবে। উদয়নারায়ণের অন্য কোন আপত্তি,—কোন কথা বা কোন প্রকার উপরোধ অনুরোধ শুনিব না, ইহা আমার শেষ আদেশ।"

কর্ম্মচারী ফিরিয়া গিয়া সে কথা উদয়নারায়ণের সমীপে নিবেদন করিল।

উদয়নারায়ণ বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য; কিন্তু অদম্য ভাগীরথী প্রবাহের ন্যায় নবাব-সৈন্যের সম্মুখে তাঁহার সৈন্যগণ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে সক্ষম হইবে? সেদিন সমস্ত রাত্রি উদয়নারয়ণ সেই ভাবনাতেই বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন।

যখন প্রভাত হইল, সূর্য্যকর নবনলিন-সম্পুট সদৃশ রক্তবর্ণে পূর্ব্ব-দিক রঞ্জিত করিয়া সমুদিত হইলেন, তখন রাজা উদয়নারায়ণ গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদনগোপালদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

পুরোহিত ঠাকুর রাজাদেশে অতি প্রত্যূষেই পূজার আয়োজন করিয়া লইয়াছিলেন,—অতি প্রত্যূষ হইতেই দেবমন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ও কাংস্য করতালের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইতেছিল,—অতি প্রত্যূষ হইতেই ধূপ ধুনা গুগ্গুল প্রভৃতি পুড়িয়া সুগন্ধ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—অতি প্রত্যূষ হইতেই রাজাদেশে মদন-গোপালের দারু-ময়ী মূর্ত্তিকে বহু মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কার-রাজিতে রাজবেশে সাজান হই-য়াছে.—অতি প্রত্যূষ হইতেই সচন্দন তুলসীদলে পাদপদ্মফুলে শোভিত করা হইয়াছে,—অতি প্রত্যূষ হইতেই নৈশ প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্পের মালা গলে দোলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজা উদয়নারায়ণ দেবপদে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"দেব ; চলিলাম—তোমার চরণতল পরিত্যাগ করিয়া বীরকিটির ভবনে চলিলাম। বুঝি আর আসা হইবে না। বুঝি ও চরণ দর্শন এই শেষ ;—তুমি থাকিবে,—কত লোক ও রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইবে। তোমার দাসানুদাস বুঝি আর তাহাতে অধিকারী হইবে না।"

তারপর পুরোহিত মন্ত্র পরাইয়া দিলেন,—রাজা সেই বিগ্রহপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া চরণামৃত পান করিলেন। তৎপরে বাহির হইয়া রাজপ্রাসাদে গমন করতঃ সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া, বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় বড়নগরের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বীরকিটির সুরক্ষিত প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বড়নগরে কয়েকজন মাত্র নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এ দিকে নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজা উদয়-

নারায়ণ কখনই আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে না,—পূর্ব্ব হইতেই তিনি যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন—তৎপরে আরও এক সপ্তাহ দেখিলেন, কিন্তু রাজা উদয়নারায়ণের কোন পত্রাদি না পাইয়া দশ দিনের দিন সান্ধ্য দরবারে সেনাপতি মহম্মদ-জানকে ডাকাইলেন।

সেনাপতি মহম্মদ-জান আসিয়া যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া নবাবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, নবাব তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়া বলিলেন,—"মহম্মদ-জান; নেমকহারাম রাজা উদয়-নারায়ণ আমার বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র করিতেছে, কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য লইয়া গিয়া তাহাকে বাঁধিয়া আনিতে হইবে।"

মহম্মদ-জান গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"জাহাপনা; রাজা উদয়-নারায়ণ সহজ লোক নহে। বিশেষতঃ সুচতুর গোলাম মহম্মদ এক্ষণে তাঁহার সেনাপতি এবং কালিয়াজমাদার সহকারী সেনাপতি,—তদ্ভিন্ন অনেক হিন্দু যোয়ানও তাহার সৈন্য পরিচালনা করিয়া থাকে। উদয়-নারায়ণকে আক্রমণ করা কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্যের কাজ নহে।"

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বলিলেন,—"আমিও তাহা জানি, তোমা-দিগকে যে সমরায়োজনের জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, তাহা এই কারণেই। যত সৈন্য ও যেরূপ আয়োজন তৎপক্ষে ভাল বিবেচনা কর, তাহাই লইয়া উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইবে।"

ম। আমার সহকারী সেনাপতির মধ্যে যাহারা বীর বলিয়া বিখ্যাত, তাহার অধিকাংশই, পূর্ণিয়া অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে গমন করিয়াছে।

মু। তবে কি তুমি ভীত হইতেছ?

ম। ভীত হইতেছিনা, জাঁহাপনা! যেমন শত্রু,—যুদ্ধের আয়োজনও তেমনি করিয়া যাওয়া চাই।

মু। তোমার সহকারি সেনাপতি কয়জন এখানে উপস্থিত আছে?

ম। একজন মাত্র।

মু। মাত্র একজন ?—ভাল, সৈন্যদের মধ্যে বাছিয়া লইয়া আয়ত্ত কয়েকজনকে তোমার সহকারী করিয়া লও।

ম। নগররক্ষী সৈন্যদলের মধ্যে অনেক ভাল লোক আছে,—কিন্তু এ সময় তাহাদিগকে স্থানান্তরে লওয়া যাইবে না।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান কর্ম্মচারী বলিলেন,—"নদিয়াধিপতি রাজা রামজীবন, রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া বন্দী হইয়া আছে; তাহার পুত্র রঘুরাম, এই মুর্শিদাবাদেই উপস্থিত আছে। সে খুব বীর। হিন্দুগণ অন্য বিষয়ে যতই হেয় হউক,—তাহারা খুব ভাল ভৃত্য। একটু চাটু-বাক্যে গায় হাত বুলাইয়া তাহাদিগকে বড় করিলে, আর বিষয়ের লোভ দেখাইলে, তারা প্রভুর হিতের জন্য প্রাণ দেয়। আমার বিবেচনায় তাহাকে সঙ্গে লইলে যুদ্ধে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে।"

মুর্শিদকুলী খাঁ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ,—হিন্দুর উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি ?"

ক। আমি হিন্দুর দেশে থাকিয়া চুল পাকাইলাম—হিন্দুর স্বভাব-চরিত্র ভালরূপেই জানিয়াছি, তাহারা আপন রক্ষা বেশ বোঝে। যদি তারা জাতিগত উন্নতি অবনতি বুঝিতে পারিত, তবে কি আমরা এই সামান্য কয়জন মুসলমানে বাঙ্গালা দেশটা নখদর্পণে রাখিতে পারিতাম !

মুর্শীদকুলী খাঁ একটু হাসিয়া রঘুরামকে ডাকিতে পাঠাইয়া যুদ্ধ-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রায় এক প্রহর পরে নদিয়াধিপতির দেওয়ান ও কুমার রঘুরাম আসিয়া নবাব-দরবারে হাজির হইলেন।

বলা বাহুল্য সে দরবারে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কয়েকজন বিশ্বাসী মুসলমান কর্ম্মচারী লইয়াই নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ যুদ্ধ সংক্রান্ত পরামর্শ করিতেছিলেন।

নদিয়াধিপতির দেওয়ান ও রঘুরাম উপস্থিত হইয়া কুর্ণিস্‌দ করিলে, নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ, রঘুরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি তুমি খুব বীর। তোমাকে আমি সহকারী সেনাপতিপদে বরণ করিয়া রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইতে চাহি। অবশ্য তুমি সেনাপতি মহম্মদ-জানের সঙ্গেই যাইবে,—ইহাতে তোমার মত কি?

দেওয়ান বুঝিতে পারিলেন, হিন্দুশক্তি বিধ্বংসিনী মুসলমান নীতি, হিন্দু জমিদারের সর্ব্বনাশ হিন্দুদ্বারাই সম্পাদন করিবে। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুরামের কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন,—"জাঁহাপনা, কুমার বীর বটেন, কিন্তু পিতার কারাবাসে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন মনে কালাতিপাত করিতেছেন। যাহা হউক, হুজুরের আদেশ আনন্দের সহিতই পালন করিবেন। সম্রাটের সাহায্য করাই বীর প্রজার ধর্ম্ম।"

সুচতুর মুর্শীদকুলী খাঁ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"রঘুরামের পিতাকে কল্যই কারাগার হইতে মুক্তি করিয়া দেওয়া হইবে। তবে এখন নজরবন্দীরূপে মুর্শিদাবাদের বাসাবাড়ীতেই থাকিতে হইবে,—রঘুরাম যদি বিশ্বাসী হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ-কার্য্য সমাধা ও জয়লাভ করিয়া আইসে, তবে রাজাকে বাকি করের দায় হইতে অব্যাহতি দিব, এবং রঘুরামকে কিছু নূতন জায়গীরও প্রদান করিব।"

রঘুরাম শপথ করিয়া বলিলেন,—"এরূপ অনুগ্রহ করিলে, হুজুরের কার্য্যে প্রাণ দিব।"

বৃদ্ধ কর্ম্মচারী বক্র কটাক্ষে মুর্শীদকুলী খাঁর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসি হাসিলেন। সুচতুর দেওয়ানের দৃষ্টিতে সে হাসি এড়ায় নাই,—তিনি সে হাসির অর্থ বুঝিয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু অবস্থায় কুলায় কৈ?

মুর্শীদকুলী খাঁ, রঘুরাম ও দেওয়ানকে বিদায় দিয়া সেনাপতি মহম্মদ জানের সহিত, আর কাহাকে কাহাকে প্রধান সেনারূপে লইতে হইবে,

কি প্রকারে সৈন্য সজ্জা করিতে হইবে, কি প্রকারে প্রথমে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার মন্ত্রণা করিলেন।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শী নবাব আগে হইতেই বড়নগরে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া জানিয়াছেন, কয়েক দিন হইল রাজা উদয়নারায়ণ বড়নগর পরিত্যাগ করিয়া বীরকিটির সুরক্ষিত রাজ প্রাসাদে চলিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা বীরকিটি আক্রমণ করাই স্থির করিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল।

নবাবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি মহম্মদ-জান, সেই দিবস হইতেই গমনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বহুতর হস্তী, অশ্ব, যান, বাহন প্রস্তুত হইতে লাগিল। বহুতর কামান বন্দুক ও অস্ত্র শস্ত্র গাড়ী বোঝাই হইতে লাগিল। বহুল খাদ্য-দ্রব্য-সম্ভারে তরণী ও গাড়ী সমুদয় সুসজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল।
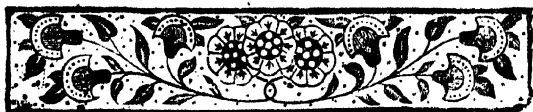
অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিবস পরে বীরকিটির রাজভবনে বসিয়া রাজা উদয়নারায়ণ সংবাদ পাইলেন, নবাব সেনাপতি মহম্মদ-জান বহু সহস্র সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, জগন্নাথপুর গড়ের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা এই সংবাদে বিস্মৃত হইলেন, সামান্য কারণে তাহার প্রতি মুর্শিদকুলী খাঁর এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি যদিও জানিতেন, মুসলমান-মহাসমর-বহ্নিতে তিনি ক্ষুদ্র পতঙ্গ, তথাপি দেশের অত্যাচারে শোণিত-তর্পণ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন।

বীরকিটির রাজভবনের নিকটেই জগন্নাথপুরের সুবিখ্যাত গড়। গড়ে বহু সংখ্যক সৈন্য, বহু সংখ্যক কামান বন্দুক ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গোলাম মহম্মদ অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ, নবাব সেনাপতি মহম্মদ-জানের সসৈন্যে আগমনবার্ত্তা অচিরেই নিজ সেনাপতি ,গালাম মহম্মদের গোচর করিলেন।

গোলাম মহম্মদও সে সংবাদ লইতে বিস্মৃত হয়েন নাই। গুপ্তচরের নিকট তিনি অবগত হইলেন, গড়ের চারি ক্রোশ দূরে—পার্ব্বত্য ময়দানে মুসলমান সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

গোলাম মহম্মদ মনে মনে স্থির করিলেন, পথশ্রান্ত অবিন্যস্ত অপ্রস্তুত নবাব-সৈন্যগণকে এই সময় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতে পারিলে,

বিশেষ সুবিধা হইবে। তিনি আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করিলেন না। কতক-গুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মুসলমান শিবিরোদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

দূরে শিবির সন্নিবেশ ও সৈন্য সংস্থাপন করিয়া তথায় মধ্যাহ্ন ভোজ-নাদি নিষ্পন্ন করতঃ নবাব সেনাপতি মহম্মদ-জান, রঘুরাম এবং আরও কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিকের সহিত শিবির হইতে বাহির হইলেন। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাহির হইবার উদ্দেশ্য, কোন পথে, কি প্রকারভাবে সৈন্য লইয়া তাঁহারা জগন্নাথ-পুর গড় আক্রমণ করিতে গমন করিবেন, তাহারই সন্ধান লওয়া। সে সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা একটা নদী তটস্থ অশ্বত্থ তরুমূলে বসিয়া যখন যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন বৈকালের সূর্য্য আসন্ন লুপ্ত তেজোগর্ব্বে পশ্চিমে ঢলিতেছিলেন।

সহসা দূরে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটল দর্শন করিয়া সামরিক দূত বিপক্ষ আগমনের সংবাদ ঘোষণা করিল।

মহম্মদ-জান এই অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া পড়িলেন। সৈন্যগণ বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছিল,—দূরে অশ্বোপরি যুদ্ধ-কুশল গোলাম মহম্মদের ভীমকান্তি এবং তৎপশ্চাতে সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া মহম্মদ-জানের মুখে ধূলা উড়িল। শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে রঘুরামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রঘুরাম, এই শেষ। আর রক্ষা নাই। চল আমরা পলায়ন করি।"

রঘুরাম মৃদু হাস্যাধরে বলিলেন,—"সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে বিপক্ষকরে ডালি দিয়া পলায়ন করিবেন?"

ম। উপায় কি রঘুরাম? আর বিলম্ব নাই,—ঐ বাঁকটা ঘুরিলেই গোলাম মহম্মদ আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে। চল, শীঘ্র পলায়ন করি।

র। আমরা পলায়ন করিলে, আমাদিগের সৈন্যগণ নেতা বিহীন হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পড়িবে।

ম। আর পলায়ন না করিলে এখনই গোলাম মহম্মদের তরবারি আমাদের কণ্ঠরক্ত পান করিবে।

র। আপনার কোন ভয় নাই।

ম। তুমি গোলাম মহম্মদের ভুজবল জান না;—একা গোলাম মহম্মদ যুদ্ধস্থলে সহস্র হয়।

র। ভয় করিবেন না,—আপনারা আরও পশ্চাতে হটিয়া যান, আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোলাম মহম্মদ অগ্রসর হইবে।

ম। আর তুমি কি ঐ পাহাড়ের বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিবে?

র। হাঁ, আমি ঐ স্থানে থাকিয়া গোলাম মহম্মদের জান লইব। আর সময় নাই,—ঐ গোলাম মহম্মদ বাঁক ঘুরিয়া পড়িল।

মহম্মদজান অন্য উপায় নাই দেখিয়া, সম্মুখ দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন —রঘুরাম পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরিস্থ বনের মধ্যে সশস্ত্রদেহ লুক্কায়িত করিলেন।

দুর হইতে গোলাম মহম্মদ দেখিলেন, কয়জন মুসলমান সৈন্য বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছে,—আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেনাপতি মহম্মদ-জান ও তৎসঙ্গে কয়েকজন প্রধান প্রধান সামরিক কর্ম্মচারী অবস্থিত, উত্তম সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি গ্রহণ করতঃ তিনি তাহাদের দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। বেগবান্ সমরাশ্ব নাচিয়া নাচিয়া পার্ব্বত্য পথে ছুটিয়া চলিল।

যে পর্ব্বতের সানুদেশস্থ বন মধ্যে রঘুরাম লুক্কায়িত হইয়া ব্যাধের ন্যায় ধনুতে শরযোজনা ও লক্ষ্য স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন, যখন গোলাম মহম্মদের অশ্ব তাহার নিকটেদিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল; তখন রঘুরাম ধনুর্জ্যা আকর্ণ টানিয়া শর সন্ধান করিলেন। অব্যর্থ সন্ধানে শর বর্ম্মভেদ করিয়া গোলাম মহম্মদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। এই অতর্কিত শরাঘাতে গোলাম মহম্মদ ব্যথিত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত

হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত স্থান দিয়া তীব্রবেগে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল।

মহাম্মদ-জান এই শুভ অবসর দর্শন করিয়া, সাঙ্গী সৈন্যগণকে লইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় নায়কহীন শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন,—গোলাম মহম্মদের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহারা অত্যন্ত শোকাকুলিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহারা অল্প সময়েই পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

তখনও সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া বাণবিদ্ধ গোলাম মহম্মদ মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন।

রঘুরাম ও মহাম্মদজান তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেনাপতি, যন্ত্রণা কি অধিক হইতেছে?"

মৃত্যু-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট নয়ন ঈষৎ উন্মীলন করিয়া গোলাম মহাম্মদ বলিলেন,—"আপনারা কি বিপক্ষ?"

মহাম্মদজান সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"আমি মহাম্মদজান, তোমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু।"

গোলাম মহাম্মদ যন্ত্রণাময় স্বরে বিরক্তিভাবে বলিলেন,—"বন্ধুর মত কার্য্য কর নাই। ব্যাধের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মৃগের ন্যায় না মারিয়া সম্মুখে আসিয়া মারিলে তৃপ্তি লাভ করিতাম। এখন বেলা কত?"

ম। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে,—সন্ধ্যা হইবার অর অধিক বিলম্ব নাই।

গো। আমারও জীবন-সন্ধ্যা সমাগত,—আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত। একটু জল খাব।

রঘুরাম মহাম্মদজানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ইহাঁকে শিবিরে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলে হয়।"

গোলাম মহাম্মদ তখন যন্ত্রণায় মস্তকটা বুকের দিকে গুঁজিয়া লইল,—ক্ষত স্থান দিয়া আরও রক্ত বাহির হইল।

মহম্মদজান বলিলেন,—"সে সময় বোধ হয় আর নাই।"

গোলাম-মহম্মদের কুঞ্চিত দেহ সরল হইল। মুখ দিয়া একবার রক্ত নির্গত হইল,—চক্ষুতারা স্থির হইয়া আসিল, শেষ তপ্তশ্বাসটুকু ধীরে ধীরে অনন্ত সমীরণে মিশিয়া গেল।

মহম্মদজান ও রঘুরাম আপনাদের সৈন্য লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে মহম্মদজান রঘুরামকে বলিলেন,—"যদিও কাজটা একটু গর্হিত হইয়াছে, তথাপি এখন ভরসা হইতেছে যে, আমরা উদয়নারায়ণের রাজধানী জয় করিতে সমর্থ হইব। গোলাম-মহম্মদকে নিহত না করিতে পারিলে আমাদের জয়াশা ছিল না।"

এ দিকে যথাসময়ে রাজা উদয়নারায়ণ শ্রুত হইলেন, তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ—আশা-ভরসার উজ্জ্বল প্রদীপ-স্বরূপ—বন্ধুত্বের আদর্শ-স্বরূপ—বীরত্বের পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ গোলাম-মহম্মদ অন্যায়রূপে নিহত হইয়াছেন।

বহু সৈন্য লইয়া নবাব-সেনাপতি দুর্গাবরোধ করিতে সমাগত,—তাঁহাদের রণ-দুন্দুভি শিয়রে বাজিতেছে,—এ সময়ে একমাত্র ভরসা গোলাম-মহম্মদ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, এত আশা-ভরসা দিয়া ছাড়িয়া গেলেন,—ইহাতে রাজা উদয়নারায়ণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কালসর্প দুয়ারের নিকটে ফণা বিস্তারে গর্জ্জন করিলে নিদ্রোত্থিত গৃহী যেমন আকুল হইয়া, কি করিবে, তাহার স্থির করিতে পারে না,—রাজা উদয়নারায়ণও তদ্রূপ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আর সময় নাই,—প্রতি পত্র-বিকম্পনে রাজা বিপক্ষের কামানের ভৈরব গর্জ্জন অনুভব করিতে লাগিলেন।

আর ভাবিলে চলিবে না,—কোন্ মুহূর্ত্তে যে বিপক্ষের কামানের গোলা দুর্গমধ্যে পতিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। রাজা ব্যাকুলিত হৃদয়ে অমাত্যবর্গ লইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার সাহেবরাম বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, আমিই সেনাপতি পদে বরিত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিব; আমিই বিপক্ষ-দলন করিয়া হিন্দুর ভুজবল দেখাইব"

পুত্র-মুখে বীরোচিত বাক্য শ্রবণে রাজা আনন্দিত হইলেন, কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। সাহেবেরাম বীর, সাহেবরাম সাহসী,—তথাপি সাহেবরাম বালক। অতুলপ্রতাপশালী মুসলমান-সমরে সেই বালক কি করিতে পারিবে? বিশেষতঃ সাহেবরাম সেনাপতি হইলে—সাহেবরাম মুসলমানের লক্ষ্য স্থানীয় হইবে, হয়ত প্রথমেই সে রণস্থলে শয়ন করিবে। পুত্র-শোকানল বুকে করিয়া তখন উদয়নারায়ণ কি করিয়া যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিবেন! কিন্তু আর ভাবিলে চলে না,—বিনোদলাল, কালিয়া-জমাদার এবং অপরাপর প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই সাহস প্রদান করিলেন,—সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইলেন। সাহেবরাম সহর্ষে, অদম্য রণোৎসাহে সেনাপতি পদে বরিত হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শীতের প্রভাত। আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন। গাঢ় ধূসর কুহেলিকার অন্তরালবর্ত্তী তপন যেন ধূলি-ধূসর পুরাতন পটে চিত্রিত, তেজোহীন—মলিন। অনিদ্রা-কাতর যদি দীর্ঘ রজনীব্যাপী অনিদ্রা-যাতনা ভোগের পর উষার সুস্নিগ্ধ পবনের বীজনে তন্দ্রাতুর হইয়া পড়ে, তবে যেমন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলেও নিদ্রার আবেগ সহসা দূর হয় না,—সে দিবস প্রকৃতিরও সেইরূপ, প্রভাত হইলেও প্রভাতের চেতনা সম্পূর্ণ ফিরিয়া আইসে নাই। তখনও প্রভাতের নেত্র হইতে নিশার নিদ্রাবেশ দূর হয় নাই।

সাহেবরাম, কালিয়া-জমাদার ও বিনোদলাল তিন জনে তিন দল সাহসী সৈন্য লইয়া তিন দিক দিয়া নবাবসৈন্য আক্রমণ জন্য ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় প্রধাবিত হইলেন। জগন্নাথপুরের গড়ে স্বয়ং উদয়নারায়ণ সৈন্য লইয়া মুসলমানের আক্রমণ রোধার্থ অবস্থিত হইলেন।

মুসলমান সেনাপতি তাঁহার গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় সেনাপ্রবাহ লইয়া জগন্নাথপুরের গড় অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক পার্ব্বত্য প্রান্তরে সাহেবরামের সৈন্যের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল,—উভয় দলের রণদামামা বাজিয়া উঠিল,—উভয় দলের কামান বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল, নবোদিত বালার্ককিরণ-সম্পাতে উভয় দলের বীর-

ভুজোত্থিত অস্ত্ররাশি ঝলসিয়া উঠিল। অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহতী, বীরের হুহুঙ্কারে পর্ব্বত, কানন, প্রান্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

মুসলমানসেনা তখন যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার দুই দিকে লম্বমান পাহাড়রাজি—সম্মুখে জগন্নাথপুরের গড়ের বিস্তৃত ময়দান। ময়দানের সীমান্তমুখে সাহেবরামের সৈন্যগণ ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান,—আর পাহাড়-প্রাচীরবেষ্টিত অনতিপ্রসর উপলখণ্ড-বন্ধুর পার্ব্বত্য অসমতল ভূখণ্ডের উপরে মুসলমানসৈন্য প্রবাহ,—এতদবস্থায় জয়ের আশা নাই দেখিয়া, মহম্মদজান সৈন্যগণকে ফিরিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ ফিরিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িল,—পশ্চাৎ হইতে কালিয়া-জমাদার ও বিনোদলাল ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই সকল সৈন্যের উপরে পতিত হইল, উভয় দলে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হইতেই আক্রান্ত হওয়ায় মুসলমান সৈন্যগণ বিপদ গণিল, কিন্তু তথাপি তাহারা বীর-বিক্রমে লড়িতে লাগিল। তাহাদের অদম্য বীর্য্যবত্ত্বায় রাজসৈন্যগণ বিস্মৃত হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের সে বিক্রমে সবিশেষ ফলোদয় হইতে ছিল না,—কারণ, তাহাদের দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব পাহাড়ের দ্বারা আবৃত এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগ শত্রুসৈন্য দ্বারা সমাক্রান্ত, মুসলমান সৈন্যগণ কোন দিকেই পথ পাইতেছিল না,—তদুপরি উভয়দিক হইতে জ্বলন্ত গোলা আসিয়া তাহাদিগের বক্ষ বিভিন্ন করিয়া দিতেছিল। অস্ত্র হাতে করিয়া সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছিল। মহম্মদজান এই বিপদে কোনপ্রকার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না,—তিনিও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। যখন বুঝিলেন, পাহাড়-প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া শত্রুর জ্বলন্ত গোলায় মৃত্যু অনিবার্য্য;

তখন সৈন্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াইয়া মরা অপেক্ষা মারিয়া মরা ভাল। চল আমরা বিপক্ষ-সৈন্যের বুকের উপর দিয়া বাহির হই। যদি মুক্ত হইতেও না পারি, তথাপিও কতক শত্রু নিপাত করিয়া মরিতে পারিব।"

সেনাপতির উৎসাহ বাক্যে বাঁধভাঙ্গা জলপ্রপাতের ন্যায় নবাবসৈন্য বাহির হইবার জন্য ধাবিত হইল,—কিন্তু এক বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবলপ্রবাহে বারিরাশি বাহির হইয়া অন্য দৃঢ় বাঁধে ঠেকিলে যেমন অধিকতর স্ফীত হইয়া রুদ্ধবেগ হইয়া পড়ে, নবাবসৈন্যের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। যে বেগপ্রবাহে তাহারা বাহির হইতেছিল, কালিয়া-জমাদার ও বিনোদ-লালের পরিচালিত সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি ও অস্ত্রের প্রহারে তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। সে ভীম আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পশ্চাতে হটিল,—ইহাতে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। যাহারা সর্ব্বাগ্রে ছিল, তাহারা পশ্চাতে হটিল,—যাহারা পশ্চাতে ছিল, তাহারা সাহেবরামের জ্বলন্ত গোলার তেজে অগ্রগামী হইল,—উভয় বেগের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া অনেক সৈন্য দলিত, মথিত, বিপর্য্যস্ত ও কাল-কবলিত হইল। মহম্মদজান সৈন্য রক্ষায় অপারগ হইয়া মৃত্যুর বিকট ছবি সন্দর্শন করিলেন।

এই সময় তিনি এক শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া সৈন্যগণকে পুনরায় উৎসাহিত করিয়া পরিচালনা করিলেন। মহম্মদজান দেখিলেন, বিপক্ষসৈন্যের কতকাংশ পাহাড়ের পুরোভাগ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়া, পশ্চাতে সম্মুখ করিয়া কোন প্রতিদ্বন্দ্বিদলের সহিত সম্মুখ সমরে লিপ্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে মহম্মদজান অতীব মঙ্গল-অবসর বিবে-চনা করিয়া, সৈন্যগণকে পুনরায় উত্তেজিত করিয়া বাহির হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইতে হইতে তাহারা অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল।

মুসলমানের হাতে অস্ত্র সকল জ্বলিয়া উঠিল,—মুসলমানের কামান গর্জ্জন করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল।

প্রত্যুষ না হইতেই মহম্মদজান এবং রঘুরাম সমস্ত সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া জগন্নাথপুর গড় আক্রমণ করিবার জন্য দুই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রঘুরাম যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে বিপক্ষ সৈন্য না দেখিয়া এবং মহম্মজানের সৈন্য যে দিকে, সে দিকে পুনঃ পুনঃ কামানের শব্দ শুনিয়া রঘুরাম বুঝিলেন, মহম্মদজান সৈন্য লইয়া পার্ব্বত্য পথে বিপদে পড়িয়াছেন,—তাই রঘুরাম নিজ সৈন্য ফিরাইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া পড়িলেন।

ফিরিয়া আসিয়া যে দিকে বিনোদলাল ও কালিয়া-জমাদার সসৈন্যে লড়িতেছিলেন, সেই দিকে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সিংহবিক্রমে বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। কালিয়া-জমাদার পশ্চাতে ফিরিয়া সৈন্য লইয়া রঘুরামের সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, আর বিনোদলাল পাহাড়পথে মহম্মদজানের সৈন্যের পথরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত অল্প সৈন্য লইয়া বিনোদলাল মহম্মদ-জানের সে বিপুল সৈন্য প্রবাহের গতিরোধ করিতে পারিলেন না,—বাঁধভাঙ্গিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় মুসলমানসৈন্য বাহির হইয়া পড়িয়া বিনোদলালের সৈন্যগণ মথিত করিতে লাগিল। বিনোদলাল আর কিছু-তেই সৈন্যগণকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। মুসলমানসৈন্যের ভীম-তেজে বিনোদলালের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনন্যোপায় ও জীবনে হতাশ হইয়া বিনোদলাল রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপক্ষসৈন্য-গণকে মথিত করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কতক্ষণ! ভীম অনলমধ্যে পরিমিত বারিবিন্দু কি করিতে পারে? অনল নির্ব্বাপিত করা দূরের কথা,—অনলে তাহাকেই চুষিয়া লয়,—বিনোদলালেরও তাহাই হইল,—মহম্মদজানের হস্তনিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া তাহার ললাট ভগ্ন

রজনী ঘন ঘোরা—প্রশান্ত প্রান্তরে শীতের সমীরণ হু হু রবে প্রবাহিত হইতেছিল,—আর উভয় দলের রণদামামার বাজনা, কামানের গর্জ্জন, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহতী, ভারবাহী পশুর উচ্চরব এবং বীরগণের হুহুঙ্কার ও সহস্র সহস্র মশালের আলোক, সেই বিশাল প্রান্তরের বিশাল অন্ধকার ভেদ করিয়া লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিতেছিল।

সাহেবরাম সৈন্যগণকে অধিকদূর অগ্রসর না করিয়া গড়ের সম্মুখেই চক্রাকারে ব্যূহিত করিয়া অদম্য উৎসাহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নবাব-সৈন্য বাধা শূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে গড়ের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইলে,—তারপর, উভয় দলে যুদ্ধারম্ভ হইল। সে দিবসের যুদ্ধ ভীষণ হইতেও ভীষণতর,—মহম্মদজান বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছেন, এমন ভীষণ যুদ্ধে তাঁহাকে আর কখনও পড়িতে হয় নাই।

সমস্ত প্রান্তর যেন অগ্নিগোলকময় হইয়া গিয়াছিল,—অগ্নি-গোলক-সমুদ্রের মধ্যে যেন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ সন্তরণ দিতেছিল। উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা এত অধিক যে, সকলেই আসন্ন মৃত্যু স্থির করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল।

তার পর যখন প্রভাত হইল, তখন দেখা গেল,—মৃত সৈন্যে সমস্ত ময়দান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শত শত হয় হস্তী তাহাদের বিরাট দেহ মাটিতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপিও যুদ্ধের বিরাম হইল না,—সমস্ত দিবস ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। একা সাহেবরাম সহস্র হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—কালিয়া-জমাদারও প্রাণপাণে তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন। কিন্তু এই ভয়াবহ সমরে সাহেবরামের সৈন্যবল ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গেল,—সাহেবরামের সৈন্য যে পরিমাণে ক্ষয় হইতেছিল, মহম্মদজানের সৈন্য তদপেক্ষা প্রায় দশ গুণ অধিক বিনাশ হইতেছিল, কিন্তু সংখ্যায় মহম্মদজানের সৈন্য, সাহেব-

রামের সৈন্যাপেক্ষা প্রায় ত্রিংশৎ গুণ অধিক। কাজেই সাহেবরাম আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না,—এদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। ক্ষুৎপিপাসায়-কাতর স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া গড়ের বাহিরে অবস্থান নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া, সাহেবরাম অত্যন্ত কৌশলের সহিত সৈন্যগণকে গড়ের দুর্গ-মধ্যে পরিচালনা করিয়া লইলেন।*

সাহেবরাম দুর্গমধ্যে পঁহুছিয়াই সমস্ত কামানগুলি দুর্গ প্রাচীরে সাজাইয়া দিলেন,—প্রত্যেক কামানের কাছে একজন করিয়া গোলন্দাজ ও এক এক জন গোলন্দাজের নিকটে তিন চারি জন করিয়া সহকারী নিযুক্ত করিলেন। মুসলমান সৈন্য দুর্গ-সন্নিধানে সমাগত হইলে, একেবারে সমস্ত কামান হইতে অনল-গোলা নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ বীরপুত্রের মুখচুম্বন করিয়া স্নেহ-বাহুতে আবদ্ধ করিলেন।

তারপরে এই যুদ্ধে কি করা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবার জন্য এবং শ্রান্ত-দেহে বিশ্রামের বল আনিবার জন্য পিতাপুত্রে বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। মুসলমান সৈন্যগণও আহারাদির জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিল।

---

* জগন্নাথপুরের গড়ের সম্মুখে যে পার্ব্বত্য প্রান্তরে এই মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, এখন সে স্থানকে লোকে মুণ্ডমালা বা মুড়মুড়ের ডাঙ্গা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এখনও সে স্থানে যুদ্ধের দগ্ধ গোলাগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনী দ্বিতীয় যাম অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় জগতে স্নেহ-করুণার সুশীতল ক্ষীর-ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের নিশি—সর্ব্বত্র অন্ধকার; চন্দ্রহীন গগনে অগণ্য নক্ষত্রমালা উঠিয়া বসিয়া জগতের পানে চাহিয়া আছে। জগৎ সুপ্তি-সুখে নিমগ্ন,—কিন্তু বীর-কিটির সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদে রাজা, রাণী, রাজপুত্র ও কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা চিন্তা-মগ্ন। রাজপুরোহিত তর্করত্ন ঠাকুরও রাজান্তঃপুরে উপস্থিত।

রাজা উদয়নারায়ণ একখানা আস্তৃত গালিচার উপরে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, সম্মুখে রাজপুরোহিত তর্করত্ন ঠাকুর, দক্ষিণ পার্শ্বে পুত্র সাহেবরাম, বাম পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে সুবিজ্ঞ স্বজনগণ। যোষিৎকুল উদগ্রীবাকুল হৃদয়ে কক্ষান্তরে বসিয়া স্থির কর্ণে পরামর্শ শুনিতেছিলেন। বহুবিধ কথার পর রাজা নিস্তব্ধ হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ,—সকলেই নীরব। সকলেরই বদনে চিন্তার কালিমা রেখা অঙ্কিত। অনেকক্ষণ এইরূপ অবস্থায় কাটিল। তারপরে সাহেবরাম গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,- -"পলায়ন করিতে হইবে! পলায়ন করিয়া লাভ?"

উদয়নারায়ণ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"লাভ আর কিছুই নাই।

স্বধর্ম্ম-রক্ষাই লাভ। মুর্শিদকুলী খাঁ পরাজিত জমিদারগণকে মুর্শিদাবাদে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া মারিয়া ফেলে; আর তাহাদের পরিবারবর্গকে মুসলমান করিয়া সতী স্ত্রীগণের সতীত্ব বিনাশার্থ মুসলমানের সহিত নেকা দেয়। * এখন, সেই অসহনীয় অত্যাচার নিবারণ জন্যই সপরিবারে পলায়ন করিতে সংকল্প করিয়াছি।"

সা। আরও কিছু দিন এইরূপভাবে যুদ্ধ করিলে, মুসলমান সৈন্য ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন নবাব সন্ধি করিতে পারে।

তর্করত্ন ঠাকুর বলিলেন,—"মুসলমান নরপতির সন্ধি-সর্ত্ত প্রায় সুরক্ষিত হয় না।"

উ। সন্ধির আশা, দুরাশা। সন্ধির উপায় থাকিলে আগেই হইত। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ক্ষমা জানেন না,—তিনি ক্ষমা করিবার পাত্র নহেন।

ত। সে কথা আমি আগেই বলিয়াছিলাম,—প্রথমেই বলিয়াছিলাম, প্রবলের রোষ-প্রবাহ প্রবাহিত হইলে দুর্ব্বলই ভাসিয়া যায়,—কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা তখন কেহই শোন নাই। যাহারা পরামর্শ দিয়াছিল, তাহারা এই প্রবল-স্রোতে ভাসিয়া লোকান্তরের পথে চলিয়া গিয়াছে,—এখন এ বাঁধভাঙ্গা স্রোত রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই;—যাহাদের পরামর্শে এ বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছিলে, তাহারা নাই,—কিন্তু এখন এ প্রবল স্রোত শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া, তোমাদের আবশ্যক বুঝিয়া পোষমানা প্রাণীর মত ফিরিয়া যাইবে? লোকালয় চূর্ণ করিবে, দেশ গ্রাম উচ্ছিন্ন দিবে।

উ। দেব; বাদানুবাদের সময় নহে; যাহা সৎ হয়, তাহাই বলুন।

ত। এখানে থাকিলে আজি হউক, কালি হউক—নবাবসৈন্যকর্ত্তৃক নিশ্চয়ই বন্দী হইতে হইবে।

* ইতিহাসে বন্দী জমিদারগণের প্রতি এ অত্যাচারের কথা বর্ণিত আছে। Riyaza.S.Salrtin P. 256.

উ। আমিও তাই ভাবিতেছি,—আমিও ভাবিতেছি, সময় থাকিতে থাকিতে অন্যত্র প্রস্থান করি।

সা। তার চেয়ে, সম্মুখ সমরে মরা ভাল।

উ। কি সে?

সা। সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলে যাবে,—ভিখারীর বেশে, দীন-হীনের ন্যায় বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে মাতা ভগিনী ও আশ্রিত জনগণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইবে। হয়ত, নবাবের লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুঁজিয়া দৌড়িবে,—আর আমরা শিকারের মৃগের ন্যায় তাড়িত, ভীত ও আশ্রয়-বিহীন হইয়া অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরের ঘনচ্ছায়ায় লুকাইয়া থাকিব। রমণীকুল ভয়ে—উৎকণ্ঠায়, বাণ-বিদ্ধা ত্রাস-কম্পিতা হরিণীর ন্যায় মুখ পানে চাহিয়া থাকিবে,—তার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে মরা ভাল।

উদয়নারায়ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তার চেয়ে মরা ভাল; সে কথা নিশ্চয় সত্য। কিন্তু রমণীকুলের উপায়?"

সাহেবরাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তবে এক পরামর্শ।"

উৎকণ্ঠার সহিত রাজা উদয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি পরামর্শ?"

সা। আপনি পুরস্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া অদ্যই প্রস্থান করুন—আমি আরও একবার দেখিব।

উ। ইহা কি সম্ভব? তুমি আমার একমাত্র স্নেহ-পুত্তলী পুত্র,—তোমাকে মুসলমান-সমরে ডালি দিয়া আমি রমণীকুলের হাত ধরিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব? এখনও তোমার পুত্র হয় নাই, তাই পুত্রের মমতা জান না,—পুত্র প্রাণ, পিতা দেহ। দেহ কি কখনও প্রাণ রাখিয়া পলায়ন করিতে পারে!

সা। প্রাণের আশা খুব কম,—স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষাই এ পলা-

য়নের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ এখন যদি সকলেই একসঙ্গে পলায়ন করি, গড়ের মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য আছে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে,—মুসলমানেরা গড় দখল করিয়া, আমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে পারে। আপনারা গমন করুন,—আমি এ দিকে তাহাদের গতিরোধ করিয়া থাকি।

উদয়নারায়ণের নয়নে অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু ইহাই সৎ পরামর্শ বলিয়া স্থির করিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ বাটীর মধ্যে গিয়া রাণীকে ডাকিলেন। রাণী কক্ষান্তরে বসিয়া সমস্তই শুনিয়াছিলেন,—তাঁহার নয়ন দিয়া জলধারা বহিতেছিল। অশ্রুমুখী রাণী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উদয়নারায়ণ বলিলেন,—"আমাদিগকে পলায়ন করিতে হইবে।"

রাণী শ্রীমতী বলিলেন,—"সব শুনিয়াছি। বাঘিনী যখন ব্যাধ-কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হইয়া তাহার আশ্রম-বাসা পরিত্যাগ করে, তখন সে কি তাহার সন্তানটিকে ব্যাধ-করে ডালি দিয়া যায়?—মহারাজ! সাহেবরামের প্রাণের চেয়েও কি আমার প্রাণের দাম বেশী! আমি যাব না,—আমার সাহেবরামকে মুসলমান-করে ডালি দিয়া আমি কোথাও যাব না।"

উদয়নারায়ণেরও চক্ষু দিয়া অশ্রু-মালা ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু সংযমের স্বরে বলিলেন,—"স্বামীর আদেশে হিন্দু স্ত্রীর সব করা কর্ত্তব্য। তোমার পুত্র বীর,—সে প্রাসাদে থাকিয়া বীরত্ব সাধন করিবে, তাহার সে মহান্ ব্রতে বাধা দিও না। এখন জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষাই জীবনের ব্রত। স্বদেশ মুসলমানের পদে ডালি দিলাম,—রাত্রি ক্রমেই অবসান হইয়া আসিল। আর একটু পরেই মুসলমানের কামান গর্জ্জিয়া উঠিবে।"

রাণী শ্রীমতী, তখনই পুত্রবধূকে ডাকাইলেন। ফুল্ল-জ্যোৎস্না-রূপিণী পুত্রবধূ সম্মুখে আসিলে শ্রীমতী বলিলেন,—"মা, সবই

শুনিয়াছ,—হয়ত আমাদের সুখের পূর্ণিমা নিশি অবসান হইল,—রাজ-বধূ বনবাসিনী হইবে,—চল মা, আমরা পলায়ন করিব।”

সাহেবরামের স্ত্রীকে সকলে আদর করিয়া শান্তি বলিয়া ডাকিত। শান্তি বাস্তবিক তাহার নাম নহে। শান্তি বলিল,—“মা, তোমাদের সাধের ও স্নেহের শান্তি আজি অশান্তি হইয়াছে। মা, আমার জন্যই কি এত?”

বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিয়া শ্রীমতী বলিলেন, “মা, বীরপুত্র বীরোচিত কার্য্য সাধন জন্য প্রাসাদে থাকিবে। যদি মুসলমানেরা পুরী আক্রমণ করে, তখন সে যে কোন প্রকারে হউক, পলায়ন করিবে.—কিন্তু তুমি থাকিলে তাহার সে অবসরে বিঘ্ন ঘটিবে,—অতএব পুরনারীগণের সহিত তুমিও চল।”

অশ্রুমুখী শান্তি বলিল, “মা, ছায়ার জন্য দেহকে কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় না। কায়া যে দিকে যায়, ছায়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যায়।”

শ্রীমতী অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু পুত্রবধূ কিছুতেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল না। শ্রীমতী সে কথা উদয়নারায়ণকে বলিলেন।

তখন উদয়নারায়ণ পুত্র সাহেবরামকে ডাকিয়া বলিলেন, “কেবল কি আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্যই পলায়ন! বধূমাতাও যাইতে স্বীকৃত নহেন।”

সাহেবরাম পিতার কথায় তখন কোন উত্তর না দিয়া ধীর পদ-বিক্ষেপে হৃদয়ের ইন্দুরূপিণী শান্তির নিকট গমন করিলেন।

একটা কক্ষে রজতাধারে দীপ জ্বলিতেছিল, মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত মেঝেয় বসিয়া শান্তি ও কল্যাণী উদাসকাহিনীর আলোচনা করিতেছিল। উভয়েরই মুখ মলিন,—আঁখিপাতা ঈষন্নিমিলিত।

সাহেবরাম ধীর-মন্থর গমনে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতেছিল, সাহেবরাম বলিলেন,—"কেন ভগিনী, তুমি উঠিয়া যাইতেছ? আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা শুনিয়া যাও। তুমি বুদ্ধিমতী,—তুমি সব কথা সহজেই বুঝিতে পারিবে।"

শান্তি মলিন মুখে মলিন হাসি হাসিল। সে হাসিতে সাহেবরামের হৃদয়ে পরম বেদনা উপস্থিত হইল। হাসিতে বেদনা, হাসিতে অশ্রু—সে মলিন হাসি।

মলিন হাসি, হাসিয়া কাঁদায়,—মলিন হাসি, মধুরে গরলে। সীমাহারা যন্ত্রণা, বিশ্বের ঝঞ্ঝাট-ক্লেশ মলিন হাসির উপমায় হারিয়া যায়। মলিন হাসির অন্তর-স্তরে যত অশ্রু নিহিত আছে, তত বুঝি এজগতের আর কোথাও নাই। মরণের বিশ্বদাহকর আকুল কোলাহলেও এত অশ্রু সঞ্চিত নাই। কীটদষ্ট প্রসূনের বদনে, কুঞ্জগেহাবস্থিতা নিদাঘ-বল্লরীর আননে, কালিন্দীতীরস্থ উদাসী তমালের শিরে অস্তগামী সূর্য্যের মুমূর্ষু কিরণে, প্রাঙ্গণের প্রান্তদেশস্থ নিশাবশেষের পাণ্ডু চন্দ্র-চন্দ্রিকা-বরণে, মলিন হাসির কাঙ্গাল নয়নে যত করুণ অশ্রু-ভাব সঞ্চিত আছে, তাহা সে সকলের কোথাও নাই। মলিন হাসি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না,—কিন্তু তাহার মর্ম্মগাথা মরমে বিঁধিয়া যায়,—এক দিকে রৌদ্র হাসি, অন্য দিকে অশ্রু-রাশি—ইন্দ্রধনুর অনুপম বিকাশ। অধরে হাসি, নেত্র-পটে শ্মশান! এ শ্মশানে মানুষের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, মরমের মঙ্গলগ্রন্থী খুলিয়া যায়। সাহেবরাম সে হাসিতে কাতর হইলেন, বলিলেন—"সহজে কি তোমাদিগের পলায়নে মত দিয়াছি! এখানে থাকিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন সাহেবরামের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া শান্তি বলিল,—"কি বিপদ?"

সা। আমাদের সৈন্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে,—আর অধিকদিন দুর্গ রক্ষা করা যাইবে বলিয়া ভরসা করি না।

শা। তবে চল, সকলেই পলায়ন করি।

সা। আপাততঃ বাবার সঙ্গে তোমরা যাও, আমি পরে যাইয়া তোমাদের সঙ্গে মিশিব।

শা। আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব?—এত সাধনার এত দিনে এই পুরস্কার? আমার অজ্ঞাতে আমার হৃদয়, আমার মন, আমার দেহ —আমার যা কিছু, তোমাতে পূর্ণ করিয়াছ; তোমা ছাড়া আমার বলিতে ধরার মাঝে আর কিছুই রাখ নাই,—আমি কি যাইতে পারি? কি লইয়া যাইব—আমারত কিছু নাই।

সাহেবরামের চক্ষু ছল ছল করিতেছিল, কিন্তু তথাপি সংযমিতবাক্যে বলিলেন,—"তুমি থাকিলে বিপদ ঘটিবে, আমি সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া যখন পলাইতে ইচ্ছা করিব, তুমি থাকিলে সকল মুহূর্ত্তে হয়ত সে অবসর পাইব না।"

দীন নয়নে চাহিয়া শান্তি বলিল "কেন?"

সা। আমি যেরূপে বাহির হইতে পারিব, তুমি হয়ত তাহা পারিবে না।

শা। তুমি পারিলেই আমি পারিব। ফল কথা আমি তোমাকে শত্রু-বেষ্টিত এই পুরী মধ্যে একা ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিব না।

সা। উহা ভাল কথা নহে। তুমি বাবার সঙ্গে না গেলে, তিনিও হয়ত যাবেন না। তাহা হইলে বড় গোল হইবে। কল্যাণী, তুমি বুদ্ধিমতী, —তুমি বুঝাইয়া বল। এসময় সকল দিক ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে।

কল্যাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আমি কি বলিব দাদা? আমি অকল্যাণী দুর্ভাগা নারী; কোন্ অশুভ লগ্নে গোষ্ঠবিহারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম! জানিতাম না, এত অকল্যাণ কোথায় লুকাইয়াছিল? অবলা নারীর ক্ষীণ ক্ষুদ্র পদক্ষেপে শত অজগর এককালে জাগিয়া উঠিবে, কে জানিত? দাদা, আমাকে কিছু শুধাইও না,—বুদ্ধিহীনা

আমি। তুমি বীর, তুমি পণ্ডিত—তুমি যাহা বোঝ, তাই কর। শান্তি, ভগিনী,—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয় আনে। স্বামীর কথা শোন,—সংসারের গতি নারীতে জানে না,—নারী জানে স্বামী; স্বামীর পদপ্রান্তে রমণী শুধু মৌন ছায়া।”

শান্তি বলিল,—“পায়ের ছায়া পা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে?”

সাহেবরাম কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“কল্যাণী, ভগিনী,—তুমি কেন দুঃখিত হও। তোমাতে কি অকল্যাণ ছিল? এ ঘটনার মূল তুমি কেন? তুমি অত্যাচারিত হইয়া, বিপন্ন হইয়া, আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছিলে—মানুষে বিপদে পড়িলে, ভয়ার্ত্ত হইলে, মানুষেরই শরণ লয়।”

কল্যাণী অঞ্চলাগ্রে নয়নাশ্রু মুছিয়া বলিল,—“এমন সোণার সংসারে আমিই অশান্তির ঝড় তুলিয়া দিয়াছি।”

সা। কল্যাণী, সে জন্য দুঃখ করিও না। এখন শান্তিকে বোঝাও—সঙ্গে করিয়া বাবার কাছে যাও, এতক্ষণ যাবার উদ্যোগ শেষ হইয়াছে।

শান্তি বলিল,—”আমি তোমায় ছাড়িয়া যাব না। আমি গেলে তুমি নিরাপদে—প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নবাবসৈন্যের সঙ্গে লড়াই করিবে।”

শান্তির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুঝিয়া, সাহেবরাম কল্যাণীকে বলিলেন,—“তুমি বাবার সঙ্গে যাও। একা শান্তি থাক্।”

ক। আমার বড় সাধ ছিল, শান্তির সেবা করিয়া তোমার যুদ্ধশ্রান্ত দেহের সান্ত্বনা করিব।

সা। কিন্তু তাহা হইলে আমাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। একা শান্তি থাক,—নিতান্ত পক্ষে নিজের ঘোঁড়ার পাশে বসাইয়া বাহির হইতে পারিব।

কল্যাণী আর কোন কথা কহিল না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া সাহেব-

রাম চলিয়া গেলেন, এবং যেখানে রাজা উদয়নারায়ণ দ্রব্যসম্ভার বাঁধিয়া ও পুরোজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেবরাম পিতা-মাতার নিকটে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিল না—কল্যাণী বলিল। শ্রীমতী, বলিলেন,—"তবে আর কাহারই যাওয়া হবে না। অন্ততঃ আমি যাব না,—যাদের জন্যে প্রাণ রাখা, তাদের ফেলে কি জন্য যাব?"

রাজাও সেই মতে মত দিলেন। কিন্তু সাহেবরাম অনেক বুঝাইয়া, অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাদের গমনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

তারপরে, রাজা যে সকল স্থানে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, গোপনে সাহেবরামের সাক্ষাতে তাহা বলিলেন, এবং সেই অঞ্চলে গমন করিলে সাক্ষাৎ হইবে, জানাইলেন।

তদনন্তর যথাসম্ভব অল্প যান বাহন ও লোকজন লইয়া এবং ধনরত্নাদি যাহা পারিলেন, সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর-দ্বার দিয়া পুরনারী ও নিতান্ত আত্মীয় স্বজনগণকে সঙ্গে লইয়া রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণ রায় পলায়ন করিলেন। তখনও রাত্রির কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে বীরকিটির রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন,—সমস্ত প্রাসাদ জনশূন্য। কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিয়া উদাস সমীরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া হা হা করিতেছিল। শূন্য—উদাস কক্ষে কক্ষে শোকের উচ্ছ্বাস কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিতেছিল। সেই জনশূন্য বিস্তৃত রাজপ্রাসাদে সাহেবরাম ও শান্তি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত—বাহিরে শত্রুবেষ্টিত!

সাহেবরাম বলিলেন,—"শান্তি, এখানে একা কি করিয়া থাকিবে?"

শা। তুমি কোথায় যাবে?

সা। গড়ের মধ্যে।

শা। কেন?

সা। দুর্গ রক্ষার্থে।

শা। আমি কি এই জনশূন্য পুরীতে একা থাকিতে পারি?

সা। কোথায় যাবে?

শা। তোমার সঙ্গে।

সা। আমার সঙ্গে? গড়ে?

শা। হাঁ।

সা। সে কি অন্তঃপুর, না প্রমোদ কানন?

শা। না হয় রণস্থল—রণরঙ্গে প্রমত্ত স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রীও রণরঙ্গিণী। মেঘ যখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে,—দামিনীও তখন অশনি বর্ষণ করিয়া থাকে।

সাহেবরাম অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপর যথোপযুক্ত ভাবে হৃদয়ের শান্তি-স্বরূপিণী শান্তিকে লইয়া দুর্গ মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ভাল করিয়া ভোর না হইতেই নবাবসৈন্য কামান দাগিল। সাহেবরাম সৈন্য লইয়া আর বহির্গত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, এত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া কখনই নবাবসৈন্য-প্রবাহ-সমীপে দাঁড়ান যাইবে না। তদপেক্ষা দুর্গ রক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলে, বিপক্ষ-বল ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা।

নবাবসৈন্য সম্মুখে বাধা প্রাপ্ত না হইয়া গড়ের নিকটস্থ হইল,—তখন সাহেবরাম গোলন্দাজদিগকে কামান চালাইতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রাপ্ত মাত্র গোলন্দাজগণ ক্ষিপ্রগতিতে কামান দাগিল,—ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলন্ত গোলা নবাবসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল,—ঝাঁকে ঝাঁকে নবাবসৈন্য মরিয়া ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। মহম্মদজান সৈন্যদিগকে হটাইয়া লইলেন।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল,—সহস্র চেষ্টা ও আক্রমণে নবাবসৈন্য গড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না,—অধিকন্তু প্রতি আক্র-মণেই বহুসৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। মহম্মদজান মহাব্যস্ত হইয়া পড়ি-লেন। দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

তখন মহম্মদজান মুর্শিদাবাদে নবাবসাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিয়া দিলেন, "প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তিন মাস মধ্যে জগন্নাথপুরের দুর্গ দখল করিতে পারিলাম না। ইহা দখল করা অতীব দুঃসাধ্যকর কার্য্য। তবে অবরোধ করিয়া

আছি। উদয়নারায়ণের সৈন্য বাহির হইয়া যুদ্ধ করে না,—সম্মুখে বর্ষা-কাল আসিয়া পড়িল। অনাবৃত দুর্গহীন প্রান্তরে বর্ষাকালে সৈন্য লইয়া বাস করা কঠিন হইবে,—সম্ভবতঃ বিপক্ষ-পক্ষ বর্ষাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বর্ষা আমাদের সৈন্যগণকে যখন ব্যতিব্যস্ত করিবে, তখন তাহারা আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু সে সময় আক্রমিত হইলে, সৈন্য ঠিক রাখা দুর্ঘট ব্যাপার হইবে। যদি অনুমতি করেন, উদয়নারায়ণের সহিত সন্ধি করা যাইতে পারে।"

নবাব সে পত্র পাইয়া সন্ধি করা বিবেচনা করিলেন না। বঙ্গের জমিদারের সহিত সন্ধি করিলে, তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। তিনি পর্ব্বত-বিধ্বংসী কতকগুলি বড় বড় কামান ও নূতন দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং মহম্মদজানকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"যে প্রকারেই হউক, সপ্তাহ মধ্যে জগন্নাথপুরের দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক উদয়-নারায়ণকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইবে।"

মহম্মদজান শেষ উদ্যমে উৎসাহিত হইয়া, সমস্ত বল একত্র সংগ্রহ করিয়া, আর সেই সকল ভীষণ কামানে কালানল জালিয়া জগন্নাথপুর দুর্গ অবরোধার্থ ধাবিত হইলেন।

চারিদিন ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। বিশ্রাম ছিল না,—বিরাম ছিল না। কেবলই কামানের শব্দ। ক্রমেই নবাব সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। দিবা অবসান হইল,—ক্রমে রাত্রি আসিয়া ধরা আচ্ছন্ন করিল।—তথাপিও যুদ্ধের বিরাম না হইয়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সাহেবরাম বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। বিপক্ষের এক একটা গোলা আসিয়া দুর্গ প্রাচীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তথাপিও অন্তিম নিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সাহেবরাম দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেন।

এইবার একটা জলন্ত গোলা আসিয়া দুর্গপ্রাচীরের অনেক-খানি বিদীর্ণ ও ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষের

অগ্নিগোলক ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পড়িতে লাগিল,—গড়ের মধ্যস্থ সৈন্যগণ আর সহ্য করিতে পারে না। অনেকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতে লাগিল,—অনেকে ভয়ে জড় সড় হইয়া পরিখার জলে ঝাঁপ দিতে লাগিল।

সাহেবরামের শেষ আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল,—তিনি স্পষ্টতঃ শুনিতে পাইলেন,—নবাবসৈন্য 'দীন্ দীন্' রবে পরিখা পার হইয়া পড়িল।

আর বিলম্ব করিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা হয়। সাহেবরাম তাহাতেও ভীত ছিলেন না। কিন্তু শান্তি ;—শান্তির উপায় কি হইবে! তাহার উপর অত্যাচার হইতে পারে!

সাহেবরাম আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না। সৈন্যগণকে শেষ জবাব দিয়া, গড়ের মধ্যে যে কক্ষে শান্তি অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার দুয়ারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন,—"শান্তি।"

শান্তি অবস্থা বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত ছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সচকিতে বলিল,—"কেন?"

সা। আমাদের শেষ সময় উপস্থিত।

শা। কি করিতে হইবে?

সা। পলায়ন।

শা। চল।

সা। ওই দেখ, দুইটি অশ্ব সুসজ্জিত, উহার একটিতে তুমি উঠিবে,—অপরটিতে আমি উঠিব।

শা। বাঙ্গালীর মেয়ে কি ঘোড়ায় উঠিতে পারে?

সা। নতুবা উপায় নাই। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে চামড়া আছে, তোমার কোমরের সঙ্গে তাহা বাঁধিয়া দিব। তারপর আমিই দুটা ঘোড়া চালাইয়া লইব।

শা। তবে তাহাই হোক্।

শান্তিকে ঘোড়ায় চড়াইয়া জিনের সঙ্গে তাহার কোমর বাঁধিয়া দিয়া, সাহেবরাম নিজে অশ্বারোহণ করিলেন। তারপর দুর্গের পশ্চাৎভাগ দিয়া তীব্র বেগে বাহির হইয়া পড়িলেন। বীরকিটির রাজপ্রাসাদ—জগন্নাথপুরের গড় সমুদয় নবাব-সেনাপতির করে অর্পিত হইল।

যখন সাহেবরাম পরিখা পার হইলেন, তখন পঙ্গপালের ন্যায় নবাব-সৈন্য দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

মহম্মদজান দেখিলেন, দুর্গের পশ্চাদ্বার খোলা—ভাবিলেন, এই পথে কেহ পলায়ন করিয়া থাকিবে। তিনি দুইজন অশ্বারোহী সৈন্যকে সেই পথে পাঠাইয়া, অধিকাংশ সৈন্য লইয়া বীরকিটির রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে ও উদয়নারায়ণকে বন্দী করিতে ছুটিলেন,—অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিজিত দুর্গ রক্ষা করিতে রাখিয়া গেলেন।

সাহেবরাম গড়ের বাহির হইয়া, অন্ধকার রজনীর বক্ষভেদ করিয়া সস্ত্রীক অশ্ব ছুটাইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়াছেন, সহসা পশ্চাতে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। বুঝিলেন, বিপক্ষ সৈন্য হয়ত পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। তাড়াতাড়ি শান্তিকে বলিলেন,—"পিছনে বিপক্ষ আসিতেছে। তোমার অশ্ববলগা ছাড়িয়া দিলাম,—তুমি ঐ বনের দিকে যাও। অশ্ব হইতে পড়িবে না,—পায়ের আঘাত করিলেই সুশিক্ষিত অশ্ব দ্রুততরবেগে চলিয়া যাইবে।"

বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় শঙ্কাকুলিত বেদনাপ্লুত নয়নে সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্তি বলিল,—"আর তুমি?"

সাহেবরাম বলিলেন,—"যদি বাঁচি, একটু পরেই তোমার সহিত মিলিত হইব।"

আর কথা কহিতে হইল না। অশ্বারোহী সৈনিকদ্বয় নিকটস্থ হইয়া

হইয়া পড়িল। শান্তির অশ্বের বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সাহেবরাম অশ্ব ফিরাইয়া সৈনিকদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন।

অসুরবিক্রমী ভীমকান্তি সৈনিকদ্বয়ও সাহেবরামের উপর অস্ত্রোত্তলন করিল। কিন্তু সাহেবরামের সন্ধান ব্যর্থ হইল না,—তাহার বন্দুকের গুলিতে একজন সৈনিক তন্মুহূর্ত্তে গতপ্রাণ হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল, অপর সৈনিক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাহেবরামের সহিত লড়িয়া ছিল। অবশেষে সাহেবরামের প্রচণ্ড আঘাতে মুসলমান সৈনিকের হস্ত হইতে তরবারি বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল,—সাহেবরাম তাঁহার দ্বিধার তরবারি দ্বারা সৈনিকের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় অতিবাহিত না করিয়া, তিনি অশ্ব চালাইলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই শান্তির সন্ধান পাইলেন,—পুনরায় তাহার অশ্ববল্‌গা ধরিয়া লইয়া বক্রপথে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে বীরকিটির রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মহম্মদজান দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ তাহার শূন্য কক্ষ লইয়া শোকের মর্ম্মন্তুদ উচ্ছ্বাসে হা হা করিতেছে। তথায় জনপ্রাণীও নাই,—বিশেষ ধনরত্নও কিছুই নাই। যাহা ছিল, তাহা সেই রাত্রেই লুণ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু উদয়নারায়ণকে ধৃত করিতে না পারিয়া মহম্মদজান সুখী হইতে পারিলেন না।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, যখন আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া মহম্মদজানের বিপক্ষ হইল না, তখন তিনি দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ দখলের কথা নবাব-সমীপে লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং উদয়নারায়ণ যে তৎপূর্ব্বেই সপরিবারে পলায়ন করিয়াছে, এবং উদয়নারায়ণ ও বীর সাহেবরাম বন্দী হয় নাই,—তাহাও লিখিয়া দিলেন। সর্ব্ব নিম্নে লিখিয়া লেন, "উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরাম জীবিত থাকিতে, রাজসাহী

রাজ্য নিরাপদ নহে। তাহার মত বীর ও সাহসী এবং কৌশলী যোদ্ধা আমি আর দেখি নাই।"

নবাব দুর্গ দখলের সংবাদ পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্রকে ধৃত করিতে না পারিলে, কার্য্য যেন অসমাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অমাত্য বলিল,—"জাঁহাপনা; যে আপনার দুর্গ, আপনার প্রাসাদ, আপনার রাজস্ব—আপনার সৈন্য সামন্ত—বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া পলায়িত পশুর ন্যায় বনে বনে প্রান্তরে প্রান্তরে লুকাইয়া ফিরিতেছে, তাহাকে ধরিয়া আর কি হইবে? তাহার জন্য অত চিন্তা কেন?"

গম্ভীর-স্বরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বলিলেন, "রাজকার্য্য কেবল মৌলবীর শাস্ত্রজ্ঞান নহে। আদর্শ দণ্ডের জন্য তাহাকে চাই,—পিতা পুত্রকে ভীমদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, সমস্ত জমিদারগণকে শাসন-ভীতি প্রদর্শন করিব।"

অ। তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—তাহার সাধের রাজপ্রাসাদ চূর্ণ করা হইয়াছে,—আবার দণ্ডের বাকি আছে কি?

মু। আরও আছে। এ দণ্ড সকলেরই হয়। বাকি করের দায়েও জমিদারী যায়। কঠোর দণ্ড ব্যবস্থা করিতে হইবে,—উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্রকে চাই।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ মহম্মদজানকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "অধিকাংশ সৈন্য মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়া, প্রয়োজনমত সৈন্যসহ পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত বীরকিটিতে অবস্থান করিবে, এবং সামরিক পদ্ধতি অনুসারে প্রজাশাসন ও বশীভূত করিতে থাকিবে। আর সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিবে, যে ব্যক্তি উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্র সাহেবরামকে ধরিয়া

বা সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, সে লক্ষটাকা পুরস্কার পাইবে। এক এক জনের সন্ধানে পঞ্চাশ হাজার করিয়া টাকা পুরস্কার,—আর তুমিও গুপ্তচর দ্বারা তাহাদের বিশেষরূপে সন্ধান লইবে।”

তারপরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বিশ্বস্ত ও কর্ম্মকুশল পঁচিশজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কোন ব্যক্তি উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্র সাহেবরামকে ধরিয়া বা সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে,—সে লক্ষটাকা পুরস্কার পাইবে।

সর্ব্বত্রই এ সংবাদ ঘোষিত হইল। অনেক লোক অন্য কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ টাকার লোভে উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্রের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।
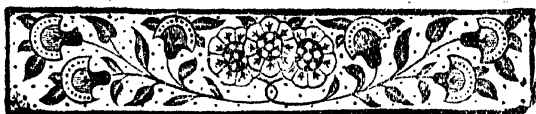
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজসাহীর রাজদুর্গ জয় করিয়া বিজয়গর্ব্বে কতক সৈন্য মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাহার অধিকাংশ সৈন্য সঙ্গে দিয়া উজির আলি খাঁ নামক জনৈক সাহসী সেনাধিনায়ককে গোষ্ঠবিহারে প্রেরণ করিলেন। পলায়িত রাজা গোপীকৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তি দখল ও রাজার সন্ধান পাইলে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য উজির আলি খাঁ সসৈন্যে গোষ্ঠবিহারাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

উজির আলি খাঁ যে সময়ে সসৈন্যে গোষ্ঠবিহারে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন বসন্তের অন্ত হইয়া গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছিল। তাঁহার গমনে কেহ বাধা দেয় নাই,—তখন গোষ্ঠবিহারে সামান্য মাত্র সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

যশোহরের ফৌজদারসাহেব নবাব মুর্শিদকুলীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু বিলাস-ব্যাপ্ত সুখ-সুপ্ত ফৌজদারের উদ্যোগ-আয়োজনে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। তারপরে, রামশরণের প্রভূত উদ্যম ও চেষ্টায় ফৌজদারসাহেবের ফৌজ সকল শীতের অন্তে গোষ্ঠবিহারের পথে বাহির হইয়াছিল।

গোষ্ঠবিহার রাজের বিচক্ষণ সেনাপতি নালডুগারি সে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। গোবিন্দরামের সহিত পরামর্শ করিয়া সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি

নৌকায় বোঝাই করিয়া ফৌজদারসাহেবের ফৌজগণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিতে বাহির হইলেন।

প্রাণপুর নামক পল্লীর প্রান্তরে উভয় দলে সাক্ষাৎ হয়। সেই প্রান্তরেই উভয় দলের রণ-দামামা বাজিয়া উঠে, এবং কামান গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়।

দুই মাস ধরিয়া উভয় দলে যুদ্ধ চলে, কিন্তু উভয় পক্ষই সমানভাবে ও অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিতেছিল। কোন দলই ক্লান্ত নহে,—কোন দলই পরাজিত নহে। তখন নালডুগারি মনে মনে স্থির করিলেন, এই সময় যদি ফৌজদারের সৈন্যের পশ্চাৎভাগ হইতে আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলে আমাদেরই জয় হইবার সম্ভব। তিনি সেইরূপ পরামর্শ দিয়া গোবিন্দরামকে সসৈন্যে আহ্বান করিলেন।

গোবিন্দরাম সে আহ্বানে প্রস্তুত হইলেন। সৈন্য সজ্জা করিবার জন্য সেনাধিনায়ককে আদেশ প্রদান করিলেন,—নিজেও প্রস্তুত হইয়া মাতৃচরণে বিদায় চাহিলেন।

মাতা বলিলেন,—"সব হারাইয়াছি; কেবল তুমিই সম্বল। এত লড়াই-হাঙ্গাম না করিয়া শান্তির দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা কর।"

নতমুখে গোবিন্দরাম বলিলেন,—"কিছু দিন এইরূপ চলিবে। তার-পর শান্তি আসিবে।"

"মা জয়দুর্গা তোমার কল্যাণ করুন।"—এই কথা বলিয়া পুত্রকে দেবপ্রসাদী বিল্বপত্র প্রদান করিলেন।

গোবিন্দরাম মাতৃ-চরণ-ধূলা মস্তকে লইয়া চঞ্চলকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

চঞ্চলকুমারী তখন একাগ্রমনে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহা অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল ম্লান,—চক্ষু স্ফীত। গোবিন্দরাম বলিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

চঞ্চলকুমারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—"কিছু ভাবি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার শেষ করিয়া ফেলিয়াছি।"

গো। কেন ভাব?

চ। এ সংসারে বড় শান্তি ছিল,—কি জানি কোন্ গ্রহদেবতার অমঙ্গল-নিশ্বাসে সেই শান্তির সংসারে অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে।

গো। মানব-ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি ঘটে না।

চ। বিশেষ রাজাদের।

গো। ভিখারীর ভাগ্যেও যে ব্যবস্থা—রাজার ভাগ্যেও তাহাই। সুখ-দুঃখের ললাট-লিপি সর্ব্বত্রই সমান।

চ। কিন্তু ভিখারিণীর সুখ বুঝি রাজরাণীর চেয়ে অনেক অধিক। ভিখারিণী ভিখারীর চরণ নিরবচ্ছিন্ন পূজাধিকারিণী।

গো। ছি ছি;—তুমি রাজরাণী,—তুমি দেশের পালয়িত্রী। তোমার এমন কথা কেন প্রাণতমে! তোমার প্রেমময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রজাপালন করিব। তোমারই প্রেমে এ হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়;—উদ্যম, আশা-ভরসা, কীর্ত্তি—সকলই মনে জাগিয়া উঠে,—শ্রান্তিহীন কর্ম্ম-সুখের জন্য চিত্ত প্রধাবিত হয়। অলসের মত বিরলে বিলাসে বসিয়া তোমার সহিত প্রেমালাপ করিলেই কি যথার্থ ভালবাসা হয়? তুমি গৃহলক্ষ্মী দেবী—গৃহে থাকিয়া স্বজনকে পরিতুষ্ট রাখ,—দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের সেবা কর; আর আমি বাহুবলে বাহিরে পড়িয়া বীর-কীর্ত্তিতে যশোলাভ করিতে থাকি।

চ। আকাশে মেঘ উঠিয়াছে,—আজ আর তোমার যাওয়া হবে না।

গো। নালডুগারির ত্বরিত আহ্বানে আমাকে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতে দিতেছে না। মেঘ বা ঝড় জল আমার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

চ। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখ,—কি ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে।

যেন অনন্তের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ মেঘখণ্ডগুলা আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আজ আর তোমার যাওয়া হবে না,—মেঘের দিনে প্রিয়-বিরহ বড়ই বাজে,—মেঘদূত পড়িয়াছ ত। যদি মেঘ-মধ্যে তোমাতে আমাতে চিরকাল লুপ্ত থাকিতাম—তা হ'লে বিশ্বের ঝঞ্ঝাট আসিয়া তোমাকে আমার কাছ ছাড়া করিয়া লইতে পারিত না।

গো। বারবেলা পড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই,—আমি তবে যাই?

সাশ্রু নয়নে চঞ্চলকুমারী বলিল,—"যাই বলিতে নাই, আসি বল। আমি একা, কি করিয়া তোমাকে ধরিয়া রাখিব? রাজ্যশুদ্ধ তোমাকে বাহিরে ডাকিতেছে,—আমার বিরহ-অশ্রু কে দেখিবে? ক্ষুদ্র আমি, কে আমার শূন্য হৃদয়ের মর্ম্মকাতরতা বুঝিবে! কিন্তু সাবধান,—দিন দিন আমার প্রাণ যেন বড়ই উতলা, বড়ই উদাস হইয়া উঠিতেছে। মা জয়দুর্গা তোমার মঙ্গল করুন।"

গোবিন্দরাম স্খলিত-পদে উদাস-হৃদয়ে বাহির হইয়া গেলেন,—তার পরে সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাণপুরের প্রান্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

গোবিন্দরাম যখন গোষ্ঠবিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সৈন্যগণ যখন প্রাণপুরের প্রান্তরে ফৌজদারের ফৌজের সঙ্গে রণরঙ্গে নাচিতেছিল,—সেই সময় উজির আলি খাঁ আসিয়া গোষ্ঠবিহারে উপনীত হইলেন। কাজেই কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না,—কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইল না।

উজির আলি খাঁ রাজবাড়ীর অদূরে—মাহিসর নদীর অপরপারে অতি তৎপরতার সহিত এক আটচালা নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ বাসভবন করিলেন, এবং সৈন্যগণের অবস্থান জন্য যথোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইলেন, —তাহার চারিদিকে কামান বসাইলেন, সৈন্য সজ্জা করিলেন। তারপরে রাজবাড়ীতে সৈন্য পাঠাইয়া লুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করিলেন।

সহায়হীন—সৈন্যহীন—বান্ধবহীন, রাজকর্ম্মচারিগণ ও গোবিন্দরামের মাতা এবং চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি সে সংবাদ শ্রুত হইলেন। তবে সংবাদটা একটু রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহারা শুনিলেন, ফৌজদারসাহেব যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পুরী ও রাজ্য-গ্রহণ জন্য আসিয়াছেন। উজির আলি খাঁও প্রকৃত সংবাদ কাহাকেও বলেন নাই। কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারিলেন না যে, গোবিন্দরামের কি হইল—সৈন্য সামন্ত কোথায় গেল। রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে বাহিরে,—চারিদিকে বিপক্ষ সৈন্য ও বিপক্ষ কামান বসিয়া গিয়াছে,—কাহারও দুর্গ হইতে বাহির হইবার উপায় নাই,—কাহারও দুর্গমধ্যে প্রবেশের উপায় নাই। ফলকথা, উজির আলি খাঁ রাজবাড়ীর দুর্গাবরোধ করিয়া বসিয়াছেন,—আর রাজকর্ম্মচারিগণ দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া তদভ্যন্তরে বসবাস করিতেছিলেন।

উজির আলি খাঁ রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করিলেন বটে, কিন্তু সহসা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইলেন না। দুর্গদ্বার বন্ধ,—রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইলে রীতিমত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু কত সৈন্য কিরূপ বল লইয়া রাজপুরীতে অপেক্ষা করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তবে অধিকাংশ সৈন্য লইয়া যে, সেনাপতি নালডুগারি ও গোবিন্দরাম বাহিরে গিয়াছেন, তাহা তিনি অবগত হইতে পারিয়াছেন,—কিন্তু ভাবিলেন, দুর্গ দখল জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সেই সময় যদি গোবিন্দরাম ও সেনাপতি সৈন্য লইয়া উপস্থিত হয়, এবং পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে,—তবেই মহান্ অমঙ্গল। কাজেই তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহার সেখানে প্রায় একমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এদিকে গোষ্ঠবিহার-রাজের সমস্ত জমিদারী কাছারিতে সৈন্য ও কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাহা দখলে আনা হইতে লাগিল।

একদিন রাত্রে উজির আলি খাঁর হঠাৎ ইচ্ছা হইল, এই নিশীথকালে

সর্ব্বত্র নীরব—সকলে সুপ্ত ; একবার দুর্গ দখলের অভিনয় করিলে হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কেবল দুর্গ দখলের অভিনয় মাত্র,—অভিনয় করিয়া বিপক্ষের উদ্যম ও বল বুঝা।

তাহাই হইল। দুইটি কামান লইয়া পরিখা পার্শ্বে পাতিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল,—কামান ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া রাজপুরীস্থ ত্রাসকম্পিতা কামিনীকুলের হৃদয় আরও কাঁপাইয়া দিল। কিন্তু পুরী রক্ষার্থ যে সেনাধিনায়ক দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, সে ভীত হইল না, দুর্গ-প্রাচীর সংস্থাপিত কামানে অগ্নি সংযোগ করিয়া বিপক্ষের অভ্যর্থনা করিল। উজির আলি সৈন্য সরাইয়া লইলেন,—সে দিন সেই পর্য্যন্ত।

যে রাত্রে গোষ্ঠবিহারের রাজদুর্গে ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, সেই রাত্রে ফৌজদারের সৈন্য মথিত করিয়া গোবিন্দরাম সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়া গোষ্ঠবিহার রাজবাড়ীর প্রায় এক ক্রোশ দূরে তিতুদহ গ্রামের নিম্নে জলঙ্গী নদীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে আসিয়া সমস্ত সংবাদ শ্রুত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যদিও তিনি ফৌজদারের ফৌজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে তিনি মুহমান ও শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ মহাবীর নালডুগারি সেই সমরে বিপক্ষের গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছে।

গোবিন্দরাম দূত পাঠাইয়া দিয়া সন্ধান লইলেন, বিনা যুদ্ধে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। নবাবসৈন্য কামান পাতিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চারিদিক ছাইয়া বসিয়া আছে। সহসা কি প্রকারে বহু নবাবসৈন্যের সম্মুখীন হইবেন, গোবিন্দরাম তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, ইহা যদি নবাব-সেনাপতি অবগত হইতে পারে, তবে তাঁহার যথোচিতভাবে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই আক্রমণ করিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া, গোবিন্দরাম স্থির করিলেন, যতক্ষণ প্রস্তুত

হইতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ সৈন্য লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ। তারপরে, সুবিধা ও সময়মতে আক্রমণ করিতে হইবে।

জলঙ্গীর পার্শ্ব দিয়া এক জল-শাখা বহির্গত হইয়া তিতুদহ গ্রামের নীচে গিয়া এক প্রকাণ্ড দহ হইয়াছিল,—তাহার চতুর্দ্দিকে বট অশ্বথ প্রভৃতি বৃক্ষ শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—স্থানটি প্রচ্ছন্ন হইলেও বহু বিস্তৃত। গোবিন্দরাম সমরতরী সকল সেই স্থানে লইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং নানাবিধ চিন্তায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলেন।

যখন প্রভাত হইল, তখন সে প্রভাত যেন তাঁহার পক্ষে জ্বালাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, কি প্রকারে প্রবলশক্তি নবাবসৈন্যের করালগ্রাস হইতে পুরী উদ্ধার করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তাঁহার মাতা, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার পুর-ললনাকুল মুসলমানের করে কি প্রকারে অত্যাচারিত হইবে। কি প্রকারে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া মুসলমান-সেনা তাঁহারই পুরীতে বিচরণ করিবে। গোবিন্দরামের তখনকার হৃদয়-বেদনা মনে মনে অনুভব করিবার বিষয়,—বর্ণনা করিবার যোগ্য নহে।

তাঁহার মনে হইল, আমার সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত না হইতে হইতেই যদি সকলে আত্মসমর্পণ করে, তবে কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হইবে! মুসলমানের উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য রমণীকুলের সতীত্ব বিনাশে একান্ত অনুরাগী। গোবিন্দরামের মর্ম্মগ্রন্থীতে বৃশ্চিক-দংশন অনুভূত হইতে লাগিল।

তারপর গোবিন্দরাম এক মতলব স্থির করিলেন। তখনকার যোদ্ধৃ-গণ সংবাদ আদান প্রদানের জন্য শিক্ষিত পারাবত সঙ্গে লইতেন। পারাবতকুল অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিল,—তাহারা লিখিত ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড বহিয়া লইয়া যাইত। যাহাদের যে সকল পারাবত, তাহাদের অঙ্গে তাহাদের চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত,—ইহাতে সকলেই আপন আপন পারাবত

চিনিতে পারিত। এখনও যে দেশে যুদ্ধাদি হয়, সে দেশে এইরূপ সাময়িক পারাবতের প্রথা প্রচলিত আছে।

গোবিন্দরামের সঙ্গেও এইরূপ কয়েকটি শিক্ষিত পারাবত ছিল। তিনি এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে লিখিলেন,—"আমি নিকটে আসিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিও না। সত্বরেই আমি দুর্গ উদ্ধার করিব।"

সেই কাগজ খণ্ড একটি পারাবতের চঞ্চুতে আবদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার সহিত আরও তিনটি পারাবত মিলিত করিয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। একটি পারাবত যায় না বলিয়া, একত্রে কতকগুলিকে ছাড়িতে হয়। কিন্তু গোবিন্দরামের সঙ্গে আর অধিক পারাবত না থাকায়, এবং আরও সংবাদ-প্রদান প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া, কয়েকটিকে রাখিয়া চারিটি ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত পায়রাগুলি আকাশ-পথে উড়িয়া চলিল।

যখন ভাগ্যদেবতা বিমুখ হয়েন, তখন সকল কাজেই বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পারাবতগুলি যখন নবাবসৈন্যের ছাউনীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তখন একজন সৈনিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহার হস্তে তখন বন্দুক ছিল,—সে পারাবত শিকারার্থ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। যে কপোতের চঞ্চুদেশে পত্র ছিল, গুলি গিয়া তাহারই বক্ষভেদ করিল,—সে পত্রসমেত মাহিসর নদীর বক্ষে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সৈনিক মারিয়াই সুখী হইল,—ধরিতে গেল না। অপর তিনটা পাখী প্রাণ লইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজবাড়ীর কেহ জলগ্রহণও করে নাই। সকলেই শঙ্কিত, সকলেই উদ্বেগ-বিহ্বল। কখন বিপক্ষের গোলা আসিয়া তাহাদের বক্ষ-পঞ্জর পুড়াইয়া দিবে, কখন বিপক্ষের সৈন্য আসিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইবে. কোলের ছেলে আছাড়িয়া মারিবে,—সতীর সতীত্ব বিনাশ করিবে! সকলেরই মুখে মরণের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে।

দাবানল-মধ্যগতা সঙ্গীশূন্য হরিণীর ন্যায় ত্রস্তা, ভীতা, কম্পিতা, শোকাকুলিতা চঞ্চলকুমারী শ্বাশুড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়া শ্বাশুড়ীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

চঞ্চলকুমারী বলিল,—"মা, এখন কি করা যায়?"

শ্বাশুড়ী দরবিগলিত অশ্রুধারা আঁচলে মুছিয়া বলিলেন,—"উপায়, মা জয়দুর্গা।"

চঞ্চলা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"কোন সংবাদ ত পাওয়া গেল না। এখন আমাদের উপায়?"

শ্বা। আমাদের উপায়—মাহিসর নদী; মাহিসর নদীর শীতলজল।

চ। তবে আর বিলম্বে কাজ কি মা;—এখনও খাওয়া হয় নি; এই সময় ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে করিতে চল জলতলে শয়ন করিগে।

গলদশ্রুলোচনে শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"মা, তোর কথা বুঝেছি,—গন্দর দুঃসংবাদ না পেতে পেতে, হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর নিয়ে জলতলে শুতে চাস্।"

এই সময় কম্পিত কলেবরে দেওয়ান সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে মৃত্যুর কালি ঢালা,—বক্ষস্থল দ্রুত-স্পন্দিত।

গোবিন্দরামের মাতা দেওয়ানের অবস্থা দেখিয়া কোন বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাদের মৃত্যু সময় কি উপস্থিত হইয়াছে?"

দেওয়ান কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"অন্য সময় হইলে, সংবাদ কিছুদিন না হয় গোপন রাখিতাম। কিন্তু শিয়রে কালসর্প শতফণা বিস্তার করিয়া দংশনোদ্যত;—আর কেন, এখন যাহাতে মান থাকে, ধর্ম্ম থাকে,—তাহার উপায় করুন।"

চঞ্চলকুমারী পড়িয়া যাইতেছিল, সামলাইয়া লইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার

ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিল। গোবিন্দরামের মাতার নয়ন দিয়া আগুনের শিখা বাহির হইয়া গেল। জ্বলিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গন্দর মরণ সংবাদ আসিয়াছে নাকি ?"

দেওয়ান শিহরিয়া বলিলেন,—"তাহাই।"

চীৎকার করিয়া উঠিয়া গোবিন্দরামের মাতা বলিলেন,—"শত্রুবেষ্টিত পুরীতে এ সংবাদ কে আনিল ?"

দে। পারাবত উড়িয়া আসিয়াছে।

রা। কোন লিপি আছে ?

দে। কে দিবে ?

রা। পারাবত কটা ?

দে। তিনটা।

রা। তবে আর কেন ? জীবন-যজ্ঞের শেষ আহুতি পড়িয়াছে। ওঠ বৌমা,—চল বৌমা, আমাদের সব ফুরাইয়াছে।

তখনকার নিয়ম ছিল, বিযোড় পারাবত আসিলে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিত। গোবিন্দরাম যোড় পারাবত অর্থাৎ চারিটা উড়াইয়া ছিলেন,—বিধাতার নির্ব্বন্ধে বিযোড় হইয়া আসিয়াছে।

রাণী পাগলিনীর ন্যায় সমস্ত রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইলেন, চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"গন্দ নাই গো ; আর কে তোদের রক্ষা করিবে। চল্, ধর্ম্ম রাখিগে—চল্ মান রাখিগে—চল্ মাইসরের শীতলজলে শুয়ে সকল জ্বালা জুড়াই গে।"

কক্ষে কক্ষে সে বাক্য ছুটিয়া বেড়াইল। সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তখনকার দিনে—শত্রুর নির্য্যাতন-ভয়ে—এমন মরণ অনেকেই মরিত। যখন সকলে শুনিয়াছিল, নবাবসৈন্যে পুরী বেষ্টন করিয়াছে, তখনই মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। যখন সকলে শুনিয়াছিল, আজি কিম্বা কালি নবাবসৈন্য পুরী মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখনই সকলে

মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল;—কেবল শেষ আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। এখন বজ্রসম রাণীর শেষ আদেশ তাহাদের বক্ষে ভীষণরূপে বাজিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে, বিষাদ-কালিমাময় আননে,—কেহ কোলের ছেলে বুকে করিয়া, কেহ বালক সন্তানের হাত ধরিয়া, গৃহের বাহির হইল। স্বামী স্ত্রীকে লইয়া, বধূ বৃদ্ধা খাশুড়ীর হাত ধরিয়া, কন্যা পিতামাতার সঙ্গী হইয়া, ভ্রাতা ভগিনীকে অগ্রগামী করিয়া বাহির হইল।

রাণী শরৎসুন্দরী যেন সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি সকলকে গৃহের বাহির করিয়া নদীসৈকতে লইলেন।

চারিজন পুরোহিত মাহিসর নদীর তীরে বসিয়া বরুণদেবের পূজা করিলেন,—হোম করিলেন। যজ্ঞশেষে রাজপরিবার যজ্ঞ ফোঁটা লইলেন। মরণের অমঙ্গল বাজনা বাজিয়া উঠিল,—সর্ব্বাগ্রে চঞ্চলকুমারী জলদেবতাকে প্রণাম করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—উচ্ছ্বসিত জলরাশি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া খরস্রোতে বহিয়া গেল। তাহার পরে রাণী শরৎসুন্দরী আর কাহাকেও দাঁড়াইতে দিলেন না—উৎসাহবাক্যে সকলকেই প্রাণ অপেক্ষা মান রাখিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিজে নদীগর্ত্তে ঝাঁপ দিলেন,—আর কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিল না,—স্নেহময়ী জননী শিশু সন্তান বুকে করিয়া, স্বামী স্ত্রীর হাত ধরিয়া, বৃদ্ধ পিতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া,—জলতলে শয়ন করিতে লাগিল। কেহ কোন দিকে চাহিল না, জীবনের মমতা ভুলিয়া গিয়া সকলেই ঝাঁপ দিয়া সেই ভীমোচ্ছাসিত জলগর্ত্তে পতিত হইতে লাগিল। দেওয়ানও পুত্রকন্যা স্ত্রী মাতা ভগিনী লইয়া রাজপরিবারের সহিত জলগর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যাহাদিগের মরণের প্রয়োজন ছিল না,—কেন না, মুসলমানসৈন্য পুরী আক্রমণ করিলে, যাহাদিগের দিকে দৃষ্টিক্ষেপেরও কোন সম্ভাবনা

বুঝিত না, এরূপ সাধারণ দাস দাসীগণও মরণকে আলিঙ্গন করিল। যাহারা বাদ্যকর, তাহারাও বাজাইতে বাজাইতে জলে ঝাঁপ দিয়া মরিল,—মরণের বুঝি নেশা জমিয়া গিয়াছিল। বেলা সার্দ্ধ তিন প্রহরের মধ্যেই—রাজপুরী জনশূন্য হইল,—আর মাহিসর নদীর উচ্ছ্বল স্রোতে কেবলই শব ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিল।*

তারপর যখন বৈকালের স্নিগ্ধ বাতাসে জগতে শান্তি আসিল, তখন সব নীরব—সব নিস্তব্ধ। রাজপুরী উদাস বিহ্বল শূন্যহৃদয়ে হা হা করিতেছিল। কেবল দুর্গ মধ্যে তখনও সৈন্যদল বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল,—আর শানিত কৃপাণ মাজিয়া ঘসিয়া আরও পরিষ্কার করিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—কিন্তু রাজবাড়ীর কক্ষে কক্ষে আর সুগন্ধি দীপ জ্বলিল না। কেবল জয়দুর্গার মন্দিরে বৃদ্ধ পুরোহিত শুধু ঘণ্টা বাজাইয়া একবার আরত্রিক করিয়াছিল। ক্বচিৎ কোথাও দুই একজন ভৃত্য সমস্ত দিনের পরে আহারের জন্য এক হাঁড়ি অন্ন চড়াইয়া দিয়াছিল, ক্বচিৎ কোথাও সহীসের দল বড় ম্রিয়মান-চিত্তে রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, ক্বচিৎ কোথাও মরণভীত-হৃদয় বৃদ্ধ রাজপরিবারের মরণ শোকে হাহাকার করিয়া শোকের কাহিনীতে আকুল উচ্ছ্বাস তুলিতেছিল।

* যে স্থানে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা রাজবাড়ীর অতি নিকটে। মাহিসর নদী ক্ষীণকলেবরা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে স্থানে একটি দহ; সেখানে এখনও অনেক জল ও প্রশস্ততা বিদ্যমান আছে। ঠিক সেই দহের উপরেই তট-ভূমিতে একটি আম্র কাঁঠালের বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। সেখানকার লোকে গান প্রভৃতিতে সে ভীষণ মরণের কথা মুখে মুখে বলিয়া আসিতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রমানাথ ঠাকুর মরে নাই। সে স্থির করিল, শুধু মরিয়া কি হইবে। আমার ভয় কি—জলে ডুবিয়া মরিতাম, না হয় মুসলমানের লাঠিতে মরিব। মরণ যখন নিশ্চয়, তখন তাড়াতাড়ি কি! যাহাদের মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনের সম্বল নষ্ট হয়, তাহারা মরিয়াছে, ভাল হইয়াছে,—আমার ভয়মাত্র মরণের, সেত এখন হইলেও হইত, দু' দণ্ড পরে হইলেও হইবে। সে সারা রাত্রি পড়িয়া এক মতলব স্থির করিয়া লইল।

প্রত্যূষে উঠিয়া মুখে কৃত্রিম দাড়ি আঁটিয়া মড়ার মালা গলায় দিয়া, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া, সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্গের বাহির হইল। অনেক দিন কল্যাণীর সঙ্গে থাকিয়া এ সকল কাজে রমানাথ ঠাকুর পারদর্শী হইয়াছিল।

নদী পার হইয়া ফকিরবেশী রমানাথ ঠাকুর যেমন তীরে উঠিয়াছে; আর একজন মুসলমান সৈনিক আসিয়া বজ্র মুষ্টিতে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল।

রমানাথ ঠাকুর বলিল,—"আমায় কেন ধর বাবা; আমি ফকির মানুষ, ভিক্ষায় যাইতেছি। ভিক্ষা না করিলেত পেট ভরে না।"

সৈনিক সে কথা শুনিল না। সে তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া উজির আলি খাঁর আটচালায় পঁহুছাইয়া দিল। মুসল-

মানরাজত্বে ফকিরের প্রবল ক্ষমতা ও সম্মান ছিল,—উজির আলি ফকিরকে দেখিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন,—"শাহসাহেব কোথা হইতে?"

র। বাবা, রাজবাড়ীর নিকটেই আমার আস্তানা। সেখানে আমার ফকির্ণী আছে। হিন্দু রাজার শূলব্যথা হইয়াছিল, আল্লার দোয়ায় আমার দ্বারা সে রোগ আরাম হয়,—সেই পর্য্যন্ত আমাকে খাতির করেন,—আমি আস্তানা গাড়িয়া ছিলাম। দুর্গ বন্ধ হইয়াছে—সকলেই গোলাগুলি বারুদ লইয়া ব্যস্ত। আমার এক শিষ্যের আ'জ সাদি—সেখানে না গেলে নয়। অনেক বলিয়া কহিয়া বাহির হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, মুসলমানসৈন্যে ফকিরকে কিছু বলিবে না।

উ। শাহসাহেব, কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।

র। খোদাতালা তোমার জানের খায়ের করুন।

উ। শাহসাহেব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

র। কর।

উ। যদি আপত্তি না থাকে, তবে বল—রাজবাড়ীর দুর্গমধ্যে কত আন্দাজ সৈন্য আছে?

র। আমি বাবা অত-শত জানি না,—তবে সমস্ত যায়গা জুড়েই আছে, এই মাত্র দেখি।

উ। তুমি কবে ফিরিবে?

র। বোধ হয় কা'ল নাগাদ সন্ধ্যা।

উ। গোবিন্দরাম কি দুর্গ মধ্যে নাই?

র। না।

উ। কোথায় আছেন, জান কি?

র। না, বাবাসাহেব; ফকির মানুষের অত আমিরী খবরে কাজ কি?

উ। ভাল, শাহসাহেব, আর এক কাজ করিতে পার?

র। কি?

উ। দুর্গে যে প্রধান সেনাপতি আছে, সে লোক কেমন বলিতে পার?

র। যোদ্ধা বীরেরা যেমন একগুঁয়ে রোকাল সীপাই হয়,—তাই।

উ। তার সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয় আছে?

র। ফকির বলিয়া সবাই একটু খাতির করে।

উ। সেনাপতি কি জাতি?

র। বোধ হয় মগ কি ফিরিঙ্গী হবে।

উ। আমি যা বল্‌ব, সে কাজ যদি হাঁসিল করিতে পার,—তোমায় অনেক টাকা বখসিস দিব।

র। কাজটা কি আগে বলই না?

উ। যে প্রধান সেনাপতি আছে, সে যদি দুর্গদ্বার খুলিয়া দেয়,—আর সহজে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয়, আমি তাহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব।

র। যদি কেবল ফকিরের মুখের কথায় বিশ্বাস না করে?

উ। আমি লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র দিব।

র। সে লেখা যদি অন্যের বা জাল বলিয়া ভাবে?

উ। তুমি বলিয়া দেখিবে,—যদি সে স্বীকৃত হয়, তবে তখন নয় অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে।

র। সে ব্যবস্থা কি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করে?

উ। ভাল, তা নয় বলিও—সেনাপতির বিশ্বাসী একজন লোক নয় তোমার সঙ্গে আমার নিকট আসিবে; আমি তাহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিব।

র। আমি বাবা তার মধ্যে নই।

উ। কিসের মধ্যে নও, শাহসাহেব?

র। আমি তোমাদের মধ্যে আসা যাওয়া করিতে পারিব না। বাবা, লড়ায়ে মানুষের যে গুঁতো,—এমন ক'রে হাতখান ধ'রে টেনে এনেছে যে, সাত দিন চুণ হলুদ না দিলে এর বেদনা যাবে না। আ'জ ফিরে গিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকতে পারিলে এ হাঙ্গাম থাকতে আর বেরুচ্চিনি, বাবা।

উ। (হাসিয়া) সে ভয় তোমার নাই। আমি তোমাকে দু'জন মানুষের আসা যাওয়ার জন্য চিঠি দিব,—তা দেখিলে আর কেহ তোমাকে কোন কথা শুধাইবেও না।

র। আমার বেলা হ'য়ে গেল; যা করিতে হয়, শীঘ্র কর। কবে আস্‌তে হবে?

উ। আজইত ফিরে আসিবে?

র। হাঁ।

উ। কল্য আসিও।

র। তাই।

উজির আলিখাঁ তখনই দুইজনের আসা যাওয়ার জন্য একখানি হাতচিঠি লিখিয়া দিলেন। চিঠিখানি ঝোলার মধ্যে রাখিয়া শাহসাহেব ওরফে রমানাথ সৈন্যাবাস ছাড়াইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

প্রায় দুই ক্রোশ পথ পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গিয়া রমানাথ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। সেখানে প্রায় একপ্রহর কাল বসিয়া বসিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিল। যখন কোন সীপাহী বা লোকজন কোথাও দেখিতে পাইল না, তখন সে কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ ও গলার মালা খুলিয়া ঝোলার মধ্যে পূরিল,—আলখেল্লা খুলিয়া ঝোলার মধ্য হইতে আঙ্গিরাখা বাহির করিয়া গায় দিল,—তার পরে ঝোলার মধ্যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ণ করিয়া সেটা জড়াইয়া একটা পুটুলী করিয়া লইয়া, আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-

মুখে চলিয়া গিয়া পশ্চিমমুখ হইল,—এবং হন হন্ করিয়া জলাঙ্গী নদীর দহাভিমুখে চলিয়া গেল।

রমানাথঠাকুর মনে করিয়াছিল, জলাঙ্গীর দহে নৌসেনার গোপন আড্ডা। গোবিন্দরাম মরিয়াছেন, নালডুগারিও কি মরিয়াছে? সেও যদি মরিয়া থাকে—একপ্রাণীও ফিরে নাই? যদি কেহ ফিরিয়া থাকে—তাহার নিকট গোবিন্দরামের সমস্ত সংবাদ শ্রুত হইতে পারিবে। আর যদি কেহ নাও ফিরিয়া থাকে—তবে প্রাণপুরের যে প্রান্তরে যুদ্ধ হইতেছে, রমানাথ একবার সেখানে যাইবে। সেখানে গিয়া বিশেষ সংবাদ লইবে,—যদি গোবিন্দরাম ধৃত হইয়া থাকেন, বা মরিয়া থাকেন,—তখন হয় মুর্শিদাবাদের দিকে কল্যানী ও রাজা গোপীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে যাইবে, আর না হয় দেশের দিকে চলিয়া যাইবে।

বহুদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া, বহুক্ষণ বিলম্ব করিয়া রমানাথ যখন তিতুদহে উপস্থিত হইল, তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যেন মধ্যগগনে বসিয়া সূর্য্যদেব আপন মনে কর বর্ষণ করিয়া নীরবে জগৎকে সন্তাপিত করিতেছিলেন। অনলের ঝলক লইয়া রৌদ্রমাখা মধ্যাহ্নের সমীরণ জীবকুলকে দহন করিতে তাহাদের অশ্রমস্থল পর্য্যন্ত ধাবমান। সূর্য্যকর বরং সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য্যকরোত্তপ্ত পায়ের বালি আগুণ হইয়া অসহ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছিল।

মধ্যাহ্ন রবিকর-বিদগ্ধ-তনু রমানাথ জলাঙ্গীর দহে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমানাথঠাকুর দেখিতে পাইল, যুদ্ধ নৌকা গুলি সারি সারি সেই বিস্তৃত দহের নীলজলে ভাসিতেছে। নৌকা বোঝাই সীপাহীরা নীরবে অবস্থান করিতেছে,—আর তত্তীরস্থ এক বহুশাখ বটবিটপী তলে বসিয়া গোবিন্দরাম কয়েকজন সেনাধিনায়ককে লইয়া পরামর্শ করিতেছেন।

গোবিন্দরামকে জীবিত দেখিয়া রমানাথ বুঝিতে পারিল, হয়ত কি

প্রকারে পারাবত উড়িয়া গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসিয়াছে। অতীব ম্লান মুখে রমানাথ ঠাকুর গোবিন্দরামের নিকটস্থ হইল।

রমানাথকে দেখিয়া গোবিন্দরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"রনানাথ; আমাদের বাড়ীর সকলে এখনও জীবিত আছেত?" ম্লান মুখে রমানাথ বলিল,—"সমস্ত বলিতেছি। আমি বড় পথশ্রান্ত হইয়াছি।"

ব্যগ্রস্বরে গোবিন্দরাম বলিলেন,—"ভাল—এই কথাটা বলিতে যতক্ষণ সময় লাগিত, তুমি তাহার অনেক অধিক কথা বলিয়াছ,—কিন্তু ভাল কথাটা বলিতে পার নাই,—তবে বোধহয় কেহ জীবিত নাই। বোধহয় মুসলমানের অত্যাচার ভয়ে সকলেই আত্মহত্যা করিয়াছে।"

রমানাথের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে জল পড়িল। সে, আত্ম সংযম করিতে পারিল না। তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া গোবিন্দ-রামও কাঁদিলেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব গিয়াছে?"

রমানাথ দুইহস্তে অশ্রু মুছিয়া বলিল,—"সব গিয়াছেন।"

গো। মা?

র। তিনিও গিয়াছেন।

গো। আর সব?

র। বৌরাণীও গিয়াছেন,—পুরীতে স্ত্রীলোক বলিতে নাই। পুরুষ মানুষও অনেক মরিয়াছে—দেওয়ানজিও সপরিবারে মরিয়াছেন?

গো। কি প্রকারে মরিল?

র। মাহিসরে ঝাঁপ দিয়া।

গো। সকলেই?

র। সকলেই।

গো। আমি যে পারাবত দ্বারা সংবাদ দিয়াছিলাম,—তার পূর্ব্বেই কি সকলে মরিয়াছিল?

তখন পারাবতের কথা উঠিল। রমানাথ ঠাকুর বলিল,—তিনটা

পারাবত গিয়াছিল,—কোন লিপি ছিল না, কাজেই আপনার মৃত্যু সংবাদ স্থির হওয়ায়, এত শীঘ্র এই কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।”

গোবিন্দরাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“বিধাতার বিড়ম্বনায় আমার সপুরী বিনাশ হইয়াছে। আমার সব ফুরাইয়াছে।” তারপরে পার্শ্বস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন,—আর বৃথা জল্পনা কল্পনায় কষ্ট কেন? আমার পরিবারগণ—আমার মা, আমার স্ত্রী—আমায় নিশ্চিন্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আর নবাবসৈন্যের প্রবল শক্তির মুখে দাঁড়াইয়া অনর্থক অনুগত সেনাগুলির প্রাণ বিনাশ করিয়া লাভ নাই। তোমরা দেশে চলিয়া যাও—আমিও আমার পথ দেখি।”

গোবিন্দরামকে সকলে বুঝাইতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু যাহার সপুরী মাহিসরের জলে ভাসিয়াছে। যাহার সমস্ত জমিদারী নবাব সরকার গ্রাস করিয়াছে, যাহার প্রাসাদের চারিধারে প্রবল প্রতাপ নবাবসৈন্যে ঘিরিয়া বসিয়াছে,—তাহাকে আর বুঝাইবার কি আছে? তাহারা বুঝাইতে পারিল না,—গোবিন্দরামও বুঝিলেন না।

সে দিন সে রাত্রি ঐরূপেই কাটিয়া গেল। তৎপর দিবস সকালে গোবিন্দরাম সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন,—যাহাদিগের বাড়ী নৌকা পথে যাইবার সুবিধা আছে, তাহারা নৌকা বাহিয়া চলিয়া গেল, যাহাদের স্থলপথে যাইতে হইবে, তাহারা হাঁটিয়া চলিয়া গেল। সে স্থলে প্রায় দুইশত নৌকা ছিল, অনেকগুলি সৈন্যেরা বাহিয়া লইয়া গেল,—যাহা পরিত্যক্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া থাকিল, তাহার সংখ্যাও শতাধিক হইবে। এই নৌকাগুলি শূন্যগর্ভে—সে স্থানে বহুদিন থাকিয়া, তারপরে জীর্ণ হইয়া জলতলে মগ্ন হইয়াছিল,—দু'দশ খানা বা জীর্ণ ও মগ্ন হইবার পূর্ব্বে কাহারও দ্বারা অন্যত্র নীত হইয়া থাকিবে।*

* তিতুদহ গ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা যে স্থানে এখন পুষ্করিণী কাটাইয়াছেন, তাহার ঠিক পশ্চিম পার্শ্বেই গন্দরাজার নৌকা বাঁধা ছিল, এবং এখনও সে

গোবিন্দরাম নিঃসম্বল, গোবিন্দরাম সহায়-সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজন শূন্য,—কেবল রমানাথ পার্শ্বে উপবিষ্ট।

রমানাথ বলিল,—"এখন কি করিবেন, স্থির করিতেছেন?"

গো। কি করিব রমানাথ, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার আত্মীয়-স্বজন যে পথে গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাব।

র। তার চেয়ে অন্যত্র গিয়া জীবন বাঁচান কর্ত্তব্য।

গো। জীবনভার বহন কিসের জন্যে,—যাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম, আর ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলাম না। তারা কোথায় গেল,—রমানাথ, বড় সাধ হইতেছে, একবার বাড়ী যাব—একবার আমার প্রাণের মানুষগুলির সমাধি স্থান দেখিব, তারপরে তারা যেখানে—যে জলতলে শুইয়াছে, আমিও সেখানে শুইব।

র। তাহাতে কি ফল আছে,—কিন্তু বাড়ী যাওয়ার উপায় আমি করিতে পারি।

গো। কি করিয়া?

র। আমি মুসলমানদের নিকট হইতে অনেক কৌশলে বাহির হইয়া আসিয়াছি। আসিবার কালে দু'জনের ছাড়ও এনেছি। যদি বাড়ী যান, লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু বাড়ী যাওয়া নিরাপদ নহে।

গো। তুমি যাইও না,—আমি যাইব। আমার জীবনের শেষ পণ তাহাই—যদি ক্ষমতা থাকে, আমার সে সাধ পুরাও রমানাথ।

রমানাথ স্বীকৃত হইল। তারপর রাত্রি হইলে সে ঝোলা খুলিয়া কৃত্রিম সজ্জা বাহির করিয়া ফকির হইল, তারপর গোবিন্দরামকে সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ী অভিমুখে চলিল।

মাহিসরের এ পারেই নবাব-সৈন্যের থানা। রমানাথ যখন গোবিন্দ-

স্থান খনন করিতে গিয়া, নৌকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড ও পেরেক প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

রামকে লইয়া সৈনাবাসে উপস্থিত হইল. তখন সৈন্যগণ আহারাদি ব্যাপারে ব্যস্ত। একজন আসিয়া ধরিল, ছাড় দেখাইলে সে সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। তারপরে নদী পার হইয়া উভয়ে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দরামকে দেখিয়া সেনাধিনায়ক প্রভৃতি যাহারা জীবিত ছিল, সকলেই হর্ষ-বিষাদে নিমগ্ন হইল। গোবিন্দরাম কিন্তু কাহারও সঙ্গে বড় অধিক আলাপ-আপ্যায়িত করিলেন না। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদশূন্য—সর্ব্বত্র নীরব, নিস্তব্ধ, অন্ধকারের রাজত্ব। গোবিন্দরাম শুনিতে পাইলেন, প্রতি কক্ষে কক্ষে যেন করুণ কাতর ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া ছুটিয়া ফিরিতেছে। গোবিন্দরামও পাগলের ন্যায় প্রতি কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইলেন,—কেহ কোথাও নাই।

উন্মাদের ন্যায় গোবিন্দরাম এক দৌড়ে মাহিসর নদীতটে—যেখানে তাঁহার সকলে ডুবিয়াছে—তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে জল তখন স্থির—যেন কিছুই জানে না। চন্দ্রকর হৃদয়ে মাখিয়া ধীর বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া কুলু কুলু তান তুলিয়া প্রেম গাথা গাহিতেছিল। উচ্চকণ্ঠে কাতরস্বরে গোবিন্দরাম ডাকিলেন,—"মা!"

কেহ উত্তর দিল না। প্রতিধ্বনি কেবল সে স্বরের সে কথার পুনরাবৃত্তি করিল,—"মা!"

গোবিন্দরাম ডাকিল—"চঞ্চল, দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।"

প্রতিধ্বনি সে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি না করিতেই মাহিসরের নীল জল একবার নাচিয়া উঠিল,—গোবিন্দরাম জন্মের মত সে জলতলে শয়ন করিলেন।

গোবিন্দরামের মৃত্যুতে দুর্গের সেনাধিনায়ক ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল,—সংবাদ পাইয়া উজিরালি খাঁ সসৈন্যে রাজপ্রাসাদ দখল করিলেন।
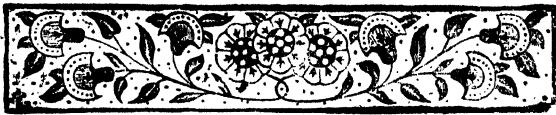
চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় তিনমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপিও উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্র সাহেবরামকে কোন প্রকারে ধৃত করিতে না পারিয়া, বা তাহাদের সন্ধান করিতে না পারিয়া নিরতিশয় উদ্বেগগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন। পুরস্কার ঘোষণা, গোয়েন্দা-নিয়োগ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রায় নিষ্ফল হইল দেখিয়া, নবাব দেওয়ানের উপর এক কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

নাটোর রাজবংশের স্বনামখ্যাত রায় রাইয়ান রঘুনন্দন এই সময়ে নবাবের দেওয়ান ছিলেন,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন রায়ের প্রবল প্রতাপ তখন সর্ব্বত্র প্রচারিত। রঘুনন্দনকে নবাব বলিলেন,—"উদয়-নারায়ণ ও তৎপুত্র সাহেবরামকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, উদয়-নারায়ণের সমস্ত জমিদারী তোমার জ্যেষ্ঠ রামজীবনের হস্তে অর্পণ করিব, —রামজীবনকে রাজসাহীর রাজা করিব। কিন্তু উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্র —উভয়কেই চাই।"

রঘুনন্দন সর্ব্বত্র চর প্রেরণ করিলেন।

এ দিকে উদয়নারায়ণ হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া সপরিবারে পর্ব্বতে পর্ব্বতে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথাও গিয়া তিনি স্থির হইতে পারেন না। সর্ব্বত্রই তিনি যেন নবাবসৈন্যের আগমন দর্শন করিতেন,—তাঁহার প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হইত, নবাবসৈন্য আসিয়া

তাঁহাকে ধৃত করিল, এবং তাহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার পরিবারবর্গকে মুসলমান করিয়া দিল। তিনি একমুহূর্ত্তও স্থির হইতে পারিতেন না,—কোথাও এক রাত্রির অধিক বাস করিতে সক্ষম হইতেন না।

এক দিন সন্ধ্যার পরে এক পর্ব্বত সানুদেশে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে জলযোগ করিতে যাইবেন, আর বাহিরে কি একটা পদার্থের পতন শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া মুখের গ্রাস দূরে ফেলিয়া দিয়া শঙ্কাকুলিত নয়নে পার্শ্বাবস্থিতা পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী পার্শ্বে চাহিয়া দেখিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল,—"ও কিছু না। একটা পাকা আতা গাছ থেকে খসে পড়িল,—কিন্তু তুমি অত শঙ্কিত হ'লে বাঁচিবে কি করিয়া ?"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উদয়নারায়ণ বলিলেন,—বাঁচিয়া আর সুখ নাই। মরণই এখন উত্তম কার্য্য।"

শ্রীমতী বলিলেন,—"তুমি অত ভীত হইতেছ কেন? জন্মিলেই মানুষ মরিয়া থাকে।"

উ। মরণে ভয় করি না। যে আশ্রয়হীন—পলায়িত পশুর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে লুকাইয়া ফেরে, তার পক্ষে মরণই মঙ্গল। কিন্তু বড় ভয় হইতেছে—পাছে, নবাব ধরিয়া লইয়া গিয়া সকলকে মুসলমান করে। হিন্দুর সতীত্বে কালি ঢালিয়া দেয়।

শ্রী। যদি তোমার সেই ভয় হয়, তবে বল না আমি মরি।

উ। আর সকলে ?

শ্রী। আর সকলকে নবাবসৈন্যে ধরিবে না—তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া যাক্।

উ। তুমি মরিবে,—আগে মরিবে? মরিও না—দিন কয়েক অপেক্ষা কর। উভয়ে একত্রে মরিব,—মরার সময় একটু বাকি

আছে। সেই পলায়নের দিন সাহেবরামের ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া আসিয়াছিলাম,—আর এক দিন না দেখিয়া মরা হইবে না।

উদয়নারায়ণের চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। শ্রীমতীও অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে বলিল,—"সাহেবরাম কি আমার বেঁচে আছে?"

উ। বেঁচে আছে,—সে দিনও কাঠুরিয়াদের মুখে শুনিয়াছি, সাহেবরাম ও শান্তিরূপিণী শান্তি আমাদের খোঁজ করে বেড়াচ্চেন।

শ্রী। তারা কি আমাদের খোঁজ পাচ্ছে না?

উ। না।

শ্রী। কেন?

উ। আমরা যে একদিনও এক স্থানে থাকিতে পারিতেছি না। যে সকল স্থানের কথা তাহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, সে সকল স্থানে তিষ্ঠিতে পারি নাই,—সে হয়ত সেখানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

শ্রী। তবে কি করিয়া দেখা হবে?

উ। আমি এক মতলব করিতেছি।

শ্রী। কি?

উ। আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। আমরা দেবীনগরে গমন করি,—সেও পাহাড়,—পাহাড়ে আবৃত বাসভবন। সেও লুকান গৃহ, সেখানে গিয়া থাকিলেও নবাবসৈন্য সন্ধান পাইবে না,—কিন্তু সাহেবরাম সন্ধান পাইতে পারে,—সে মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই দেবীনগরে সন্ধান লইবে। কেননা, সাহেবরাম জানে, দেবীনগরের প্রাসাদ অতিশয় নিভৃত।

শ্রী। আমি স্ত্রীজাতি,—ওসকল বিষয়ের আমি কি জানি,—আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, সেই স্থানেই যাইব। যেরূপে থাকিতে বলিবে, সেইরূপেই থাকিব।

সুলতানাবাদ পর্ব্বতের শিখরদেশে দেবীনগর নামক স্থানে উদয়-

নারায়ণের এক পার্ব্বত্য বাসভবন ছিল,—সেখানেও দেবালয়, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী আদি ছিল। দেবীনগরের হংসসরোবর বিখ্যাত এবং অদ্যাপিও তাহা সেই স্থানে অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া পড়িয়া আছে।

উদয়নারায়ণ দেবীনগরে যাওয়াই স্থির করিলেন। পলাইয়া পলাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের হৃদয়-বেগ যখন সীমা হারা হইয়া উঠে, তখন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। উদয়নারায়ণেরও সেই অবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে.—তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সপরিবারে দেবীনগরে প্রস্থান করিলেন।

দেবীনগরে উপস্থিত হইয়াও উদয়নারায়ণ চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। উদ্বেগাকুল-শঙ্কিত হৃদয়ে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিতেন, নবাবের লোক আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল,—প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি ভাবিতেন, তাঁহার পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া মুসলমান করিয়া দিতেছে,—তাঁহার আহার নিদ্রা প্রভৃতিও যন্ত্রণাময় হইয়াছিল। তিনি দুশ্চিন্তা দাবা-নলে দগ্ধ হইতে হইতে দীর্ঘ বিনিদ্র রজনীগুলা অতিবাহিত করিতেন।

এদিকে সাহেবরাম স্ত্রীরত্ন শান্তিকে সঙ্গে লইয়া বন হইতে বনান্ত-রালে, পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পিতার অনুসন্ধান কোথাও পাইতেছিলেন না। কচিৎ কোথাও লোকালয় দেখিলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যান,—মানুষ দেখিলে জঙ্গলে মাথা গোঁজেন; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার পিতা কোন্ পথে গিয়াছেন।

এক দিন মধ্যাহ্ন রবিকর বিদগ্ধ ধরিত্রীর উষ্ণনিশ্বাসে তপ্ততনু হইয়া এক প্রসবণ সমীপে স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় একজন মনুষ্য আসিয়া সহসা সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া উভয়েই কাঁপিয়া উঠিল,—সাহেবরাম অতি ত্বরিতে কোষস্থিত অসি উন্মুক্ত করিলেন।

আগন্তুক বলিল,—"আমি আপনার শত্রু নহি।"

সা। তুমি কে?

আ। আমি আপনার প্রজা,—ভৃত্য। আপনাকেই খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়াছি।

সা। কেন? আমাকে তোমার কি প্রয়োজন। আমি পলায়িত পশুর ন্যায় দীন।

আ। তথাপি আমার প্রভু। প্রভু, আপনাদিগকে ধৃত করিবার জন্য নবাবকর্ম্মচারিগণ এই পাহাড়ে আগমন করিয়াছে। প্রতি বনে, প্রতি গহ্বরে, পাহাড়ের, প্রতি নির্ঝরে তাহারা আপনাদিগকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

সা। আমার পিতা কোথায় সংবাদ রাখ?

আ। তিনি দেবীনগরের প্রাসাদে গিয়াছেন।

সা। সেখানে কি নিরাপদ মনে কর?

আ। নবাবকর্ম্মচারিগণ এই পাহাড়ে আসিয়াই সে প্রাসাদ সন্ধান করিয়া গিয়াছে,—তাই দিন কত নিরাপদ থাকিতে পারে। কিন্তু কোন প্রকারে জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।

সা। এখন নবাবকর্ম্মচারিগণ কোথায়?

আ। এই পাহাড়ের চারিদিকেই ঘুরিতেছে। তাহারা ছিটাইয়া পড়িয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

সা। তবে কি কোন উপায় নাই?

আ। আছে;—আমার পিতা আপনাদের অন্নেই পালিত। আমি মুকুন্দরামের পুত্র। প্রভু, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না,—এই দেখুন, আমার কাছে আপনাদের প্রদত্ত ফারমান আছে। যদি মহারাজা এত দিন ধৃত না হইয়া থাকেন,—আমি আপনাদিগকে লইয়া তিব্বতের পথে যাইব।

সা। বাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

আ। হাঁ, দেবীনগরের প্রাসাদেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—তিনি প্রথমে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই,—তারপরে ফারমান দেখিয়া বিশ্বাস করেন,—কিন্তু আমার সহিত যাইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। তিনি আপনাকে না দেখিয়া আর কোথাও যাইবেন না। তাই আমি আপ-নাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছি।

সা। সে আজি কয় দিনের কথা?

আ। দশ দিন।

সা। তারপর আর কোন সংবাদ পাও নাই?

আ। না, প্রভু।

সা। তোমার নাম কি?

আ। দাসের নাম গয়ারাম।

সা। তুমি সোজাপথে দেবীনগরে চলিয়া যাও,—বোধ হয় সোজা পথে সেখানে পঁহুছিতে তোমার দুই দিনের অধিক হইবে না। কিন্তু আমাদিগকে জঙ্গলের পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে চারি পাঁচ দিন লাগিতে পারে। বাবাকে বলিও, তিনি যেন রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া পাহাড়ের কোন গহ্বরে লুকাইয়া থাকেন। আমি হংসসরোবর তীরে উপস্থিত হইব—রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তুমি একা সেখানে আসিও সাক্ষাৎ হইবে। সাক্ষাতে পরামর্শ করিয়া যে হয় স্থির করা যাইবে।

গ। যে আজ্ঞা প্রভু। কিন্তু সাবধান—এ পাহাড়ের প্রতি বৃক্ষপত্রের মধ্যে যেন নবাবের কর্ম্মচারী বিরাজিত আছে, ইহা মনে করিয়া গমন করিবেন।

সা। ভাগ্যদেবতা যে পথে লইবেন, তাহাই হইবে। তুমি এখনই যাও—বাবার জন্যে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গয়ারাম প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। রাজকুলবধূ সংসার-ললামভূতা

শান্তি এতক্ষণ এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল. গয়ারাম চলিয়া গেলে, সে আসিয়া ধাঁ করিয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ও লোকটাকে বিশ্বাস কি? ও যে নবাবের গুপ্তচর হইতে পারে না, তাই বা কেমন করিয়া জানিব?"

শান্তির রবিকর-ক্লান্ত স্বেদবিন্দু-বিজড়িত শঙ্কাকুলিত বদনের দিকে চাহিয়া সাহেবরাম বলিলেন,—"লোকটা আমাদেরই পুরাতন ভৃত্য। রায়গড়ের তহশীলদার ছিল।"

শান্তি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"এখন নবাবের গুপ্তচরও হইতে পারে।"

সাহেবরামও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ম্লানমুখে বলিলেন,—"শান্তি, বিষাদজাল ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে,—ভবিষ্যতের অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পড়িতেছে,—ভাবিবার চিন্তিবার আর বড় অধিক সময় নাই। ভবিতব্য ললাট-লিপি স্থির করিয়াছেন, আর ভাবিবার সময় নাই,—চল ঐ গাছটায় গোটা কয়েক আম্র পাকিয়া আছে, পাড়িয়া আনিয়া ক্ষুধা নিবারণ করি।"

শান্তি আর কোন কথা কহিল না। স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আম্রবৃক্ষ তলে গমন করিল। সাহেবরাম বৃক্ষে উঠিয়া আম্র পাড়িলেন,—শান্তি সেগুলা কুড়াইয়া লইল। সাহেবরামের অসির অগ্রভাগ দ্বারা সে গুলা ছাড়াইয়া, কাটিয়া জলদ্বারা শিলাতল ধৌত করিয়া তথায় রক্ষা করিল।

সাহেবরাম অর্দ্ধেক খাইয়া অর্দ্ধেক শান্তির জন্য রাখিল। তারপর শান্তি প্রসাদ পাইল।

আহারান্তে তাহারা জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেবীনগরের পথে চলিল। এক দিন তাহারা সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে একটা ছোট পাহাড়খণ্ডের তল-দেশ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিতে পাইল, পাহাড়ের উপর দিয়া

অনেকগুলি মুসলমান সৈন্য সারি দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। শান্তি শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"উহারা কে?"

সাহেবরাম বলিলেন,—"মুসলমান সৈন্য।"

শা। কোথায় যাইতেছে?

সা। বোধ হয়, আমার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে শান্তি বলিল, —"আমরা এখন কোথায় যাইব?"

সা। এস এই পাহাড়ের গুহায় বিশ্রাম করি।

শা। দেবীনগর আর কতদূর?

সা। এক দিনের পথ।

উভয়ে গিয়া একটা অনতিপ্রসর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত পাহাড়তল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারে অপরিচিতের নিকটে নৈশফোটা কুসুম, অযাচিত সুগন্ধ বিলাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল।

স্বামী স্ত্রীতে গুহা হইতে বাহির হইয়া এক পার্ব্বতীয় ভীমকান্তি বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিয়া গল্প করিতে লাগিল,—চারিদিকে অন্ধকারের বিরাট বাহু-প্রসারিত—দূরে দূরে বায়ু-প্রবাহে বৃক্ষশাখার কম্পন, আর অন্ধকারানন্দহৃদয় প্রাণীর ক্বচিৎ শ্রবণ-ভৈরব রব।

শান্তি বলিল,—"জগতে যে এত অন্ধকার আছে, আগে আমি তাহা কল্পনাতেও ভাবি নাই।"

সাহেবরাম বলিলেন,—"জ্যোৎস্নাফুল্ল রাজকুলেশ্বরী এ অন্ধকার কেমন করিয়া ভাবিবে? অদৃষ্টে ছিল, তাই দেখিলে।"

শা। কেবল আমি নই—এমন সৌভাগ্য অনেক রাজরাণীর হই-য়াছে। সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি অনেক রাজরাণীই স্বামীর চরণ-

তলে বসিয়া এইরূপ ভীমভৈরব অন্ধকার দেখিয়া বাসন্তীপূর্ণিমার সুষমা উপভোগ করিয়াছেন।

সা। কিন্তু তাঁহাদের সে অন্ধকার রজনীর অবসান হইয়া পূর্ণিমার নিশি আসিয়াছিল,—কিন্তু তোমার ভাগ্যে এ অন্ধকার বুঝি সাথের সাথী হইল!

শা। কিসের অন্ধকার? তুমি আমার হৃদয়ের আলো।

সা। সে আলোকও বুঝি আর অধিক দিন নয়।

শা। ছিছি, ওকি কথা?

সা। উহা, সত্য কথা। শোন শান্তি——

শান্তি বাধা দিয়া বলিল,—"তোমার সত্য রাখিয়া দাও, শান্তি সত্য শুনিবে না।"

সা। তবে কি শুনিবে?

শা। সেই গল্পটা বল।

সা। কোন্ টা?

শা। সাবিত্রীর উপাখ্যান।

সা। একই কথা পুনঃ পুনঃ ভাল লাগিবে কেন?

শা। আমার নিকটে ও গল্পটা পুরাতন হয় না,—যত শুনি, ততই যেন নূতন বলিয়া জ্ঞান হয়। নিত্য নূতন নূতন ভাব অনুভব করিতে পারি।

সাহেবরাম বিটপিমূলে পাহাড়তলে শয়ন করিয়া সাবিত্রী-উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন, শান্তি শিয়রে বসিয়া এক মনে সে কথা শুনিতে লাগিল। উপাখ্যানের কত দূর বলিয়া—কথা বলিতে বলিতে ক্রমভঙ্গ হইতে লাগিল—মধ্যে মধ্যে সাহেবরাম নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। শান্তি বুঝিল, স্বামীর নিদ্রা আসিতেছে। বলিল,—"আর বলিয়া কাজ নাই, তুমি ঘুমাও।"

সা। তুমি?

শা। আমি এখন বসিয়া থাকি,—ঘুম আসিলে শোব এখন।

সা। আমার আ'জ বড় ঘুম পাইতেছে,—এমন ঘুম বনে আসিয়া আর পায় নাই।

শা। ঘুমাও—আ'জ বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হ'য়েছ।

ততক্ষণ সাহেবরাম নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শান্তি বৃক্ষকাণ্ডে দেহ হেলাইয়া বসিয়া থাকিল। সাহেবরাম নিদ্রা গেলে, সে প্রায়ই বসিয়া জাগিয়া নিশি কাটাইত। পাছে হিংস্র জন্তুতে কোন অনিষ্ট করে,—এই আশঙ্কাতেই সে জাগিয়া কাটাইত। কিন্তু তাহার স্বামী তাহা জানিতে পারিতেন না। বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে করিতে যে দিন নিদ্রার নিতান্ত আকর্ষণ হইত, বসিয়া বসিয়াই একটু ঝিমাইয়া লইত। কোন দিবাভাগে নিদ্রা গিয়া আলস্য বিদূরিত করিত।

শান্তি বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিল,—নিজের কথা ভাবিল, স্বামীর কথা ভাবিল,—শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কথা ভাবিল। তারপর বড়-নগর ও বীরকিটির রাজপ্রাসাদ ভাবিল,—শেষে মর্ত্ত্য ভাবিল, স্বর্গ ভাবিল,—ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর শীর্ণ হইল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল—রজনীর গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে,—বনের পাখী উষার আগমনী ধরিয়া—একবার ললিতের তান ছাড়িয়া আবার নিস্তব্ধ হইল। উষার বাতাসে নিশার কুসুম মধুর গন্ধ ঢালিয়া দিতেছে।

সাহেবরাম চেতনা পাইয়া হস্তের উপর মস্তক তুলিয়া সম্মুখোপবিষ্টা শান্তির ম্লানমুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাত্রি কত?"

শা। রাত্রি আর নাই। পাহাড়ের বনতরু শুধু অন্ধকার ধরিয়া রাখিয়াছে,—উষা আসিয়াছে। উষার বাতাস বহিতেছে।

সা। তুমি কি ঘুমাও নি,—সারা রাত্রি কি জাগিয়া বসিয়া আছ?

শা। ঘুমাতে পারি নি।

সা। বড় ভয় হইয়াছে? ভয় হইবারই কথা,—একেত এই অসম্ভাবিত—অযথোচিত কষ্ট, তার উপর উদ্বেগ—বিশেষতঃ গতকল্য আমাকে ধৃত করিবার জন্য সমাগত নবাবসৈন্য দর্শনে বোধ হয়, বড় উতলা করিয়াছে,—শান্তি, তোমাকে যে আমি এত কষ্ট প্রদান করিলাম, এ দুঃখ আমার সঙ্গের সাথী হইল।

শা। আমার কষ্ট! আমার কি কষ্ট? আমি জীবনের পূর্ণ সুখে আছি,—আনন্দের আবাসে ঐশ্বর্য্যের উপরে বসিয়া কে কবে জীবনের সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছে? মরণের তট-প্রান্তে জীবনের সুখ—এ সুখের চেয়ে সুখ নাই। এ জগতে যত সুখ, যত শোভা, যত প্রেম আছে—সমস্ত নিঙড়াইয়া ছানিয়া মথিয়া যে পদার্থে পরিণত হয়, সেই প্রগাঢ় পদার্থ আমার হৃদয়ে সদা লিপ্ত। রমণীজীবনের প্রতি বিন্দুটীতে যত মধু, যত অমৃত, যত সুখ, যত আনন্দ আছে—প্রতি মুহূর্ত্তে আমি তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি। ঘন-বিন্যস্ত বনরাজি, পুষ্পিতা লতিকাকুল, পাহাড়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ, বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত অনন্ত উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণী—ইহারা আমাকে অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় অযাচিত আনন্দ প্রদান করিতেছে। আর তুমি আমার,——

শান্তির গলার স্বর জড়াইয়া আসিল। সাহেবরাম বলিল, "আর আমি তোমার কি শান্তি? বল শান্তি,—এ জীবন মরুভূমির তুমি শান্তি,—আর হয়ত শোনা হইবে না। জীবননীহারিকা বিশুষ্ক হইয়া উঠিল,—প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা বিপন্ন। বল, শান্তি—কি বলিতেছিলে?"

শান্তি বলিল,—আমি কি বলিতে জানি? তবে মনে হয়,—তুমি আমার সুখের পারাবার। তোমার নিকটে থাকিয়া আমি যে সুখ, যে আনন্দ, যে তৃপ্তি লাভ করিতেছি—ইহা বুঝি অনন্ত সাধনার ফল! রাজপ্রাসাদে থাকিলে সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য—আমার এ সুখের বিঘ্ন হইত।"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাহেবরাম বলিলেন,—"কিন্তু তোমার কষ্ট, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

শান্তি তাহার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ আরও একটু উন্নত করিয়া বলিল,—"আমার দুঃখ! আমি কে—আমি কে নাথ? সকলইত তুমি। পতিরূপে তুমি প্রভু, তুমিই আমার ইষ্ট দেবতা—তুমি বিশ্বপতি শ্রীপতি আমার। তুমি বিনা এই বিশ্ব মহা মরুভূমি,—তুমি বিনা এ সংসার ঘনান্ধ-তমিস্রামগ্ন দীপ্ত সহস্রার! তুমি আমার সাধনার সিদ্ধি—প্রজাপতি বরলব্ধ স্বাস্থ্য দেবতা। তুমি এ রমণী হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি,—তুমি জীবননিকুঞ্জের মধ্যে মুখরিত পিক। আমি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী—তুমি পারাবার। আমাকে দেখিয়া—এ বনপথে সঙ্গিনী করিয়া যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে প্রভু, এ আশামুগ্ধ তাপদগ্ধ রুদ্ধ কল্লোলিনী তোমার অসীমত্বে এ সসীমত্বটুকু ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছে—তুমি যদি অনুমতি কর—তুমি দয়া করিয়া যদি মিশাইয়া লও।"

সাহেবরাম উচু হইয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়নকোণে অশ্রু সঞ্চিত হইল। বলিলেন,—"তোমাকে হারাইয়া এ বনপথে নিঃসঙ্গ হৃদয়ে কি করিয়া থাকিব।"

শা। সে কি গো; নিঃসঙ্গ কি? তারপর, দুইজনে এক সঙ্গে মিশিব—দুইজনে এক হইয়া সেই অনন্তের মহা পথে ছুটিব।

শান্তির প্রশান্ত নীলোৎপলদলপ্রভ নয়নে দিব্য মাধুরী ঝরিতেছিল। সাহেবরাম বলিলেন,—"শান্তি, যদি আমাকে নবাবসৈন্যে ধৃত করে, তুমি কি করিবে?"

শান্তি চমকিয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

সাহেবরাম বলিলেন,—"আমাকে যদি ধরিতে পারে, তবে হয়ত মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে?"

গলা ঝাড়িয়া শান্তি বলিল,—"কেন?"

সা। বিদ্রোহী বলিয়া যাহাদিগকে বন্দী করে, তাহাদিগকে ঐরূপ করে।

শা। গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগীর নরক হয়। স্বধর্ম্মে মরাও ভাল।

সা। বন্দী করিয়া কি করে জান?

শা। না,—জানিয়াও কাজ নাই। রাজপুত্রের বন্দী হইয়া অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে মরা ভাল।

সা। তুমি আমাকে মরিতে উপদেশ দিতেছ?

শা। তোমার শত্রু মরুক।

সহসা সাহেবরাম চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"শান্তি, কে একজন মানুষ এইদিকে আসিতেছে।"

শান্তিরও মুখ মলিন হইল। সাহেবরাম ত্বরিতগতিতে একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া বলিলেন,—"শান্তি গয়ারাম আসিতেছে।"

শান্তি কোন কথা কহিল না। ততক্ষণ গয়ারাম আসিয়া সাহেবরামকে অভিবাদন করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বেদনাপ্লুত উচ্ছ্বল হৃদয়ে সাহেবরাম গয়ারামের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে কেন আসিলে?"

গ। আপনাদের সন্ধানে।

সা। আমরা এখানে আছি, তাহা কেমন করিয়া জানিলে?

গ। তাহা জানিতে পারি নাই,—তবে এই পথে আসিবেন, ইহা জানিতাম। তাই এই পথ ধরিয়া চলিয়াছি।

সা। দেবীনগরে গিয়াছিলে?

গ। আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম।

সা। বাবার সংবাদ কি?—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?

গ। সংবাদ ভাল নহে।

পথহারা সান্ধ্য পথিকের পাদমূলে বিষধর সর্পে দংশন করিলে, সে যেমন চমকিত ভীত ত্রাসিত কম্পিত ও জীবনআশা পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল উদ্বেল ও আকুল হইয়া পড়ে, গয়ারামের কথা শুনিয়া সাহেবরামও তদ্রূপ হইলেন। ব্যাকুল হৃদয়ে আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"কোন্ সংবাদ ভাল নহে, গয়ারাম? বাবা কেমন আছেন?"

গ। গত পরশ্বঃ সন্ধ্যার সময় রায় রাইয়ান দেওয়ান রঘুনন্দনের নিকট তিনি ধরা পড়িয়াছেন।

সাহেবরাম বসিয়া পড়িলেন। হৃদয়ের মধ্যে শতবৃশ্চিক জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন,—সমস্ত পাহাড় ভাঙ্গিয়া আসিয়া যেন তাঁহাকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইতেছিল। পায়ের তলে পৃথিবী ঘুরিতেছিল। অনেকক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না,—তারপর অন্তরের তপ্তশ্বাসটুকু দিগন্তের কোলে ঢালিয়া দিয়া সাহেবরাম বলিলেন,—"বাবাকে কি তাহারা মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়াছে?"

গ। না।

সা। বাবা এখনও কি দেবীনগরে আছেন?

গ। হাঁ।

সা। যখন বন্দী করিয়াছে, তখন মুর্শিদাবাদে না লইয়া গিয়া এখনও দেবীনগরে রাখিয়াছে, কেন?

গ। আপনাকে চায়।

সা। আমাকে চায়?—আমি বুঝিতে পারিলাম না, আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বল?

গ। দেওয়ান রঘুনন্দন অনেকগুলি সৈন্য লইয়া এই পর্ব্বতে আসিয়া কয়েক দিন ধরিয়া মহারাজকে ও আপনাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। দেবীনগরের প্রাসাদে মহারাজ সপরিবারে ফিরিয়াছেন শুনিয়া, প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়াছে।

সা। বাবা কি পূর্ব্বে সংবাদ পান নাই?

গ। আমি তাহার কিছু পূর্ব্বে মহারাজের নিকট পঁহুছাই,—এবং পথে রঘুনন্দন ও তাঁহার ফৌজের সংবাদ পাইয়া, তাহা মহারাজকে জ্ঞাত করাই, এবং পলায়ন করিতে অনুরোধ করি।

সা। বাবা পলাইলেন না, কেন?

গ। তিনি বলিলেন, আর পারি না। পলায়িত উদ্বেগময় জীবন বহন আমার পক্ষে ভার হইয়াছে। দেওয়ান রঘুনন্দন হিন্দু,—তাঁহার

নিকটে ধরা দিব,— কাঁদিয়া সাধিয়া বলির—তিনি আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে কখনই মুসলমান করিবেন না। আমরা কিছুতেই মহারাজার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না—অধিক সময়ও পাইলাম না,—কিছুক্ষণ পরেই ফৌজগণ প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিল।

সা। আমার জন্য তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যায় নাই, কি বলিতেছিলে?

গ। এখন অত্যাচারের একশেষ হইতেছে।

সা। কি হইতেছে, স্পষ্ট করিয়া বল। হৃদয় পাষাণ করিয়াছি,—মরণের মঙ্গল-আরাবে কর্ণ বধির করিয়াছি,—কোন কথা গোপন করিয়া সময় নষ্ট করিও না।

গ। আপনাকে না পাইয়া, দেওয়ান উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, মহারাজই আপনাকে কোথায় গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন, এবং আপনি কোথায় আছেন, সে গোপন-সন্ধান মহারাজ নিশ্চয়ই জানেন। দেওয়ানজি আপনাকে ধরাইয়া দিবার জন্য মহারাজকে পুনঃপুনঃ আদেশ করেন। কিন্তু মহারাজ শপথ করিয়া বলিলেন, 'সে সন্ধান আমি জানি না।' কিন্তু দেওয়ানজি সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বক্স আলি নামক তাঁহার জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারীর উপরে মহারাজের নিকট ঐ সন্ধান লইবার আদেশ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছেন। ফৌজে দেবীনগর ঘিরিয়া রহিয়াছে।

সা। বক্স আলি এখন কি করিতেছে?

গ। বক্স আলি যাহা করিতেছে,—তাহা মানুষে করে না। আপনি কোথায় আছেন, মহারাজ বলিতে না পারায়, তাহারা ভাবিতেছে,—মহারাজ ইচ্ছা করিয়াই তাহা বলিতেছেন না,—তাই প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাঁহাকে অনাবৃত স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিতেছে,—আরও—বলিতে কণ্ঠ রোধ হইতেছে—নানা প্রকারে সাজা দিতেছে।

আমি শুনিয়া আসিয়াছি—বক্স আলি বলিয়াছে, তিন দিনের মধ্যে যদি সাহেবরামকে হাজির না কর,—তোমার সম্মুখে—তোমার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের অপমান করাইব—সতীত্ব খোয়াইব—গোমাংস খাওয়াইব।

সাহেবরামের চক্ষু দিয়া অনল-স্রোত বাহির হইয়া গেল। কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আর না গয়ারাম, চুপ কর। চল, তোমার সহিত আমি এই মূহুর্ত্তেই ধরা দিতে যাইব।"

শান্তি কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কথা শুনিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"একটু অপেক্ষা কর।"

গয়ারাম বলিল,—"বিপদে ধৈর্য্যই বন্ধু।"

শান্তি গয়ারামের সহিত কথা কহিল। শ্মশানে লজ্জা থাকে না। শান্তি বলিল,—"আমার শ্বাশুড়ীর খবর জান?"

গ। পতির যন্ত্রণায় সতী রাণী মা আত্মহত্যা করিয়াছেন।

সাহেবরাম "মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শান্তি আঁচলে, প্রবহমান চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"শ্বাশুড়ীর মতই কাজ হইয়াছে। গয়ারাম, তুমি দেবীনগরে যাও,—সেখানে পঁহুছিতে আমাদের কত সময় লাগিবে?"

গ। সোজাপথে গেলে চারিদণ্ডের অধিক সময় লাগে না, কিন্তু সোজা পথে যাইবেন না। সেখানে গিয়া, অবস্থা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিবেন।

সা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর কিছু নাই,—বাবার যন্ত্রণা, পরিবারস্থ কামিনীগণের অত্যাচার—আর আমি প্রাণ লইয়া বনে বনে লুকাইয়া ফিরিব!

গ। আর আপনাকে ধরিয়াও যদি ঐ সকল অত্যাচার করে?

সা। কি করিব—তখন আর উপায় কি? হীনবীর্য্য হতভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস ব্যতীত আর সম্বল কি আছে? আমিত নিমিত্তের ভাগী হইব না! কিন্তু সে সকল দেখিবার জন্য জীবন রাখিব না।

শা। বনপথে—জঙ্গলে ঘুরিয়া যাইতে হইলে, কত সময় লাগিবে?

গ। সন্ধ্যা হইতে পারে।

শা। আমার শ্বশুরের সঙ্গে কল্যাণী বলিয়া একটি মেয়ে আছে।

গ। হাঁ, তা জানি,—সেই-ই ত সর্ব্বনাশ করিয়াছে!

শা। তার দোষ দাও কেন,—ভবিতব্যতাই সব। সে আর কি করিয়াছে,—বিপদে পড়িয়া শরণাগত হইয়াছিল। তাকে সন্ধ্যার পর দেবীনগরের কোন একটা স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিতে পার?

গ। যদি সুবিধা হয়, প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

সা। তুমি যাও—সন্ধ্যার পরে কল্যাণীকে পাঠাইতে পারিলে, পাঠাইও। আর তুমি রাত্রি একপ্রহরের সময় হংসসরোবরের তীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তৎপূর্ব্বে আসিও না। সেই সময় সমস্ত কথা শুনিব,—বলিব, তারপরে যে ব্যবস্থা হয়, করিব। আজ সপ্তমী তিথি—চৌদ্দদণ্ডের পর অন্ধকার পড়িবে, তার আগে যেন তোমার আসা হয়। কল্যাণীকে সন্ধ্যারপরে হংসসরোবরের তীরে সাক্ষাৎ করিতে বলিও।

"তবে তাই" এই কথা বলিয়া গয়ারাম অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। সাহেবরাম ও শান্তি অনেক বসিয়া বসিয়া কাঁদিল। তারপরে, উভয়ে উঠিয়া জঙ্গলপথে দেবীনগর অভিমুখে চলিয়া গেল।

তাহারা জগৎ ভুলিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া চলিয়াছিল,—শোকে মোহে ভয়ে ক্ষোভে দম্পতির হৃদয় ভগ্ন ব্যথিত ও বিদীর্ণ। সেদিন আর পথে বিশ্রাম করে নাই—জলস্পর্শও করে নাই, এমন কি বাক্যালাপও বড় হয় নাই। গয়ারাম বলিয়াগিয়াছিল, জঙ্গলপথে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইতে

পারে, কিন্তু বৈকালেই তাঁহারা দেবীনগরে হংসসরোবরের অদূরে এক বিরাট জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে দিবাভাগে আর অগ্রসর হওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনায় সমস্ত দিন স্বামী স্ত্রীতে বেদনার বৃশ্চিক দংশন বুকে করিয়া সেই জঙ্গলে অতিবাহিত করিলেন। সেই স্থান হইতেই তাঁহারা নবাবফৌজের গতায়াত দর্শন করিয়া দেবীনগর অবরোধ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—কিন্তু দেবীনগরের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল না,—নহবত থানায় মধুর স্বর চালিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল না। সর্ব্বত্রই যেন ভীষণতার অমঙ্গল ছবি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে সাহেবরাম জঙ্গলের বাহির হইয়া হংসসরোবর তীরে গমন করিলেন।

চারিধারে ঢালু, অনুচ্চ উপলখণ্ড বেষ্টিত এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকার নাম হংসসরোবর। হংসসরোবর রাজা উদয়নারায়ণের সৌন্দর্য্যানুরক্তির ও শিল্পজ্ঞানের অত্যুত্তমপরিচায়ক ও অনন্ত কীর্ত্তির উত্তম আলেখ্য। *

জ্যোৎস্নায় দিগন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল,—দিশেহারা ধীর বাতাস হংসসরোবরের শীতল জলে অবগাহন করিয়া তাহার কোন উদাস গাথা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। সরোবরতীরের শ্যাম শষ্পাস্তৃত ভূখণ্ডে চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছিল,—ধীরে ধীরে শান্তিকে সঙ্গে লইয়া উদ্ভ্রান্ত ভীত উদ্বেলিত এবং শোক-মোহ-মুহ্যমান সাহেবরাম আসিয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বত্র নীরব—সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। দম্পতিও নীরব নিস্তব্ধ; কিন্তু তাহাদের প্রাণের মধ্যে ঝটিকাবেগ, তাহা কেহ বুঝিল না। কাহার বেদনা কে বুঝিতে পারে!

* সাঁওতাল পরগণা জেলার মধ্যে এই দেবীনগর অবস্থিত। এখনও সেখানে হংসসরোবর পুরাতন শোকের কাহিনী বুকে করিয়া পড়িয়া আছে। অনেক দর্শক এখনও হংসসরোবর তীরে গমন করিয়া পূর্ব্বস্মৃতির শোকের কাহিনী শুনিয়া আইসে।

সহসা তাহারা দেখিতে পাইল, তুইজন লোক কথা কহিতে কহিতে আসিয়া সরোবরের জলে নামিল। সাহেবরাম একটা পুষ্পকুঞ্জের মধ্যে শান্তিকে টানিয়া লইয়া লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল। কথা স্পষ্ট স্পষ্ট—সে স্বর তাহাদের পরিচিত। এক বৃদ্ধা দাসী রামার মা, আর রাঁধুনী হরিদাসী ঠাকুরাণী।

রামার মা বলিল,—"মাঠাক্‌রোণ—আর যাতনা দেখতে পারিনে। ইচ্ছে করে কি, এই জলে এসেছি, আর ফিরে যাব না,—এইখানে ডুবে সকল আপদ চুকাই। আ-হা-হা; রাজা—সুখের শরীর। অত কষ্ট কি সহ্য হয় গা! সারা দিন রোদে দাঁড় করিয়ে রাখবে—এক ফোটা জল খেতে দেবে না। তারপর, এখন ছেড়ে দেবে। রাজা এখন একরত্তি জল খাবেন।"

হরিদাসী ঠাকুরাণী বলিলেন,—"রাণী মরেছেন, না বেঁচেছেন। আমিও আর রাজার কষ্ট দেখতে পারিনে। আমিও রাণীর সঙ্গী হতেন। তবে কি জান, রাজা আর কারো রান্না ভাত খান না,—আমি যদি মরি, রাজা না খেয়েই মারা যাবেন। যে কদিন তাঁকে জ্যান্ত রাথ্‌বে—সে কদিন থাকি—তুটো রেঁধে খাওয়াই,—তারপরে রাজাও যে পথে যাবেন, আমিও সেই পথে যাব।"

রামার মা বলিল,—"রাজাকে কি মেরে ফেল্‌বে?"

হ। তা নাত কি পূজো কর্‌বে। সাহেবরামকে পেলেই হয়, তুই বাপ বেটাকে একত্রে বেঁধে মার্‌বে—আর কি!

রা-মা। সাহেবরাম কোথায় গিয়েছেন, সত্যি সত্যি রাজাত আর তা জানেন না,—কাজেই বল্‌তেও পার্ব্বেন না। কিন্তু আর কত কষ্ট সবেন?

হ। চল্‌ মা, তুটো ভাত রাঁধিগে, সমস্ত দিন অসহ্য জ্বালা দিয়ে, এখন রাজাকে একটু ছেড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, এই মাত্র স্নান ক'রে পূজোয় বসেছেন,—আহা পূজো কর্ত্তে ব'সে কেবল

চক্ষুর জলেই ভাসেন। তাঁর মুখ দেখে, বুক ফেটে যায়,—কেবল দুটো ভাত রেঁধে দেবার জন্যেই আত্মহত্যা করিনে।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা গাত্রধৌত সমাপ্ত করিল। তারপরে, জল হইতে চলিয়া গেল।

সাহেবরাম সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"শান্তি, শুনিয়াছ?"

করুণ কম্পিত কণ্ঠে শান্তি বলিল,—"শুনিয়াছি।"

সা। আমি আর পিতার কষ্ট শুনিতে পারিতেছি না,—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিতেছি না,—আমি ধরা দিব।

শা। ধরা দিবে,—পিতা পুত্রে একত্রে সেই যন্ত্রণা ভোগ করিবে?

সাহেবরাম অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"শান্তি, হৃদয় দৃঢ় কর, মরণের জন্য প্রস্তুত হও।"

শান্তি বলিল,—"সে অনেক দিন হইতেই আছি। হিন্দুর মেয়ে মরণে ভয় করে না। হাসি মুখে যারা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরে, তারা কি মরণে ডরায়? কি বলিবে, তাই বল?"

সা। তুমি চিরসঙ্গিনী,—তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিব না। তুমি এই অঙ্গুরী চুম্বন কর।

শান্তি হংসসরোবরের শীতল জল হইতে স্নান করিয়া, স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। তারপর, সাহেবরামের হস্ত হইতে হীরকাঙ্গুরীয়ক লইয়া, একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"অভাগিনীর ইষ্টদেবতা স্বাধীনতা হারাইয়া মুসলমানের করে যাতনা সহ্য করিও না। সে দিন যাহা বলিতে বলিতে চাপিয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলি—ইষ্টদেবতা-বিগ্রহ ম্লেচ্ছকরস্পর্শ হইতে দেখিলে, দুর্ব্বল ভক্ত তাহা বিসর্জ্জন করিয়া ম্লেচ্ছস্পর্শ হইতে রক্ষা করে। মনে রেখ,—দাসী তোমারই সেবিকা। চলিলাম—অনন্তের পথে আবার মিলিব।"

শান্তি সেই বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার বর্ণ কালিমাময় হইয়া গেল,—এতক্ষণ সে একদৃষ্টে স্বামীর চরণ পানে চাহিয়া ছিল,—এখন ঢলিয়া পড়িল। সাহেবরাম চক্ষুর জল মুছিয়া অঙ্গুরীয়ক কুড়াইয়া লইয়া সেই পবিত্র দেহ স্কন্ধে লইয়া হংসসরোবরের শীতল জলতলে রাখিয়া আসিলেন। তারপরে কাহার অপেক্ষা করিয়া বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

যাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল। যে আসিল সে গয়ারাম। গয়ারাম আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"প্রভু, আসিয়াছ? মহারাজের প্রতি পাশবিক অত্যাচার আর সহ্য হয় না।"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সাহেবরাম বলিলেন,—"গয়ারাম, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়াছি—শান্তিকে হংসসরোবরের শীতল জলে ডুবাইয়াছি। এখন প্রশান্ত চিত্তে ধরা দিতে পারিব।"

গয়ারাম নয়নধারা মার্জ্জনা করিয়া বলিল,—"প্রভু, ধরা দিবে?"

সা। হাঁ, ধরা দিব। কিন্তু যেরূপে ধরা দিব,—তুমি তাহার সহায়তা করিবে, তাই তোমার অপেক্ষায় পথ-পানে চাহিয়া বসিয়া আছি।

গ। সে কি প্রকার প্রভু?

সা। জীবন্তে মুসলমানের নিকটে পিতার দণ্ড দেখিতে যাইতে পারিব না। আমি মরিব,—মরিলে, তুমি আমার মৃত দেহ বহন করিয়া মুসলমানের নিকট লইয়া যাইও। আমি জীবন্ত আছি,—তাহাই মুসলমানের উদ্বেগ। আমার মৃত দেহ পাইলে, তাহাদের আকুল বাসনার নিবৃত্তি পাইবে।

গ। আর মহারাজ? মহারাজের দশা কি হইবে? বাহিরের অত্যাচারের চেয়ে পুত্রশোকের আগুণ কি অন্তর দগ্ধ অধিক করে না?

সা। তাঁহার সম্মুখে আমাকে দগ্ধ করিবে, আমার সম্মুখে তাঁহাকে দগ্ধ করিবে—সে আগুণ আরও জ্বালাময়।

গ। তবে কি ঐ-ই পথ, প্রভু?

"এই-ই পথ"—সাহেবরাম আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। যে অঙ্গুরীয়কের বিষে শান্তি দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সাহেবরামও তাহা চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন,—"বাবা, তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান, তোমাকে অত্যাচারের হস্তে অর্পণ করিয়া এইরূপেই চলিল।"

গয়ারাম কাঁদিল, সাহেবরাম অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢলিয়া পড়িয়া ধরাতল আশ্রয় করিল,—তাহার জীবনের শেষ শ্বাসটুকু অনন্তের পথে চলিয়া গেল।

গয়ারাম হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে আরও কয়েক-জন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গয়ারাম তাহাদের সাহায্যে সাহেবরামের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া বক্স আলির নিকটে পঁহুছাইয়া দিল। বক্স আলি তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলে, গয়ারাম বলিল,—"হিন্দু-ভৃত্য প্রভুর দেহ বেচিয়া অর্থ গ্রহণ করে না।"

উদয়নারায়ণ ইষ্টপূজা সমাপ্ত করিয়া তখন কেবল একগ্রাস অন্ন মুখে তুলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন,—"সাহেব-রামের মৃত দেহ মুসলমানের হস্তগত হইয়াছে।" তিনি বুঝিলেন, মুসল-মানেরা তাহাকে হত্যা করিয়া, তাহার মৃত দেহ লইয়া আসিয়াছে,—সে বীর, জীয়ন্তে পরাধীন হয় নাই। মুখের গ্রাস দূরে ফেলিয়া হাহাকার করিয়া লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তৎপর দিবসই রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণ ও সাহেবরামের মৃত দেহ রাইরায়ন দেওয়ান রঘুনন্দন কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিল। *

* জনপ্রবাদ এইরূপ যে, রাজা উদয়নারায়ণ হংসসরোবর তীরে বিষপানে জীবন পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সাহেবরাম মরেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সাহেবরাম ও উদয়নারায়ণ উভয়েই বন্দী হন। তাহাও নহে। উদয়নারায়ণ বন্দী হইয়া কারাগারে এবং সাহেবরাম হংসসরোবরের তীরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজপুত্র মরাক্তে

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, এই কার্য্য সম্পন্ন করায় রঘুনন্দনের উপর যথেষ্ট প্রীত হইলেন, এবং রাজা উদয়নারায়ণের পরিত্যক্ত সমস্ত রাজসাহী প্রদেশ দেওয়ানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন ও কুমার কালুকে অর্পণ করিলেন। কুমার কালু—নাটোর রাজবংশের কুমার কালিকাপ্রসাদ।

রাজ্য গেল, রাজ-প্রাসাদ গেল, স্ত্রী পুত্র গেল, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ধন সম্পত্তি সব গেল,—কিন্তু রাজা উদয়নারায়ণের যন্ত্রণা অল্প দিনে গেল না।

নবাবের আদেশে তাঁহাকে কারাগারের একটি জরাজীর্ণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুরাতন কক্ষমধ্যে পুরিয়া বহু কষ্ট প্রদান করা হইয়াছিল, এবং বহুদিন সেখানে যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া তারপরে উদয়নারায়ণ মৃত্যুতে সকল যন্ত্রণার অবসান করেন।

এখনও সুবিখ্যাত নাটোররাজবংশ রাজসাহীর রাজা—এখনও উদয়নারায়ণের বড় নগর নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজধানী, এখনও উদয়নারায়ণের মদনগোপাল বিগ্রহ নাটোররাজবংশ কর্ত্তৃক যথাসম্ভব উপচারে পূজিত ও সেবিত হইতেছেন। কীর্ত্তি আছে, উদয়নারায়ণ গিয়াছেন;—স্মৃতি আছে, সাহেবরাম নাই।

এবং তৎপর দিবসই রাজাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করাতে কথাটা মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়া রাজপুত্রের স্থলে রাজাই হইয়াছিল। তবে হংসসরোবরের তীরে বিষপানে মৃত্যুর কথাটা একেবারে অমূলক নহে।

রাজা উদয়নারায়ণ সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গীয় ১১২০ সালে রাজসাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ নবাবের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হন, এবং অবশেষে সুলতানাবাদ পর্ব্বত প্রদেশে প্রস্থান করেন। নবাবের দেওয়ান নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ রঘুনন্দন, উদয়নারায়ণকে ধৃত করিয়া আনেন,...নবাব ঐ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনকে রাজসাহীর জমিদারী প্রদান করেন।
Calcutta Review, 1873.

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রায় রাইয়ন রঘুনন্দন বিজিত হিন্দু ভূস্বামীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন,—তিনি উদয়নারায়ণের পরিবারবর্গ ও অন্তঃপুরস্থা কামিনী-গণকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে দেন নাই, —তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া গিয়াছিলেন।

কল্যাণীও সে সঙ্গে ছিল, সেও মুক্তি পাইল। উদয়নারায়ণের স্ত্রী ও সাহেবরামের স্ত্রী স্বর্গে গমন করিয়াছে, সে এখন কাহার নিকট থাকে! অন্যান্য যাহারা ছিল, তাহারা তাহাদিগের স্বামী পুত্রের সহিত যাহার যে দিকে সুবিধা সে সেই দিকে চলিয়া গেল।

উদয়নারায়ণের এক আত্মীয়ের বাড়ী মুর্শিদাবাদে। তিনি সস্ত্রীক উদয়নারায়ণের সংসারেই থাকিতেন,—এক্ষণে উদয়নারায়ণের অবসান হওয়ায় তিনি নিজ বাড়ী মুর্শিদাবাদে যাইবেন, স্থির করিলেন। অনন্যো-পায় হইয়া কল্যাণীও তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদে যাইবে বলিয়া স্থির করিল। মনে ভাবিল, মুর্শিদাবাদে গিয়া দেশের সংবাদ লইয়া, তাহার পরে বাড়ী যাইবে।

যে দিন তাহারা মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিবে, তৎপূর্ব্ব দিবস বৈকালে কল্যাণী দেবীনগরের প্রাসাদের এক শূন্য কক্ষের শূন্য বারেণ্ডায় বসিয়া কত ভাবনা ভাবিতেছিল, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল,—"মহা-

রাজের শিক্ষা-গুরু সেই যোগানন্দ ঠাকুর এসেছেন। কিন্তু হায়! মহা-রাজা কি আর আছেন যে, তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে! ব্রজের খেলা অবসান,—সমস্ত শূন্য, সমস্ত নীরব।”

যোগানন্দ ঠাকুরের নাম শুনিয়া কল্যাণী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—“তিনি কোথায়?”

যে লোক যোগানন্দ স্বামীর সংবাদ আনিয়াছিল, তিনি বলিলেন,—“অপরাজিতার মন্দিরে।”

কল্যাণী অপরাজিতার মন্দিরে চলিয়া গেল। স্বামীজিকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিপ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। তারপরে করযোড়ে বলিল,—“ঠাকুর, খবর শুনেছেন?”

যো। সব শুনিয়াছি—সব জানিয়াছি। কিন্তু শোক বা অনু-তাপ করিও না। ভবিতব্যতাই কার্য্য-ঘটনা আনিয়া থাকে।

ক। তা, আনুক। এখন আমি কোথায় যাই,—আমার আশ্রয় কোথায়? বজ্রাগ্নি যেমন যাহার আশ্রয়ে যায়, তাহাকেই বিদগ্ধ করে,—এ অকল্যাণী কল্যাণীও তাহাই করিল।

যো। তুমি মুর্শিদাবাদ হইয়া দেশে যাও। স্মরণ আছে, বীরকিটিতে বলিয়াছিলাম—তোমাকে যোগ শিখাইব?

ক। হাঁ, স্মরণ আছে।

যো। আমি সেই জন্যই আসিয়াছি। তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, বলিয়া আসিয়াছি—তুমি যোগ শেখ।

ক। ঠাকুর, অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে—তাহাতে যে, অধিক দিন আর ইহজগতে থাকিব, তাহা মনে হইতেছে না। যোগ শিক্ষা ও অভ্যাস বহু দিবসের পরিশ্রম ও সাধনার ফল।

যো। তা ঠিক্। কিন্তু সে দিন কি, দেহের ধারে? জন্ম-জন্মান্তরে তাহা সাধিত হয়। দেহ যায়, আত্মা যায় না—স্থূল যায়, সূক্ষ্মের প্রতাপ

থাকে। গত জন্মের কার্য্য আছে, তাই তোমার সহজ-সাধ্য হইবে। আর যদি ঘটনা-চক্রে পড়িয়া অকালে মর, তবুও যোগের দ্বারা মরিলে দেবযানের পথে যাইতে পারিবে। যোগেও মরা যায়।

কল্যাণী নতজানু হইলে যোগানন্দ স্বামী তাহাকে প্রাণজয়ের উপায় সাধনা বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন,—"এ সাধনা তোমার পূর্ব্ব জন্মে করা ছিল,—সামান্য চেষ্টাতেই ইহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে। তারপরে মরণকালে প্রাণজয় করিয়া মরিতে পারিলে জ্যোতির পথে যাইতে পাইবে। তাহা হইলে আত্মহত্যা জনিত পাতক স্পর্শিবে না,—অর্থাৎ সংস্কার সঙ্গে যাইবে না। কিন্তু আবার জন্মিতে হইবে। আশা-যাওয়া ইহাতে যায় না।

কল্যাণী যোগানন্দ স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। যোগানন্দ স্বামী বলিলেন,—"যোগদীক্ষা হইলে, আমরা শিষ্যগণকে একএকটি নামকরণ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে তোমার কল্যাণী নামে গোলযোগও আছে,—তুমি এখন হইতে 'যোগরাণী' নাম ব্যবহার করিও। কল্যাণী নাম রা'শ নামের ন্যায় গোপনে রাখিও।"

সেই দিবসই যোগানন্দ স্বামী চলিয়া গেলেন, এবং কল্যাণী মুর্শিদাবাদগামী সহযাত্রিদের সঙ্গে মিশিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিল।

মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া কল্যাণী গোষ্ঠবিহারের সংবাদ লইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিতা হইল। প্রথমে লোক পরম্পরায় যাহা শ্রুত হইল, তাহাতে হৃদ্-প্রত্যয় জন্মিল না।

উদয়নারায়ণের যে আত্মীয়ের সহিত কল্যাণী মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিল, সবিশেষ সংবাদ অবগত হইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল। তিনি কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া সমস্ত সংবাদ সঠিক অবগত হইয়া আসিলেন।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাদের বাড়ীর সংবাদ যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন।"

সেই ভদ্রলোক সে দুঃসংবাদ বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কল্যাণী বলিল,—"আপনি কোন কথা গোপন করিবেন না। সংবাদ যে অশুভ, তাহা আমি জানি। কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, তাহাই জানিবার প্রার্থনা। যাহার হৃদয় পুনঃ পুনঃ পুড়িয়া বিদগ্ধ হইয়াছে—নূতন আগুণে আর বড় তাহার কিছু করিতে পারে না।"

ভ। তুমি আর গোষ্ঠবিহারে কিজন্য যাইবে? সেখানে তোমার আর কেহ নাই।

ক। সকলকেই কি মুর্শিদাবাদে আনিয়া কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে?

ভ। না। তাঁহারা মাহিসরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।

ক। সকলেই?

ভ। সকলেই। স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা—সকলেই।

ক। আমার দাদা? গোবিন্দরাম?

ভ। গোবিন্দরামই বোধ হয়, গন্দরাজা।

ক। হাঁ, আমার দাদার নাম গোবিন্দরাম—কেহ কেহ গন্দও বলিত। তিনি বোধহয়, বাবার অনুপস্থিতে রাজাও হইয়া থাকিবেন।

ভ। যখন তোমাদের পুরীশুদ্ধ জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন, তখন গন্দরাজা বাড়ী ছিলেন না,—শেষে আসিয়া, সংবাদ শুনিয়া শোকে উন্মাদ হইয়া তিনিও সেই জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।

কল্যাণী কাঁপিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ সকল ঘটনা কিসে ঘটিল?"

ভদ্রলোকটি প্রকৃত ঘটনা জানিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবৃত করিয়া বলিলেন। কল্যাণী সমস্ত শুনিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার পিতার সম্পত্তি সমুদয় এখন কি অবস্থায় আছে?"

ভ। উজির আলি খাঁ তোমার পিতার সমস্ত সম্পত্তি খাস দখল করিয়া লয়েন। সেই জন্য এখন নবাব-সেরেস্তায় ঐ সমুদয় সম্পত্তির নাম হইয়াছে, ডিহি উজিরপুর। উজিরপুর ডিহির ভারও দেওয়ান রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে। কুমার কালু উহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন।*

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণী বলিল,—"আমাদের বাড়ীতে এখন কাহারা বাস করিতেছে?"

ভ। শুনিলাম, কুমার কালু তোমাদের বাড়ীতেই তাঁহার বাসা ও কাছারি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কল্যাণী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করিল না। সে তথা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল। সেখানে গিয়া মেঝেয় পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। কখনও মাতার নাম করিয়া, কখনও পিতার নাম করিয়া, কখনও দাদার নাম করিয়া, কখনও ভ্রাতৃজায়ার নাম করিয়া—কখনও বা পুরবাসিনীগণের নাম করিয়া কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে আপনিই উঠিয়া বসিল। যাহার কান্নার সমবেদনা জানাইতে জগতে কেহ নাই,—সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই বুঝে; আপনিই শান্তনার দিকে অগ্রসর হয়।

উঠিয়া বসিয়া কল্যাণী কত কথা ভাবিল। আজন্মের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তারপর, সে ভাবিল, আর কেন,—জীবনের কার্য্য অবসান হইয়াছে,— সকলের শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন মরণই মঙ্গল। না মরিলে জীবনের জ্বালা জুড়াইবে না,—য্াহার আশ্রয় দিবার কেহ নাই, মুখচাহিবার আত্মীয় নাই—বাস করিবার গৃহ নাই,—তাঁহার বাঁচিবার প্রয়োজন কি?

* রাজবাড়ীর অপর পারে যেখানে উজির আলি খাঁ বাঙ্গালা বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন, এখনও তাহার ভিটা পড়িয়া আছে। সেই মাঠকে এখনও উজির পোতার মাঠ বলে।

কল্যাণীর মনে হইল, যোগানন্দ স্বামী বলিয়াছেন—"এরূপ অবস্থায় মরিলে,—আত্মহত্যা করিলে—বাসনার আগুন বুকে লইয়া পার্থিব জগতের অতি নিম্নস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। পৃথিবীর তলে এই সুখ পাইলাম, আবার বিদেহী অবস্থাতেও কি বাসনার নরক বুকে পুষিব !"

তারপর সে ভাবিল,—তবে কোথায় যাই, কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াই ! রাজকন্যা হইয়া পথের ভিখারিণী হইলাম, সুখের সৌধশিরে অবস্থান করিয়া পথের ধূলিকণাতেও আশ্রয় নাই,—এখন যাই কোথায় ? পৈত্রিক ভিটায় যাইতে পারিলে, জয়দুর্গার চরণ সেবা করিয়া আর গুরুদত্ত প্রণালী অনুসারে যোগ সাধনা করিতাম—তারপর প্রাণ জয় হইলে জ্যোতির পথ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতাম। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ,—অজগর যেমন পক্ষীর কুলায়ে প্রবেশ করিয়া সকলগুলিকে নির্ব্বিঘ্নে ভক্ষণ করিয়া সেই নীড়েই বাস করে,—আর ক্বচিৎ হতভাগিনী একটি ক্ষুদ্র পক্ষিণী বাহিরে থাকায় তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত থাকে বটে, কিন্তু সে যেমন দীন নয়নে চাহিয়া দেখে, তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই ভক্ষণ করিয়া কালসর্প তাহাদেরই নীড়ে বাস করিতেছে, তাহার কুলায়ে প্রবেশ করিবার সাধ্যও নাই, তদ্রূপ আমার অবস্থা। আমারও পিতৃ-নীড়ে এখন অজগর সর্প—সেখানে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

অনন্তর কল্যাণীর প্রাণে কেমন এক আকুল বাসনার উদয় হইল, সে কি একবার সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি দেখিতে পায় না ! যেখানে সে লালিত-পালিত ও স্নেহ-বর্দ্ধিত হইয়াছিল—সেই জন্মভিটা কি আর একবার দেখা যায় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার মাথার মধ্যে একটা মতলব উঠিল। সে তাহাতে উত্তেজিত হইয়া পরিধানের স্বর্ণবলবর্ণ পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শতগ্রন্থীযুক্ত জীর্ণতম এক মলিন বস্ত্র পরিধান করিল। মস্তকের কেশরাশি ধুলা দিয়া সাজিয়া

ভিক্ষাপাত্র ও একখানি খঞ্জনী গিয়া হাজির হইল।

সঙ্গীনচড়ান বন্দুক ঘাড়ে ছিল। কল্যাণী সেখানে বাড়ীর মধ্যে যাইব।”

নেই। ইরাণের ক্রীতদাসের মিতি খোজা করিয়া দেয়, বাব-সরকারে বিক্রয় করে। ন না। কোন্ বংশে, কোন্ ত নহেন। কিন্তু মুসলমান- জানিয়াছেন। তাই যখন ার বিরল শ্মশ্রু-গুম্ফ মুখের খানি কাঁপাইয়া বাঁশীর মত তখন তাঁহার চিত্ত-প্রফুল্লতা

ন,—“তুমি কি ভিখারিণী?”

হাঁ বাবা, আমি ভিখারিণী।

ভিখারিণী; তবে এদিকে কেন? সদর দরোজায় যাও—সেখানে ভিক্ষা মিলিবে।

ক গা জানি,—কিন্তু বিবি সাহেবাদিগকে গান শুনাইয়া ভিক্ষা লইব। নবাববাড়ী আমি গান গাহিয়াই বেগমসাহেবাদিগের নিকট অর্থ লইয়া থাকি। অনেক দিন রোগে পড়িয়াছিলাম, তাই ভিক্ষা করিতে পারি নাই,—বড় কষ্টে আছি শেখজি!

শেখজির দয়া হইল। স্ত্রীলোক প্রবেশে বিশেষ বাধা না থাকায়, শেখজি দ্বার ছাড়িয়া দিলেন, কল্যাণী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কল্যাণী নেফিসার নিকট যাইবে, কিন্তু পথে যাইতে তাহ
পাল সুন্দরী বাঁদীতে আটকাইয়া ফেলিল। ভিখারিণীর হ
যন্ত্র দেখিয়া তাহাদের গান শুনিবার কৌতুহল সহসা জাগি
প্রচুর ভিক্ষার প্রলোভন দেখাইল,—অগত্যা কল্যাণী তাহাদি
গান শুনাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে নেফিসাবেগমের
লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

নেফিসা কল্যাণীকে চিনিতে পারিল না। কল্যাণী চি
স্পষ্ট দেখিল, সে মুখে যে বিলাসের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ ছিল
সংযমের সাধনসুফলে অমৃতায়মান হইয়াছে। কল্যাণী বলি
সাহেবা, আপনার সহিত একটা কথা আছে, মা!"

স্বর পরিচিত এবং প্রাণস্পর্শী। নেফিসা আবেশ-তর
রিণীর মুখের দিকে চাহিল।

কল্যাণী বলিল,—"তোমার নিকট ভিক্ষার্থে আ
কল্যাণসিংহ।"

নেফিসা তাহাকে চিনিল। অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল।
বলিল,—"আমি বড় বিপদে পড়িয়া তোমার শরণাগত আ
কেবল আমি বাহিরের বেশে ভিখারিণী নহি,—প্রকৃতই
কাঙ্গালিনী—প্রকৃতই পথের ভিখারিণী।"

নে। আমার সাধ্যে যদি সংকুলান হয়, আমি প্রাণপণে তোম
উপকার করিব। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ—আমাকে
সয়তানের বাহু-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়াছ,—আমাকে পাপের মর্ম্ম-
স্থল হইতে ফিরাইয়া দিয়াছ,—আমাকে যথার্থ প্রেমের তত্ত্ব শিখাইয়া
দিয়াছ,—আমি তোমার নিকট প্রেমের ধ্যান শিখিয়া এখন সর্ব্বদাই
স্বামিপ্রেমে বিভোর থাকি—আমি বড় সুখে—বড় শান্তিতে আছি।

ক। আমি সেজন্য প্রত্যুপকার চাহি না—তুমি যে আমার ক

কথা বলিতে বলিতে নেফিসার আয়ত নীলোৎপলদলপ্রভ নয়ন-যুগল জলপূর্ণ হইল, সে হস্তদ্বয়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর চরণ ধারণ করিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নেফিসার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছু বুঝিতে পারিলেন না। যাহার অধরে হাসির একাধিপত্য, অশ্রু জানে না। যাহার হৃদয়ে আত্মম্ভরিতার পূর্ণ রাজত্ব—বিনয় উদিত হয় না,—সেই নেফিসার এ ভাবান্তর কেন? যে অভাব কাহাকে বলে জানে না,—যে টাকা কাহাকে বলে জানে না,—জমিদারী জিনিষটা কি জানে নাই—কেবল সুখ আর আনন্দ, ইহাই লইয়া যে জীবন কাটায়,—সে জমিদারী চাহিবে কেন? যদিই উহার স্বামীর অনুরোধে চাহিতে হইবে, তবে কাঁদিবে কেন? অমন কোমল হৃদয়ের করুণ প্রার্থনায় তাঁহাকে বিচলিত করিবে কেন? আবার ভাবিলেন, মহম্মদরেজা খাঁ সঙ্গে সামান্য জমিদারীর আকাঙ্ক্ষাই বা করিবে কেন? বঙ্গের সমগ্র জমিদারের সে জমিদার। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেও এ তথ্যের নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নেফিসা, সে জমিদারী লইয়া তুমি কি করিবে?"

নেফিসা চৈনিক রেসমের সূক্ষ্মতন্তু বিনির্ম্মিত গোলাপ-গন্ধ ক্ষুদ্র রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিল,—"আমি ভিক্ষা করিয়া লইয়া বিলাইয়া দিব। আপনি আমার আশা পূর্ণ করিবেন কি না,—বাঁদীর আশার বাসনা পূর্ণ করিবেন কি না?"

মু। আমি তোর কাণ্ড বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাই হোক, সে জমিদারী বিলি হইয়া গিয়াছে।

নে। বিলি হইয়া গিয়াছে? কাহার নিকট বিলি হইয়াছে?

মু। দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনকে সে সম্পত্তির ভার দেওয়া হইয়াছে। কুমার কালু এখন সেখানে অবস্থিত।

নে। তাঁহাদিগের নিকট হইতে কি তাহা আর ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই?

সকল জ্বালার শেষ করাই শ্রেয়ঃ। গুরুর কৃপায় ... হইয়াছি—জ্যোতির পথ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ ক...

কল্যাণী মনে ভাবিত, কিন্তু আপন জন্মভিটা—অ... আপন গৃহ-বাট-তট-মাঠ যেন তাহাকে স্নেহের শ... রাখিত।

এক দিন জ্যোৎস্নাফুল্ল নিদাঘ-নিশীথে সত্য ... আসিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল। ফৌজগুলি সত... ফৌজদার সাহেবের কি অপর কাহারও তাহার সা... লইতে পারে নাই,—তবে অনেকে অনেকরূপ রচা ক...

ফৌজের নাম শুনিয়া কল্যাণীর ত্রাস-কম্পি... হইয়া পড়িল। সে সতীত্ব রক্ষার জন্য বাড়ীর পশ্চা... বাহির হইয়া পড়িল। রমানাথ ঠাকুর ফৌজের আ... একখানা নৌকা ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিল,—যদি কো... পলাইয়া আসিতে পারে, এই নৌকায় তাহাকে সরাই... সাক্ষাৎ পাইয়া তাড়াতাড়ি নৌকায় তুলিয়া দিল। কল্যাণী ... উঠিয়া প্রাসাদের পাশের ঘাটে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল ... জন্মভূমির প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া থাকিল। তখন ... ভরসা হইয়াছিল—মাহিসরের শীতলজলের উপরে ... শত্রুর ভয় কি ?

কল্যাণী জলের উপরে পা দুইখানি ভাসাইয়া নৌ... বসিয়া ... তাহার নয়ন প্রাসাদ-প্রাঙ্গনাভিমুখী। জ্যোৎস্না-বহ... দিগন্ত ... গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা পদমূল হইতে তাহার হৃদয়-... করিয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিব্রত ছিল। ক্ষুধার্ত শ্যেন ... হইলে, ব্যথিতা কাতরা বিতাড়িতা দুর্ব্বলহৃদয়া পক্ষিণী যেমন দূরে ... নীড়াভিমুখে চাহিয়া নীরবে অশ্রুজল পরিত্যাগ করে, কল্যাণীও তাহাই

তারপর, অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মর্ম্মান্তিক বেদনাপ্লুতকণ্ঠে ... গাহিল,—

পথ হারা পথিক যদি এ পথে এসো;
শুধু ক্ষণিকের তরে এখানে ব'স।
জন্মভিটা এই মম রহিল পড়িয়া,
শূন্য ধূ ধূ—চিরতরে কাতরে চাহিয়া,
বিস্মৃত-হৃদয়ে হেরি বিমুগ্ধ নয়নে—
এক ফোটা ফেল অশ্রু সমাধি-নির্জ্জনে
পার যদি সে মুহূর্ত্ত
ভালবেসো।

দূরে দূরে—বহু দূরে গগনে গগনে
এই হর্ম্মাচূড়া ঐ তোরণে তোরণে—
কপোতের কণ্ঠে ফোটে অর্দ্ধ ভগ্নস্বর
দুর্জ্জয় প্রাচীর গড় দুর্গের প্রাকার
পার যদি কল্পনায়
মনে এনো।

এই মাহিসর নদী হয়ত তখন
বহিয়া জাগায়ে দিবে স্মৃতির স্বপন
এই মাঠ-তট-বাট সকলি থাকিবে,
শুধু এ রাজশ্রী আর কিছু না দেখিবে;
পার যদি সমীরণে
ডেকে শুনো।

পার যদি মনে কর' অতীত কাহিনী,—
কি আগুনে জ্বলিয়াছে এ হতভাগিনী;
কি আগুনে পুড়িয়াছে সোণার সংসার
কি আগুনে সারা বঙ্গে ভীষণ চীৎকার,
পার যদি সুশাসনে
সুখে জেগো।

কল্যাণীর শুভপ্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা ন্যায়বান বৃটিশরাজত্বের শান্তিময় সুশাসনে সুখে ভাসিতেছি, কিন্তু কল্যাণী সেই অত্যাচা র অগ্নি বুকে লইয়া, অবিচারের অবসাদ-ক্ষত মস্তকে লইয়া—পৈত্রিক প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নৌকা খুলিতে আদেশ করিল। আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মাঝিগণ মাহিসর নদীর নীলজলে নৌকা ভাসাইয়া দিল। রমানা ঠাকুর সে নৌকায় ছিল। দূর হইতেও কল্যাণী পুনঃ পুনঃ প্রাসাদে দিকে চাহিতে লাগিল। যখন ছায়ার ন্যায় প্রাসাদ-দৃশ্য দিগন্তের কো মিশিয়া গেল, পুনঃ পুনঃ চাহিয়াও যখন আর তাহা দৃষ্টিগোচর হই না,—তখন কল্যাণী ব্যথিত হৃদয়ের পূর্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়ে বলিল,—"ভগবন! সব গেল,—প্রাণের বেদনা গেল না কেন? বে এখনও ঐ শূন্য দেশ—ঐ আত্মীয়-স্বজনবিরহিত প্রাসাদ দেখিবার জ প্রাণের এত আকর্ষণ! প্রভু, রক্ষা কর। আকর্ষণের অনলদহনে আ জ্বালা'ও না।

তারপরে, সে ভাবিল, এখন কোথায় যাইব। কোথায় গেলে এক বিন্দু শান্তি পাওয়া যাইবে! প্রাণের জ্বালা কিসে নিবারণ হইবে তারপর, মনে করিল,—এখন প্রাণ-নিরোধ করিবার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষম লাভ করিয়াছি—এখন মরণই মঙ্গল। মরিতেই হইবে। কিন্তু মাহিস শীতল জল পরিত্যাগ করা হইবে না,—আমার মাতা ভগিনী আ স্বজন ভ্রাতা সকলেই যে জল-তলে আশ্রয় লইয়াছে,—যে জলে শুইয়া অ চার-দগ্ধ হৃদয় শান্ত করিয়াছে,—আমি সেই জলে শয়ন করিব।—কি আর অপেক্ষা কি, মরি না কেন? এখন আর নৌকায় করিয়া কোথায় যাইতেছি। তারপর মনে হইল,—এখানে মরিব না, অত্যাচারের দগ্ধ স্থানে মরিব না। এ পরগণা পরিত্যাগ করিয়া মরিব; যখন আমায় অধিকারচ্যুত করিয়াছে—তখন এ অধিকার পরিত্যাগ করিয়াই মরিব!

কল্যাণী নৌকার উপর বসিয়া প্রাণের সংযম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রাণ সমস্ত বৃত্তি হইতে একমুখী হইয়া উঠিল,—শোক মোহ তাপ জ্বালা বিদূরিত হইয়া উঠিল। নৌকা ততক্ষণ অবিরাম গতিতে গমন করিয়া "ধোপাবিলে" নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নিম্নে উপস্থিত হইল।

তখন রাত্রি অবসান হইয়া গিয়াছে,—ঊষার বাতাস জগতে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। কল্যাণী মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোন্ গ্রাম?"

মাঝি বলিল,—"ধোপাদহ।"

কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার অধিকার ছাড়াইয়াছি কি?"

মাঝি বলিল,—"হাঁ।"

রমানাথ ছইয়ের নৌকার ছইয়ের মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। কল্যাণী তাহাকে ডাকিল। সে উঠিয়া বাহিরে আসিলে, কল্যাণী বলিল,—"এইখানে [illegible] নামিব।"

র। কেন?

ক। প্রয়োজন আছে,—মাঝিদিগকে বিদায় করিয়া দাও, ইচ্ছা হইলে তুমিও ফিরিয়া যাইতে পার।

র। আর, তুমি?

ক। আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই করিব।

র। সে কি?

ক। এখনই দেখিতে পাইবে।

মাঝিরা তীরে নৌকা ভিড়াইল, কল্যাণী লাফাইয়া তীরে উঠিল। রমানাথ লাফ দিতে গিয়া জলে পড়িয়া কাপড় ভিজাইয়া ফেলিল। তারপর, মাঝিদিগকে ভাড়া মিটাইয়া বিদায় করিল।

তখনও ঊষা চলিয়া যায় নাই, তখনও পাখীরা কুলায় ছাড়ে নাই,

তখনও সূর্য্যের প্রথম রশ্মিকীরিট জগতে পড়ে নাই,—গ্রামের বিলাসসু
নর-নারী তখনও জাগিয়া উঠে নাই,—কেবল দুই একজন কৃষকবধূ কু
লইয়া জল লইতে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষে
করিয়া কৌতূহলচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।

কল্যাণী বলিল, "ঠাকুর, এইবার তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। আমারে
শেষ হইয়াছে।"

রমানাথ ঠাকুর বলিল,—"তুমি?"

"আমি যাহা করিব, এই দেখ।"—এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তে সে উ
দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধ-নতযুক্ত করে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল,——

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

তারপরে ডাকিয়া বলিল,—"গুরুদেব, তোমার কৃপাতে প্রাণের স
শিখিয়াছি; তুমিই অন্ধের পথপ্রদর্শক; তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্র
করিয়া তোমার শিষ্যা যোগরাণী বিদায় হইল।"

আর কোন কথা নাই,—একবার আহিসরের জল উচ্ছ্বসিত,
র্ত্তিত ও বিঘূর্ণিত হইল; তারপর সব নিস্তব্ধ, সব নীরব। * কেব দূর
প্রতিধ্বনি সমীরের কাণে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল।

* যেখানে কল্যাণী আত্মহত্যা করিয়াছিল, ধোপাবিলা গ্রামের নিম্নে মা
সে স্থান এখনও গ্রামের লোক নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। ধোপাবিলা গোষ্ঠ
হইতে তিন ক্রোশ হইতে পারে। ইহা যশোহর জেলার অন্তর্গত, এবং সম্ভবতঃ ন
প্রসিদ্ধ জমিদারগণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

যোগরাণী।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—০:*:০—

রমানাথ ঠাকুর কন্যাটীর কাণ্ড দেখিয়া অনেকক্ষণ স্তম্ভিত-নয়নে জলের দিকে চাহিয়া ছিল। তারপর যখন সব স্থির হইয়া গেল, এবং পূর্ব্বাশায় নবরবি-সম্পূর্ণ মধ্যস্থ মনোজ্জ্বল কিরণের প্রতিভাত হইল, তখন সে নদীতীর করুণ দৃশ্যস্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ততক্ষণে গ্রামের লোক সকলেই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল,—কৃষক বধূরা জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সকল বিষয় ততক্ষণ গ্রামের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছিল, এবং যাহারা অদূরে বাশ'জালে মাছ মারিতেছিল, তাহারাও কন্যাটীর আত্ম-হত্যা ব্যাপার দেখিয়া কণ্টকিত দেহে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল কথা সকলের সাক্ষাতে বর্ণনা করিয়াছিল। গ্রামের লোক হৈ চৈ বাধাইয়া নদীকিনারে ছুটিয়া ধাবিত হইতেছিল, পথে রমানাথঠাকুরের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায়, ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। রমানাথঠাকুর গোর্ঠবিহার রাজকন্যার পরিচয় ও আকস্মিক আত্মহত্যার কারণ সকলের নিকট বলিয়া পার পাইল।

সে দিবস শোকময় প্রাণ লইয়া রমানাথঠাকুর পাতবিলাগ্রামেই অবস্থান করিয়াছিলেন, তৎপরে বৈকালে সেখান হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

রমানাথঠাকুরের দেশে যাইবার পথেই মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সে এক দোকানে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল।

রমানাথ যখন আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে যাইবে, তখন শুনিতে পাইল, দোকানীতে ও আর একটি ভদ্রলোকে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে।

দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—"খবর পেয়েছেন?"

ভ। তাই ঠিক্—নবাবের কারাগারেই রাজা উদয়নারায়ণ অত্যাচারের ভীষণ আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন।

দো। কবে মরিয়াছেন?

ভ। আজ সাত দিন। আর এক কথা?

দো। কি?

ভ। যে কারাকক্ষে তিনি বন্দী ছিলেন, যে কারাকক্ষে অত্যাচারের অসহ জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন,—তাঁহার মরার পরে, সেই কক্ষে নাকি সারারাত্রি ধরিয়া অলৌকিক চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সে স্বর রাজার কণ্ঠস্বর। সেই স্বর নাকি কক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ডাকিতেছে—"সাহেবরাম, সাহেবরাম!"

দো। এ কথা কে বলিল?

ভ। যে ভৃত্যেরা সেই কক্ষে থাকে।

দো। তবে বোধ হয় রাজা অপদেবতা হইয়াছে।

ভ। তা নয় গো,—সাহেবরামের মত পুত্রের জন্য কার না আত্মা কাঁদিয়ে ঝোরে! বঙ্গের সকলেরই সাহেবরামকে ডাকা উচিৎ।

দো। আগে রাজার নামে গয়ায় একটা পিণ্ড দেওয়া উচিৎ। তার কি কেহ নাই?

১—৯ ডবল ক্রাউন ফর্ম্মা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত এবং তৎপরে ১০ হইতে ৪০ ক্রাউন ফর্ম্মা কলিকাতা ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট "অবসর প্রেসে" শ্রী[illegible]চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ বঙ্গাব্দ।